বিয়ের শব্দকোষ

হরিপদ ভৌমিক



বিয়ের শব্দকোষ
বিয়ে অলঙ্কার রান্নাঘর কুটুম্বিতা

বিয়ের শব্দকোষ

বিয়ে অলঙ্কার রান্নাঘর কুটুম্বিতা

হরিপদ ভৌমিক

গা ঙ চি ল

Biyer Shabdakosh
by Haripada Bhowmick

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০১২

প্রকাশক
অণিমা বিশ্বাস
গাঙচিল
'মাটির বাড়ি', ওঙ্কার পার্ক, ঘোলা বাজার
কলকাতা ৭০০ ১১১
ই-মেল gangchil books@gmail.com

বিক্রয়কেন্দ্র
৪এফ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯
৩৩ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক
স্বপ্না গ্রাফিক্স ৯সি শিবনারায়ণ দাস লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও রূপায়ণ
বিপুল গুহ

ISBN 978-93-81346-26-6

দাম ২০০ টাকা

উৎসর্গ

ওঁ যদেতদ্ধৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।
তোমার হৃদয় আমার হউক এবং আমার হৃদয়
তোমার হউক। আমরা উভয়ে একহৃদয় হই।

পৃথিবীর নবম আশ্চর্য—
বিবাহের মন্ত্র যাঁরা রচনা করেছেন তাঁদের উদ্দেশে

সূচি

দায়গ্রস্থ ভূমিকা

'কুমারী নিজের সঙ্গী বেছে নেয়'— এ ভাবে বিয়ের প্রথম উল্লেখ করা হয়েছে ঋগ্বেদে (১০/২৭/১২)। শুধু নারী নয়, সেকালে পুরুষও তার সঙ্গী বেছে নিতে পারতেন। তখন বর-বধূর কাছে স্বাধীন নির্বাচনের রাস্তা খোলা ছিল। মনুর যুগে যাত্রী নির্বাচনের দায়িত্ব এসে পড়ে গুরুর হাতে।

'গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্।।
মনুসংহিতা ৩/৪

গুরুর অনুমতিতে দ্বিজ স্নান করে যথাবিধি সমাবর্তন করে সুলক্ষণযুক্ত সবর্ণ কন্যাকে বিবাহ করবে।

এখানে 'সবর্ণ' শব্দটির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। মনুর সময় বর্ণ অনুযায়ী বিবাহকে আট ভাগে ভাগ করা হয়েছিল— ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। 'ব্রাহ্ম' বিয়ের কথায় মনুর (৩/২৭) মত- 'বিদ্বান ও চরিত্রবান ব্যক্তিকে নিজে আহ্বান করে, তাকে বস্ত্রাদি দ্বারা আচ্ছাদিত করে ও সম্মানিত করে কন্যাদানকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলা হয়।' এবং 'ব্রাহ্ম বিধিতে বিবাহিতা স্ত্রীর পুণ্যবান পুত্র ঊর্ধ্বতন দশ, অধস্তন দশ পুরুষ ও নিজেকে-সহ এই একুশ পুরুষকে পাপমুক্ত করে।'

'দৈব' বিবাহ হল, 'যজ্ঞারম্ভকালে যজ্ঞ-কর্মরত পুরোহিতের নিকট অলংকৃতা কন্যার উপযুক্ত রূপে দানকে দৈব বিবাহ বলে' (৩/২৮)। এবং 'দৈব বিধিতে বিবাহিতা স্ত্রীর পুণ্যবান পুত্র ঊর্ধ্বতন সাত, অধস্তন সাত পুরুষকে পাপমুক্ত করে।' [মনু ৩/৩৮]।

আট রকম বিয়ের মধ্যে ব্রাহ্ম, দৈব ও আর্ষ এই তিনটিকে ধর্মসম্মত (৩/২৫) বলা হয়েছে। এবং প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব ও রাক্ষস তিনটিকে 'অধর্মীয়' বলে মন্তব্য করা রয়েছে। 'তোমরা দুইজনে একত্র হয়ে ধর্মাচরণ করো'— এই বলে বরকে অর্চনা করে তাকে কন্যাদান প্রাজাপত্য বিবাহ নামে কথিত।' আর 'প্রাজাপত্যবিধিতে বিবাহিতা স্ত্রীর পুত্র ছয় ছয় পুরুষকে পাপমুক্ত করে।'

'কন্যা ও বরের ইচ্ছানুসারে পরস্পর মিলন গান্ধর্ব নামে জ্ঞেয়, এই বিবাহ কামবশে মৈথুনেচ্ছায় ঘটে' (৩/৩২) আর 'বিরুদ্ধ কন্যাপক্ষীয় ব্যক্তিগণকে হত্যা বা আঘাত করে, তাদের অঙ্গচ্ছেদ করে এবং (প্রাচীরাদি) ভেদ করে চিৎকার ও রোদনকারিণী কন্যার বলপূর্বক হরণ রাক্ষস বিবাহ নামে কথিত' (৩/৩৩)।

মনু তাঁর সংহিতা (৩/২৫) 'পৈশাচশ্চাসুরশ্চৈব ন কর্তব্যৌ কদাচন'— পৈশাচ ও আসুর বিবাহ কখনও করা উচিত নয় বলে মন্তব্য করেছেন। '(কন্যার পিত্রাদি) জ্ঞাতিদের এবং কন্যাকে যথাশক্তি ধন দিয়ে স্বেচ্ছানুসারে কন্যা গ্রহণ আসুর বিবাহ' (৩/৩১) আর 'নিদ্রিতা, মদ্যপানে বিহ্বলা বা প্রমত্তা (চরিত্ররক্ষণে অক্ষমা) কন্যাকে নির্জনে সম্ভোগ করলে সর্বাধিক পাপজনক ও নিকৃষ্টতম অষ্টম প্রকার বিবাহ পৈশাচ নামে কথিত হয়' (৩/৩৪)।

ধর্মসম্মত, অধর্মীয় এবং নিন্দিত মত বলে তিনটি ধারায় বিয়েকে ভাগ করা হয়েছিল। আর্য এবং প্রাগার্য ঐতিহ্য মিলে বিয়ের আচার একটি অন্যরূপ পেয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে বাংলার প্রতিটি অঞ্চলের বিয়ে নিয়ে নানান আঞ্চলিক লোকাচার তৈরি হয়েছে। সবর্ণ যখন ভেঙে গেল, তখন বৈদিক রীতির সঙ্গে লৌকিক লোকাচার মিশে একটি নূতন রূপ পেতে শুরু করল, সেই ইতিহাস কখনও লেখা হয়নি। প্রতিটি আচার-অনুষ্ঠানেই একটি করে নাম আছে। হারিয়ে গেছে প্রচুর অনুষ্ঠান, অনুষ্ঠানের সঙ্গে অনুষ্ঠানের নামও হারিয়ে গেছে অনেক।

বিষয় ধরে শব্দকোষ তৈরি করা শুরু করি 'লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা'র সম্পাদক সনৎকুমার মিত্রের উৎসাহে। ২০০২ সালের এপ্রিল-জুন সংখ্যায় 'জল' বিষয়ে প্রথম শব্দকোষ। তার পর অনেকগুলি শব্দকোষই লেখা হয়। 'বিবাহ' বিশেষ সংখ্যা করার কথা ছিল, সেই সংখ্যার জন্য শব্দকোষ তৈরি শুরু করি, কিন্তু বিষয়টি পরিবর্তিত হওয়ায়, লেখাটি আর ছাপা হয়নি। অধীর বিশ্বাস মহাশয়ের আগ্রহে বই হিসেবে বিয়ের শব্দকোষটি প্রকাশের ব্যবস্থা হল।

পত্রিকার পাতায় ছাপা হবে, সেই মতো শব্দকোষটি তৈরি। যখন বই-এর কথা বলা হল, তখন যা সহজ মনে হয়েছিল কাজ শেষ করার ভাবনায় কাজ শুরু করতে গিয়ে বুঝলাম তথ্যের মহাসমুদ্রে পড়ে গিয়েছি। সেই তথ্যকে সংগ্রহ করে, তাকে আলাদা শব্দে গুছিয়ে নিয়ে তৈরি করতে অনেক সময়ের প্রয়োজন। মনের কথাটি প্রকাশককে জানালে প্রকাশনার তরফে তিনি সময় দিতে রাজি হলেন না। বললেন, 'বাংলা ভাষায় বিয়ের শব্দকোষ এই প্রথম। প্রথম কাজেই সবটা শেষ করা যাবে এ ভাবনাটাই ভুল। বইটি বেরুচ্ছে, বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়ে গেছে। যতটা কাজ হয়েছে তা দিয়েই বইমেলায় বইটি বেরুবে— পরে নতুন তথ্য সংযোজন করা যাবে।'

প্রকাশকের ইচ্ছের কাছে হার মানতে হল। এখন মনে হচ্ছে, বিয়ের শাস্ত্রীয়-লৌকিক বিপুল শব্দভাণ্ডারের মধ্যে অল্পসংখ্যক শব্দ দিয়েই বিয়ের শব্দকোষের সূচনা করা হল মাত্র।

বিয়ের নিয়মের অনেক কথা পেয়েছি আমার মাতৃদেবী শ্রীমতী বিভারানী ভৌমিকের কাছ থেকে। প্রকাশকের দাবির কারণে ছেলের বিয়ের ব্যস্ততার মধ্যেও কাজটি করে উঠতে পারব কি না, বুঝে উঠতে পারিনি। প্রকাশকের তরফে অধীরদা শুধু বলেছেন, আপনার এক দিকে পুত্রের বিয়ে অন্য দিকে এই বিয়ের শব্দকোষ, জানবেন আমাদেরও কন্যাদায়। দুটো কাজই উদ্ধার করতে হবে। তাঁর আন্তরিক ইচ্ছেতেই এই বইমেলায় বইটি প্রকাশিত হল।

গ্রন্থ প্রকাশে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁর হলেন সনৎকুমার মিত্র, অশোক উপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় ও নেপালচন্দ্র দাস মহাশয়।

কাঁকুড়গাছি
২২ জানুয়ারি ২০১২

হরিপদ ভৌমিক

বিয়ে

অ

অকুলীন পাত্র/পাত্রী কুলীন বংশজাত নয় এমন পাত্র/পাত্রী।

অগ্রেদিধিষু অবিবাহিতা জ্যেষ্ঠা কন্যার আগে বিবাহিতা কনিষ্ঠা কন্যা।

অগ্নি পরিক্রমণ বিয়ের অনুষ্ঠানে শিলারোহণের পর বর ও বধূর হোমের স্থানে গিয়ে বসে সেখান থেকে উঠে অগ্নির চারিদিকে পরিক্রমা করা।

অঘর বিয়ের ব্যাপারে বর বা কনের পছন্দ না হওয়া ঘর।

অধ্যগ্নি এক প্রকার স্ত্রীধন। বিয়ের সময় অগ্নি সমক্ষে তা দেওয়া হয়। মনুর বিধানে (৯/১৯৪) রয়েছে।

অধ্যাবাহনিক পিত্রালয় থেকে শ্বশুরালয়ে গমনকালে কন্যাকে প্রদত্ত স্ত্রীধন। মনু (৯/১৯৪) এই স্ত্রীধনের উল্লেখ করেছেন।

অর্ধাঙ্গী স্ত্রী পতির অচ্ছেদ্য অঙ্গ মনে করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় বলে স্ত্রী 'অর্ধাঙ্গী' নামে পরিচিত।

অধিবাস বিয়ের আগের দিন পুরোহিত এসে বা এয়োরা বরণডালায় সাজানো অধিবাসের জিনিসগুলি দিয়ে বরের বাড়িতে বরের এবং কনের বাড়িতে কনের কপালে ছোঁয়ানোর যে লৌকিক অনুষ্ঠান।

অমরকোষে বলা হয়েছে— 'সংস্কারোগন্ধমাল্যাদ্যৈর্য: স্যাত্তাদ ধিবাসনম্' গন্ধ ও মান্য প্রভৃতি মাঙ্গলিক পদার্থ দিয়ে সংস্কার-বিশেষকে 'অধিবাসন' বা 'অধিবাস' বলে। 'বাস' শব্দের অর্থ সুগন্ধ এবং অধিবাস শব্দে সাধারণত 'দেহকে সুগন্ধযুক্ত করা' বোঝায়। পশ্চিমবঙ্গের হুগলি ও হাওড়া অঞ্চলে বরণডালায় তেল, হলুদ, একটু গঙ্গামাটি, চন্দন, নুড়ি শিলা, সাদা ধনে, সাদা সরষে, দূর্বা, ফুল, ফল [এক ছড়া বিজোড় পাকা বা কাঁচা কাঁঠালি কলা] দই, ঘি, স্বস্তিক [পিটুলির তৈরি মোচার মতো ছোট ছোট গোল পিরামিডের উপর পলতেযুক্ত কাঠি পোতা থাকে], সিঁদুর, শাঁখ, লাটাই জড়ানো সুতো, কাজল, গোরচনা, সোনা, রূপা, তামা, ঘিয়ের প্রদীপ, আয়না এবং চামর— এই সব জিনিস সুন্দর ভাবে সাজিয়ে রাখা হয়। এবং পৃথক থালাতে মাষকলাই এবং চালবাটা দিয়ে গড়া শ্রী বা 'ছিরি' গড়ে রাখা হয়। বরণডালার

এক একটি দ্রব্য বর বা কনের কপালে ছোঁয়াবার পর সমস্ত বরণডালাটা ও 'শ্রী'র থালাটাও কপালে ঠেকানো হয়। অধিবাসের চিহ্নস্বরূপ হলুদে ছোপানো দূর্বাঘাস একগোছা কার্পাস সুতো দিয়ে বর বা কনের হাতে বেঁধে দেওয়া হয়, একে 'মঙ্গলসূত্র' বা 'কঙ্কন' বলে।

অন্বাধেয় বিবাহে পিতা বা স্বামীর দিক থেকে স্ত্রীর পাওনা ধন।

অন্বাহার্য্য বিবাহের আগে করা নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ ও তার দক্ষিণা এই দুটি কর্মের একত্রিত নাম।

অন্যপূর্বা বিয়ের আগে যে নারী অন্যের বাগদত্তা ছিল।

অনুমন্ত্রিতা বিয়ের মন্ত্রদ্বারা সংস্কৃতা স্ত্রী।

অনুডুহ বৃষচর্মে উপবেশন করে প্রাচীনকালে বিবাহের শেষ ক্রিয়ানুষ্ঠান সম্পন্ন করা হত। বর্তমানে এই প্রথা বন্ধ হয়ে গেছে।

অন্যোঢ়া অন্যের পরিণীতা স্ত্রী।

অশ্মারোহণ বৈদিক যুগের বিবাহক্রিয়ায় কৌশিক সূত্র (১০/৭৭) মতে বর এক খণ্ড পাথর বধূর সামনে রাখলে সে তার উপর দাঁড়ালে বর বলবে— 'এই পাথরের মতো স্থির হইও'।

অন্য মতে, বর তার ডান হাতে বধূর ডান পা সামান্য উঠিয়ে শিলার উপর রেখে বলবে—

'ওম্ আরোহেমমশ্মানমশ্মেব ত্বং স্থিরা ভব।
অভিতিষ্ঠ পৃতন্যতোহ্বাধস্ব পৃতনাযতঃ॥১॥ (পার গৃহ্য ১/৭/১১)

অষ্টমঙ্গল কোথাও কোথাও 'অষ্টমঙ্গলা'ও বলে। বিয়ের অষ্টম দিনে কনের বাড়িতে দিনে অথবা রাতে বিয়ের আসর তৈরি করে 'অষ্টমঙ্গলা' লোকাচার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। এই দিন এয়োগণ দুধ ও আলতা গোলা থালায় বর কনের হাত রেখে মঙ্গলসূত্র ও গাঁটছড়া গোলে। কন্যাদাতা নতুন জামাতাকে নিমন্ত্রণ করে এনে পরমান্নাদি ভোজন করান। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে পাড়া-প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করা হয়। এই দিন বরকে পিঠে পায়েস নাড়ু প্রভৃতির সঙ্গে মাছ মাংস সব রকম ভোজ খাওয়ানো হয়।

আ

আইবুড়ো ভাত গায়ে হলুদের পর পিতৃগৃহে পাত্র-পাত্রী দুজনের বাড়ির দিকে নিকট আত্মীয়গণ নানান রকম পদে অন্নগ্রহণ অনুষ্ঠান। কেউ কেউ এই অনুষ্ঠানকে 'আইবড় ভাত' খাওয়ানো অনুষ্ঠান বলেন।

আইভাঁড় নানান রঙে চিত্রিত করা বিয়ের মাঙ্গলিক হাঁড়ি। এই হাঁড়িতে হলুদমাখা চাল ও একুশটি কড়ি রেখে, সরা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়।

আই সরা আই হাঁড়ি ঢাকার জন্য যে সরা ব্যবহার করা হয়।

আই হাঁড়ি চব্বিশ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোর প্রভৃতি অঞ্চলে বিবাহের বিভিন্ন রঙে চিত্রিত করা মাঙ্গলিক হাঁড়ির আঞ্চলিক নাম। [আয়ুঃ > আউ > আই - হাঁড়ি]।

আইয় সরা বরণডালা। আইয় [এয়ো] অর্থাৎ যে সধবা রমণীদের হাতে বিবাহের লোকাচারের অনুষ্ঠানের দায়িত্ব থাকে। আইয়গণ বরণডালা বা আইয় সরা দিয়ে বরণ করেন। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে লিখেছেন:

'কার হাতে আইয় সরা কার হাতে দীপ।
শতে শতে আইয় গেল মুনির সমীপ।।
পতি পুত্রবতী যত দেবতার নারী।
বরণের সজ্জা লইয়া দাঁড়াইল সারি সারি।।'

আইর ঢাকার আঞ্চলিক ভাষায় বিবাহকর্মে বংশের প্রথা।

আই ঘট বিয়ের চিত্রিত মাঙ্গলিক হাঁড়ি, ঢাকার আঞ্চলিক নাম।

আও হাঁড়ি বহু রঙে চিত্রিত বিয়ের মাঙ্গলিক হাঁড়ি, রাঢ় অঞ্চলের আঞ্চলিক নাম।

আটোরা বিয়ের অষ্টম দিনে নববধূর স্বামীর সঙ্গে পিত্রালয়ে আসা। দিনাজপুর জেলার লোকাচার অনুষ্ঠানের এই নাম।

আভ্যুদয়িক বিয়ের মাঙ্গলিক কাজ করার আগে অভ্যুদয় বা সমৃদ্ধির জন্য পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানকর্মকে অভ্যুদয়ের হেতু মনে করা হয়, সেই শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ।

আয়ো বিবাহে লোকাচার অনুষ্ঠানগুলি যে সধবা রমণীগণের উপর দায়িত্বস্বরূপ ছেড়ে দেওয়া হয়। মঙ্গলকাব্যের কবি সৈয়দ আলাওল লিখেছেন:

'সমাগম করিয়া রজনী গেল সবে।
আয়ো স্ত্রী সকলে স্নান করাইল তবে।।
সুগন্ধি হরিদ্রা তৈল শরীরে মাজিল।
দীঘী পুষ্করণীতে লিয়া স্নান করাইল।।'

আশীর্বাদ বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেলে পুরোহিতকে সঙ্গে নিয়ে বরপক্ষ থেকে কনেকে এবং কনেপক্ষ থেকে বরকে আশীর্বাদ করার জন্য বাড়িতে গিয়ে স্বস্তিবাচন উচ্চারণের মধ্য দিয়ে ধান-দূর্বা ও কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে স্বর্ণালঙ্কার বা টাকা দিয়ে আশীর্বাদ করার অনুষ্ঠান।

আশীর্বাদ মন্ত্র বিয়ের কাজ সুসম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর উপস্থিত আত্মীয়স্বজনদের সম্বোধন করে আশীর্বাদ করার জন্য পুরোহিত যে মন্ত্র উচ্চারণ করেন তার বাংলা অর্থ— 'হে দর্শকগণ, এই বধূটি মঙ্গলযুক্তা, মাঙ্গল্যসূচক অলংকারাদি পরিহিতা, এর কাছে আসুন। একে দেখুন, তার পর একে আশীর্বাদ করুন।'

আশিব্বাদি বিয়ের আশীর্বাদের অনুষ্ঠান।

উ

উলু বিয়ের অনুষ্ঠানে স্ত্রীলোকেরা যে মঙ্গলসূচক মুখধ্বনি করে।

উরুলি উলু। উলুর লৌকিক নাম।

উদক-স্পর্শিতা বিয়ের জন্য যার মাথায় আশীর্বাদের জলের ছিটা দেওয়া হয়েছে।

উদ্বাহবন্ধন বিবাহবন্ধন।

উপহার বিবাহের আসরে 'উপহার' শীর্ষক বিয়ের পদ্য বিলি করা হত। উৎসাহী লেখক হিসেবে নাম থাকত দাদু-দিদিমা, বন্ধুবান্ধব, মা-বাবা, বৌদিরা, দাদারা, ভাগনে-ভাইপোরা, ছোট ভাইবোনেরা, দিদি-জামাইবাবুরা ইত্যাদি।

উপবেশন বিধি বিবাহে আসনে বসার নিয়ম। পশুপতি পণ্ডিত তাঁর পদ্ধতিতে লিখেছেন— 'অথ কন্যাদাতা পূর্ব্বাভিমুখোপবিষ্টস্য বরস্য অগ্রতঃ পশ্চিমাভিমুখ উপবিশতি। কন্যাঞ্চ পশ্চিমাভিমুখীং ক্রোড়স্থানে উপবেশ্য কন্যাবরৌ সম্মুখীনৌ কারয়তি'— অনন্তর কন্যাদাতা পূর্বমুখে উপবিষ্ট বরের সম্মুখে পশ্চিম দিকে মুখ করে বসবেন এবং কন্যাকেও পশ্চিম দিকে [বরের দিকে] মুখ করে নিজের কোলের কাছে বসিয়ে বর-কন্যা পরস্পরের শুভদৃষ্টি করাবেন।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দনও তাঁর উদ্বাহতত্ত্বে 'কন্যাদাতা পশ্চিম মুখে এবং কন্যা গৃহীতা পূর্বমুখে বসবেন' এই ব্যবস্থা দিয়েছেন। প্রাচীন কালে এই নিয়ম ছিল না, তখন দাতা পূর্ব মুখে এবং গ্রহীতা উত্তর মুখে বসতেন। একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে এই নিয়মের পরিবর্তন হয়েছিল। কাশীখণ্ড গ্রন্থে শিব বিবাহ-তে লেখা রয়েছে হিমালয়ের বাড়িতে কন্যাদানের জন্য কন্যাদাতা হিমালয়ের আসন পূর্ব মুখ এবং বর-শিবের আসল আসন উত্তর মুখ করে পাতা ছিল কিন্তু—

'ভবানীর ভাবে হর টলিতে টলিতে।
গিরির আসনে গিয়া বসিলা ত্বরিতে।।
বিধি তাহে বিধি দিলা হইল নিয়ম।
তদবধি বিবাহে হৈল ব্যতিক্রম।।

ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে এ কথা লিখেছেন। প্রাচীন শ্লোকেও এ কথা লেখা রয়েছে—

'উপবিষ্টস্ত্রিনেত্রস্তু প্রাচীং দিশমুদৈক্ষতে।
সপ্তর্ষিসেবিতামাশাং শৈলেন্দ্রোহপ্যবলোকয়ৎ।।'

ত্রিলোচন শিব বিবাহকালে পূর্বদিকে মুখ করে বসলেন এবং গিরিরাজ হিমালয়ও উত্তরমুখে উপবেশন করলেন।

শাস্ত্রকারেরা বিধান দিলেন— 'নিরগ্নিক কন্যাদাতা উত্তর মুখে বসে কন্যাদান করবে'। পশুপতি পণ্ডিত, ভবদেব ভট্ট ও স্মার্ত্ত রঘুনন্দন পরবর্তী কালে কন্যাদাতাকে উত্তর দিকের পরিবর্তে পশ্চিম দিকে [ঠিক বরের সামনে] মুখ করে বসিয়েছেন। ভট্টভবদেব লিখেছেন:

'প্রাঙ্, মুখাভিরূপায় বরায় শুচি সন্নিধৌ।
দদ্যাৎ প্রত্যঙ্মুখঃ কন্যাং ক্ষণে লক্ষণসংযুতে।।

পূর্ব মুখে উপবিষ্ট অভিরূপ [সুন্দর] বরকে শুচির [অগ্নির] নিকটে শুভলক্ষণ সংযুক্তকালে বা লগ্নে পশ্চিম মুখে উপবিষ্ট কন্যাদাতা কন্যাদান করবেন।

এ

এয়ো বিবাহ উপলক্ষে হলুদকোটা, জলভরা, বরণ করা প্রভৃতি লোকাচার, যে অনুষ্ঠানগুলি পাঁচ, সাত বা ন'জন সধবা মহিলা মিলে করে থাকেন। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের কবিগণ এয়োকে 'আইয়' শব্দে পরিচিত করিয়েছেন। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে দেখা যায়:

'সকল আইয় মেলি   মঙ্গল হুলাহুলি
আনন্দে মনসারে লৈয়া।
আমলা তৈলি দিয়া   হরিদ্রা মাখাইয়া
স্নান করাইল গিয়া।।'

ক

কঙ্কন বিয়ের অধিবাস অনুষ্ঠানের দিন দূর্বা-তেল-হলুদ ভেজানো নতুন কার্পাস সুতো যা বরের ডান হাতের ও কনের বাম হাতের মণিবন্ধে বেঁধে দেওয়া হয়।

কড়ি বিবাহের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের স্ত্রী-আচারের অত্যাবশ্যক উপকরণ হল কড়ি। বরণডালার উপর অন্যান্য সামগ্রীর সঙ্গে কড়ি সাজানো হয়। আনুষ্ঠানিক স্নানের পর কড়ির উপর উপুড় করে রাখা মাটির পাত্র পা দিয়ে ভাঙার নিয়ম।

আকৃতি সাদৃশ্যে চিৎ-করা অর্থাৎ ওলটানো কড়িকে নারীর যৌন-অঙ্গের প্রতীক ধরা হয়। বিয়ের সময় নতুন বরবধূর কড়ি খেলার সময় কড়িগুলি চিৎ হয়ে পড়লে মেয়েরা ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দেয় সঙ্গমকাল সুখের হবে।

দুধে-আলতার কল্পিত পুকুরে অর্থাৎ রেতঃ ও রজঃ-এর মিলিত আধারে কড়ির সন্ধানের মধ্যে রয়েছে কামকেলির লুকোনো রহস্য।

কড়ি খেলা বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর বাসরঘরে বধূর বান্ধবীগণ পরিবেষ্টিত হয়ে, পাটির উপরে বসে আইহাঁড়িতে রাখা হলুদমাখা চাল ও ২১টি কড়ি-সহ সরা দিয়ে ঢেকে বধূর সামনে রাখা হয়। ঢাকনি উঠিয়ে একবার বর সেগুলি ফেলে দিলে, বধূ সেগুলি উঠিয়ে রাখে। আবার বধূ ছড়ালে বর কুড়িয়ে তোলে। এই ভাবে তিন বার, পাঁচ বার বা সাত বার করার পর বধূর জিত হয়েছে এবং বরের হার হয়েছে এই রায় বধূর বান্ধবীরা দিয়ে থাকে।

অনেক জায়গায় খেলা শেষে পরাজিত বরের হাতে একটি নোড়া চেপে ধরা হয় এবং বধূর জন্য কোনও যৌতুকের প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্যন্ত বরকে মুক্তি দেওয়া হয় না।

কর্তা বর শাস্ত্রে বিবাহে বরকে 'কর্তা' এবং কন্যাকে 'কর্ম' রূপে দেখানো হয়েছে।

কনকাঞ্জলি বিয়ে করতে যাওয়ার সময় কোথাও বররূপী পুত্র সোনা বা রুপো-সহ সতণ্ডুল মায়ের আঁচলে দান করার আঞ্চলিক অনুষ্ঠান।

উত্তরবঙ্গে কোনও কোনও সমাজে বরকে যখন বরণ করা হয় তখন বর শাশুড়ির আঁচলে এক মুষ্ঠি পান-সুপারি ও একটি টাকা ফেলে দেয়, এই প্রথাটিও কনকাঞ্জলি নামে পরিচিত।

রূপকাশ্রিত এই অনুষ্ঠানে কন্যা অবস্থায় পিতার কাছে অন্নঋণ থাকে, ঋণী ব্যক্তিকে দান করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, তাই বিয়ের আগে পিতার হাতে এক মুঠো ধুলো [কোথাও ইঁদুর-মাটি] দিয়ে বলে 'সোনামুঠি নিয়েছিলাম, ধুলোমুঠি দিয়ে শোধ করলাম।'

কনে বিয়ের পাত্রী।

কনে চন্দন বিয়েতে কনের মুখে চন্দন দিয়ে যে চিত্রাঙ্কন করা হয়।

কনে দেখা ছেলের জন্য পাত্রী দেখা। বরপক্ষ পুত্রের বিবাহের কারণে যে কন্যাকে দেখতে যায়। কনে দেখার জন্য আগে ঘটকের তেমন প্রয়োজন হত না, মা-বাবা অথবা নিকট আত্মীয়স্বজনের চেষ্টাতেই বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হত। বিয়ের কথাবার্তা শুরু হলে বাড়ির মেয়েদেরই আগে কনে দেখতে পাঠানো হত।

কনের মহাপায়া বিয়ের পর কনে যে ডুলি-পালকিতে শ্বশুরবাড়ি যেত। মহেন্দ্রনাথ

দত্ত এই যান প্রসঙ্গে জানিয়েছেন— 'কনে যাইবার জন্য মহাপায়া থাকিত অর্থাৎ একটা ভাল রকমের ডুলি হইত। কনে ও তাহার সম্মুখে ঝি বসিত এবং মাঙ্গলিক বস্তু তাহাতে থাকিত। সেটা নানা রকম করে সাজানো হইত এবং লাল মখ্‌মলর জরির কাজ করা উপরে এক ঘেরাটোপ— কনের যান সই ছিল।'

কন্যা শাস্ত্রে বিবাহযোগ্যা দশ বছরের মেয়েকে কন্যা বলা হয়েছে।

কন্যাতি কন্যাযাত্রী, আঞ্চলিক উচ্চারণ।

কন্যাকর্তা কন্যা সম্প্রদান করেন যিনি। কনের মামাকে শ্রেষ্ঠ সম্প্রদানকর্তা মনে করা হয় বলেই মামাই কন্যাকর্তা হিসেবে কন্যা সম্প্রদান করে থাকেন।

কন্যা-গত-কুল রাঢ়ী শ্রেণির কুলীন ব্রাহ্মণদের কন্যার যদি অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের ঘরে বিবাহ হত, তা হলে সেই কন্যার পিতা এবং তাঁর অধস্তন সন্তানসন্ততি সকলেই সেই নিম্নস্তরের দোষপ্রাপ্ত হত। এই দোষকেই কন্যা-গত-কুল বলা হত।

কন্যাদান বিবাহ অনুষ্ঠানে বরের হাতে কনেকে সম্প্রদান করার অনুষ্ঠান।

কন্যাদাতা শাস্ত্রানুসারে পিতা, পিতার অনুমতিতে ভ্রাতা, এই দুই ছেলের পর মাতামহ, মাতুল বিবাহে কন্যাদানের অধিকারী।

কন্যাদায় কন্যার বিবাহের গুরুদায়িত্ব। কনের বিয়ে দেওয়ার মতো কঠোর কর্তব্য।

কন্যাধন বিবাহে কন্যা উপহার হিসেবে যে ধন লাভ করে।

কন্যাপক্ষ বিবাহ অনুষ্ঠানে কনের দিকের আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব।

কন্যাপণ বিয়েতে পাত্রপক্ষের কাছ থেকে কনের জন্য যে অর্থ পণ হিসেবে পাওয়া যায়। কথায় বলত 'কনের মা কাঁদে, টাকার পুটুলি বাঁধে।'

কন্যাবিক্রয় বিবাহ অনুষ্ঠানে কন্যাদান করার সময় শুল্ক নামক মূল্য গ্রহণ করা হলে তাকে কন্যাবিক্রয় বলা হয়।

কুলীন কন্যার পিতারা এক সময় সত্যি সত্যিই বিয়ের নামে কন্যা বিক্রয় করতেন। এই নিয়ে দর কষাকষিও করতেন। ১৮২৫ খ্রি. ৫ মার্চ তারিখে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'প্রকাশক মহাশয়েষু'র নামে পত্রে ঘটক ও কন্যার পিতার কথোপকথনের বিষয়টি দেখলেই তা পরিষ্কার হবে:

'ঘটক কহিলেন... পাত্র উত্তম কোন অংশে ক্রটি নাই জাত্যাংশে কুলের মুখুটী দাশু বাঁড়ুয্যার সন্তান কাশ্যপ গোত্র নাম নকুড়মোহন গাঙ্গুলী কিন্তু চক্রবর্ত্তিরূপে খ্যাত। পাত্র গুণবান সিদ্ধিফলা জানে এইক্ষণে পাণ্ডববিজয় পড়িতেছে এবং চাকরি আছে নাগসরকারের বাটীতে ঠাকুরের সেবা করে। [কন্যার পিতা শ্রীকেনারাম] ঘোষাল কহিলেন সে সকল কন্যার কপাল সম্প্রতি পণাপণের ফি ৪০০ টাকা অনেকে কহে

কিন্তু পাঁচ বৎসরের কন্যার পণ ৫০০ টাকার কম হইলে মুনাফা থাকে না ইহাতে যদ্যপি সম্মত হন তবে কর্ত্তব্য কেননা ঘরবর ভাল।'

ওই বছর ১৮ জুন তারিখের সংবাদ থেকে জানা যায়— 'চমাং বর্দ্ধমান হইতে এক বৈষ্ণবী আপন দ্বাদশ বর্ষীয়া সুন্দরী কন্যা সমভিব্যাহারে মোং কলিকাতায় বাবু রামদুলাল সরকারের শ্রাদ্ধের দান উপলক্ষে আসিতেছিল তাহাতে মোং ফরাসডাঙ্গায় আসিয়া... বৈষ্ণবী ধন লোভে শ্রীযুত রাজা কিষণচাঁদ রায় বহাদরের নিকট যাইয়া ঐ কন্যাকে ১৫০ দেড় শত টাকায় আপন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিক্রয় করিয়া দেশে প্রস্থান করিয়াছে।'

কন্যাযাত্র কন্যাযাত্রী, লৌকিক উচ্চারণে।

কন্যাযাত্রী বিবাহ অনুষ্ঠানে বরের বাড়িতে বউভাত বা নববধূ পরিচয় অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত কনেপক্ষের আত্মীয়গণ।

কন্যাশুল্ক বিবাহে কন্যা যে ধন পায়। বিয়ের পণ। কন্যা দান করতে যে শুল্ক গ্রহণ করা হয়।

কন্যা সম্প্রদান প্রাচীনকালে পিতামাতার কাছে গরু-ছাগল পশু যেমন 'সম্পত্তি বিশেষ' ছিল, পুত্র-কন্যাও তেমনই ছিল। তাই পিতামাতা একত্র হয়ে দান-বিক্রয়ে সন্তানকে হস্তান্তর করতেন, যেমন তিনটি কড়ি বা পাঁচটি কড়ি দিয়ে পুত্র বিক্রি করে দিলে ছেলেদের তিনকড়ি, পাঁচকড়ি নাম হত। ঠিক এমনই বিয়ের সময় পিতা কন্যাকে বরের হাতে প্রদান করলে তবে কনের উপর বরের স্বত্ত্ব-সামিত্ব জন্মাত। এ কারণেই মনু সম্প্রদানকে 'সামিত্বের কারণ' বলেছেন। পরে সমাজ উন্নয়নের ফলে পুত্র-কন্যার উপর থেকে পশুবৎ ভাবনা দূরীভূত হয়। মহাভারতে সুভদ্রার বিবাহে শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেছিলেন— 'প্রদানমেব কন্যায়াঃ পশুবৎ কোহনুমন্যতে' অর্থাৎ কোনও ভদ্রলোক পশুর হস্তান্তরের মতো কন্যাকে 'দান' করার প্রথার অনুমোদন করতে পারেন?

যৌবনবিবাহের পরিবর্তে যখন সমাজে বাল্যবিবাহ বা শিশুবিবাহের প্রথা প্রবর্তিত হয় তখন কন্যার বিবাহে 'সম্প্রদান' ব্যাপারটা বিবাহের প্রধান অঙ্গ হয়ে পড়ে।

কর্মকন্যা শাস্ত্রমতে বিবাহে কন্যা হলেন 'কর্ম' এবং বর হলেন 'কর্তা'।

করমী ঘটক। করমী শব্দটা খুব প্রাচীন। মৈমনসিংহ গীতিকায় 'মাঘ মাসে করমী আইল হীরা ধরের বাড়ি'তে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

কর সূত্র বিবাহে মাঙ্গলিক চিহ্ন হিসেবে হাতে যে সুতো বাঁধা হয়।

কলাতল ছাদনাতলা। বিয়ের জায়গা।

কলাতলা ছাদনাতলা। বিয়ের জায়গা। সমান চতুর্ভূজ জায়গায় চার কোণে চারটি

কলা গাছ পুঁতে, সেগুলিকে কোথাও সুতোর বেষ্টন, কোথাও পাটের দড়িতে মাটির ছোট মুচি ঝুলিয়ে দিয়ে কলাতলা তৈরি করা হয়।

এই কলাতলায় একটি শিল ও একটি নোড়া পাতা থাকে, তার উপর বসিয়ে বর ও কনেকে বিয়ের স্নান করানো হয়। একে 'কলাতলায় স্নান' বলে।

পূর্ব-বাংলায়, বর্তমান বাংলাদেশে বাসি বিয়ের কাজ এই কলাতলাতে অনুষ্ঠিত হয়। এর মাঝে একটি পুকুর কেটে তার চারিদিকে সাত পাক ঘোরা ও পুকুরে আংটি খেলা হয়।

কলাতলায় স্নান বিয়ের অনুষ্ঠানে উঠোনের মাঝে চারিদিকে চারটি কলাগাছ পুঁতে, মাঝখানে একটি শিল রেখে তার উপরে বর বা কনেকে বসিয়ে স্নান করানো হয়।

কাজললতা পশ্চিমবঙ্গের বহু অঞ্চলে বিয়ের দিন কনের হাতে কাজললতা, বরের হাতে রুপোর জাঁতি রাখতে হয়। বিয়ের যাবতীয় অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত এগুলি হাতে রাখার নিয়ম, ফুলশয্যার দিন এয়োরা কনের হাতের কাজললতা ও বরের হাত থেকে জাঁতি নিয়ে নেয়।

কামসিন্দুর বিবাহিত নববধূর সিঁথিতে যে উজ্জ্বল রক্তবর্ণের সিঁদুর দেওয়া হয়।

কাড়োয়া দিনাজপুরের আঞ্চলিক ভাষায় ঘটক।

কালরাত্রি ভয়ঙ্কর রাত্রি। অশুভ রাত্রি, বিয়ের দ্বিতীয় রাতকে কালরাত্রি বলে। এই দিন বর কনে এক ঘরে রাত কাটায় না। কোথাও কোথাও বিয়ের তৃতীয় রাত্রিকে কালরাত্রি বলে। মনসামঙ্গলে বিয়ের প্রথম রাতেই সর্প দংশনে লখিন্দরের মৃত্যু হয়েছিল বলে প্রথম রাতই 'কাল রাত' হয়েছিল। এই কারণে বিয়ের রাতে বাসর জাগার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

কুলকরা প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ, কায়স্থদের মধ্যে 'কুল করা' প্রথা প্রচলিত ছিল। কুল করার অর্থ মেয়েকে এক কুলীনের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বাড়িতে পোষা। কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে উপযুক্ত বর না পেলে মেয়ের বিয়ে দিত না, অবিবাহিত থাকা সেও ভাল কিন্তু কুল ভঙ্গ করে বিয়ে দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল।

কুল মর্যাদা বিবাহ অনুষ্ঠানে কুলের অর্থাৎ বংশের ঐতিহ্যানুসারে প্রাপ্য সম্মান বিষয়ে সচেতন থাকা।

কুলাচার কুলের বা বংশের রীতি। দেশে প্রচলিত শিষ্টাচার। নিজের গোত্র পরম্পরায় যে ধর্মক্রিয়া পালন করা হয়।

কুলাচার্য ঘটক। 'স্মৃতিতে সেকাল'-এর কথায় যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন— 'সেকালে দেশ বিখ্যাত বড় বড় ঘটক ছিলেন, তাঁহাদের চতুষ্পাঠী

থাকিত, সেই চতুষ্পাঠীতে ঘটকালি শিক্ষার্থী ছাত্র থাকিত। ঘটকেরা ব্রাহ্মণদিগের কুলের সংবাদ রাখিতেন বলিয়া, কুলাচার্য্য নামে খ্যাত ছিলেন। সেকালের অধিকাংশ ঘটকেরই 'চূড়ামণি' উপাধি ছিল।'

কুলোয় বিয়ে এক সময় খুব ছোট ছেলে মেয়েদের বিয়ে হত, মহেন্দ্রনাথ দত্ত শুনিয়েছেন সেই কথা— 'বৃদ্ধদের কাছে শুনিয়াছি, এমনকী আমার মাতৃকুলের এক পূর্বপুরুষের বিবাহে বরের হাতে একটি খেলনা দিয়েছিল এবং মেয়েকে কুলোয় করে শুইয়ে দিলে, বর আর কনের বাপ মন্ত্র পড়িল।... তখনকার দিনে পিঁড়িতে বা কুলোতে ছোট ছেলেদের শুয়াইত, কথায় বলিত কুলোয় শুয়ে তুলোয় করে দুধ খাওয়াবে। যাহা হউক আমাদের শৈশবে কুলোয় শুয়ানো প্রথা ভদ্রলোকের ভিতর কমিয়া গিয়াছিল।'

কুশগ্রন্থির বন্ধন বিবাহে বর-কনের দুই হাত এক সঙ্গে মঙ্গলঘটের উপর রেখে কুশের গ্রন্থি দিয়ে চিরবন্ধন করে দেওয়ার রীতি।

কুশণ্ডিকা বিবাহ-হোম। বিয়ের রাতে বা পরদিন বাসি বিয়েতে যে বৈবাহিক হোম অনুষ্ঠিত হয়।

কোলদামাদ বিয়ের সময় বরের সঙ্গে যাওয়া নিতবর।

কৌমার বিয়ের পূর্বকাল।

কৌলীন্যলোক কুলীন পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিতে কন্যার পিতার চেষ্টা ছিল কল্পনাতীত। কুলীন পাত্রে বিয়ে দিতে পারলে যেন কৌলীন্যলোকে অর্থাৎ স্বর্গের শ্রেষ্ঠ স্থানে তাঁর যাওয়া ছিল অবধারিত। একটি কুলীন পাত্রের চালাকিতে তাঁর শ্বশুর কৌলীন্যলোকে যেতে পেরেছিলেন কি না সেই প্রশ্ন তুলে ঘটনাটি যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন: 'আমাদের পরিচিত একজন কুলীন ব্রাহ্মণের দুই কন্যা ছিল, পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁহার কিছু জমি ছিল এবং সাত-আট হাজার টাকা নগদ ছিল। তিনি তাঁহার প্রথমা কন্যার সমান ঘরে অর্থাৎ কুলীনর সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন, দ্বিতীয় কন্যা অবিবাহিতা ছিল, তাহার জন্য তিনি পাত্র অনুসন্ধান করিতেছিলেন, তাঁহার নগদ টাকা তিনি কোথায় লুকাইয়া রাখিতেন, তাহা তাঁহার পত্নী ব্যতীত আর কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা কোনওরূপে পিতার গুপ্তধনের সন্ধান পাইয়া তাহা নিজ স্বামীকে বলিলে তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া সেই টাকা অপহরণ করিল। কয়েক দিন পরে সেই ব্রাহ্মণ জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার সমস্ত নগদ টাকা তাঁহারই কন্যা ও জামাতার দ্বারা অপহৃত হইয়াছে। তখন তিনি জামাতার বাড়িতে গিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন যে, তাঁহার অবিবাহিতা

কন্যার বিবাহ দিতে হইবে, সেই জন্য তাঁহার টাকার কিয়দংশ জামাতার নিকট দাবি করিলেন। তাহা শুনিয়া তাঁহার জামাতা বলিল, 'আপনার অবর্তমানে আপনার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আপনার এই দুই কন্যাই পাইবে, তা আপনি যদি এক কাজ করেন, তাহা হইলে সকল গোলমাল মিটিয়া যায়। আপনার দ্বিতীয়া কন্যাকে আমার হাতেই সম্প্রদান করুন; আমি যদি আপনার দুইটি কন্যাকে বিবাহ করি, তাহা হইলে আপনার সম্পত্তি লইয়া কাহারও সহিত ভাগ-বাঁটোয়ারা করিতে হইবে না, আপনিও কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাইবেন।' শ্বশুরমহাশয় দেখিলেন, এই প্রস্তাব অতি সমীচীন; তিনি জামাতার প্রস্তাবে আনন্দ সহকারে সম্মত হইয়া তাহারই সহিত দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ দিলেন। সেই শ্বশুরমহাশয় অনেক দিন হইল লোকান্তরে— সম্ভবত কৌলীন্যলোকে গমন করিয়াছেন।'

কৌলীন্যমর্যাদা কুলীন ব্রাহ্মণের পাত্র হলেই সেকালে শ্রেষ্ঠ পাত্রের মর্যাদা পেত। প্রয়োজন ছিল না, বিদ্যা, বুদ্ধি, রূপ, গুণ, স্বভাব-চরিত্র, বিষয়সম্পত্তি বা বয়স। কৌলীন্যমর্যাদার কারণেই তাঁদের বিয়ে হত। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্র তাঁর লীলাবতী নাটকে নদেরচাঁদের বিয়ের বর্ণনা করেছেন। নদেরচাঁদ মূর্খ, অসভ্য, অশিক্ষিত। সব রকম মাদক সেবনে অভ্যস্ত। হীনচরিত্র ও অতি কদাকার— তা সত্ত্বেও একজন ধনবান জমিদার তাঁর একমাত্র কন্যা রূপেগুণে অতুলনীয়া লীলাবতীকে সেই নদেরচাঁদের হাতে তুলে দিতে আগ্রহী ছিলেন, কারণ নদেরচাঁদ তাঁর থেকে কুলে শ্রেষ্ঠ।

যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় 'স্মৃতিতে সেকাল'-এ কৌলীন্যমর্যাদার একটি অসাধারণ ঘটনার কথা লিখেছেন: 'আমরা শুনিয়াছি আমাদের একজন নিকষ কুলীন প্রতিবেশীর বাঁয়া-তবলা বাজাইবার খুব সখ ছিল, কিন্তু সে গণ্ডমূর্খ এবং মধ্যে মধ্যে চুরি করিয়া লাঞ্ছিতও হইয়াছিল। একবার সে কোনও বিবাহে বরযাত্রী হইয়া গিয়াছিল; সেখানে কন্যাকর্তার বাড়িতে একজোড়া খুব সুন্দর বাঁয়া-তবলা দেখিয়া সে লোভ সংবরণ করিতে পারিল না; চুরি করিল, কিন্তু শেষে ধরা পড়িয়াছিল। কন্যাপক্ষের কয়েকজন লোক যখন তাহাকে পুলিশের হস্তে সমর্পণ করিবার পরামর্শ করিতেছিল, তখন কন্যাকর্তা কোনও সূত্রে জানিতে পারিলেন যে, সেই চোর নিকষ কুলীন, তখন তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, চোর যদি তাঁহার অন্য এক কন্যাকে বিবাহ করে, তাহা হইলে তিনি আর পুলিশ ডাকিয়া কোনও গোলমাল করিতে দিবেন না। চোর জেলে যাওয়া অপেক্ষা বিবাহ করা শ্রেয় মনে করিয়া কন্যাকর্তার প্রস্তাবে সম্মত হইলে কন্যাকর্তা সেই রাত্রেই তাঁহার প্রথমা কন্যাকে পূর্বনির্দিষ্ট পাত্রে এবং দ্বিতীয়া কন্যাকে

সেই চোরের হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বীয় বংশমর্যাদা উজ্জ্বল করিলেন। এইরূপ জানিয়া শুনিয়া, হীনচরিত্র মূর্খ, মদ্যপ কুলীন সন্তানকে জামাতৃপদে বরণ সেকালে বিরল ছিল না।'

কৃতকৌতুকমঙ্গলা যার গায়ে হলুদ বা আইবড় ভাত হয়েছে।

খ

খাস গেলাস পুরনো কলকাতায় বরের শোভাযাত্রায় যে আলোকসজ্জা হত তার নাম ছিল 'খাস গেলাস'। এই খাস গেলাসের কথায় মহেন্দ্রনাথ দত্ত জানিয়েছেন— 'আগে বিবাহ উপলক্ষে বরের শোভাযাত্রা কালে খাস গেলাসের ঝাড় হইত। মাটির ছোট ছোট মোমবাতি রাখিবার এক রকম বাতিদান হইত অর্থাৎ মাটির একটা খুরি করে তার মাঝখান থেকে উপর নীচে দুটো এক ইঞ্চি করে চোঙা থাকিত। অভ্রের গেলাস করে লাল কাগজের পাড় দিয়া গেলাসটার উপর দিক ও নিচের দিক জুড়িতে হইত, দেখিতে একটু বাহারি হইত এবং আলগা অভ্রটাও পড়িয়া যাইত না। সেই অভ্রের গেলাসটা খুরির উপর আঠা দিয়ে বসানো হইত। আর তার ভিতর একটি মোমবাতি থাকিত এবং এই মাটির খুরিটা একটা বাখারির ডাল বা ডাণ্ডার উপরে আটকানো হইত। এইরূপে আটটা দশটা ডাল দিয়ে একটা ঝাড় হইত। একটি বাঁশের লম্বা ডাণ্ডা থাকিত এবং তার গায়ে বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে এই বাখারির ডাল হইত, তাতে দশ বারোটি খাস গেলাস থাকিত। প্রথম প্রথম দেখিয়াছি মোমের বাতির প্রচলন ছিল, চর্বির বাতি তত নয়। কিন্তু অল্প দিনের ভিতর মোমের বাতি দুষ্প্রাপ্য হইল এবং চর্বির বাতি চলিল। সমারোহপূর্ণ বিবাহেতে এই খাস গেলাসের ঝাড় লইয়া বরের শোভাযাত্রা হইত।'

পুরনো কলকাতায় বিয়েতে বড়মানুষি দেখাবার জন্য নিত্যনূতন বিষয় উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে চমক দেখাবার চেষ্টা করা হত, এ ভাবেই প্রচলিত হয়েছিল 'খাস গেলাস'। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'কলিকাতায় চলাফেরা'-য় 'সেকাল আর একালে'র কথায় খাসগেলাস প্রসঙ্গে জানিয়েছেন— 'শোনা যায়, বীরু মল্লিক বিবাহে জনযাত্রায় (Procession) সর্ব্বপ্রথম খাস গেলাস প্রবর্ত্তিত করেন। খাস গেলাসগুলি গেলাসের আকারে অভ্রের দ্বারা প্রস্তুত হইত; তাহাতে মোমবাতি বসাইবার ব্যবস্থা থাকিত। সেকালের মোমবাতি আসল তিমি মাছের চর্ব্বি হইতে প্রস্তুত হইত— ছয় আনায় ১৬টী বাতির এক প্যাকেট পাওয়া যাইত। ক্রমে সহসা দেখা গেল যে, Shaw Wallace কোম্পানী তাহাদের বর্ম্মা প্রদেশস্থ কেরোসিন তৈলের ডিপো হইতে এক রকম নকল মোমের প্রস্তুত বাতি আমদানি করিতে লাগিলেন। সেগুলির দাম হইল চার আনায়

এক প্যাকেট; দরিদ্র ভারতবাসী সস্তা দেখিয়াই তাহাই গ্রহণ করিল, আসল চর্ব্বির বাতি অল্প দিনের মধ্যেই উঠিয়া গেল।

বরের চতুর্দ্দোলার দুই পার্শ্বে প্রায় আধপোয়া রাস্তা ধরিয়া খাস গেলাসের ঝাড় চলিত। সেই সময়ে রাস্তার বেকার ছোকরাগুলি বড়ই কাজে আসিত। যিনি যত বড় ধনী, তিনি তাঁহার সাধ্যমত তত বেশী দূর খাস গেলাসের ঝাড় চালাইবার ব্যবস্থা করিতেন। বর যখন কন্যার বাড়ী পৌঁছিতেন, তখন ঐ সকল খাসগেলাসবাহক ছোকরাগণ যে যেদিক পারিত ঐ সমস্ত আধ-পোড়া বাতিশুদ্ধ খাস গেলাসের ঝাড় লইয়া পলায়ন করিত— এইরূপ হট্টগোল সহকারে পলায়ন বলিতে গেলে বিবাহের অঙ্গে পরিণত হইয়াছিল।'

খাসগেলাস বাঁধা বাঁধা খাসগেলাস প্রসঙ্গে ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানিয়েছে— 'হঠাৎ শোনা গেল যে, ৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুর তাঁহার পুত্রের বিবাহে বাঁধা রোশনাইয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে রাঁধা রোশনাইয়ের কথা কাহারও মাথায় প্রবেশ করে নাই। বাঁধা রোশনাইয়ের ব্যাপারটা এই— কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়ী হইল দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীটের পশ্চিম শেষাংশে; কন্যাপক্ষের বাড়ী হইল রামবাগানের কাছাকাছি। উভয়র মধ্যে ব্যবধান প্রায় আধ ক্রোশ; কালীকৃষ্ণ ঠাকুর করিলেন— বাহকদের স্কন্ধে যে সমস্ত খাসগেলাসের ঝড় যাইবার তাহা তো গেলই; উপরন্তু তাঁহার বাড়ী হইতে কন্যার বাড়ী পর্য্যন্ত রাস্তার দুইধারে গ্যাসের আলোর দুইটী লম্বা লাইন বসিয়া গেল। শুনিয়াছিলাম, এই বাঁধা রোশনাই ব্যাপারে কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ন্যূনাধিক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।... এসিটিলীন গ্যাস ও ইলেকট্রিক আলোর ধাক্কায় খাসগেলাস কোথায় লুকাইয়া পড়িয়াছে' (কলিকাতায় চলাফেরা)।

গ

গন্ধ তেল বিবাহের সময় স্নানে ব্যবহৃত তেল। অধিবাস ও গায়ে হলুদে বর কনেকে স্নান করাতে মেথি ইত্যাদি মশলা দিয়ে এয়ো মেয়েরা আনুষ্ঠানিক ভাবে যে সুগন্ধি তেল তৈরি করে। অনেক জায়গায় বরের বাড়ি থেকে যে তেল-হলুদ পাঠানো হয় তা এই গন্ধ তেল।

গাঁইট ছড়া কন্যা সম্প্রদানের পর বর-কনের কাপড়ে গাঁইট ছড়া বেঁধে দেওয়ার নিয়ম। ব্রাহ্মণ বা বর স্বয়ং হরীতকী, পানি আমলা, মোনামুনি, বহেড়া ও সুপারি— এই পাঁচ ফল অথবা দেশাচার অনুসারে অন্য দ্রব্য ও হলুদে ছোপানো গামছায় পুঁটুলি বেঁধে ওই পুঁটুলির দুটি প্রান্ত বর ও কনের উত্তরীয় বস্ত্রের প্রান্তের সঙ্গে বন্ধন করে দেয়। এই বন্ধনকে চিরবন্ধন মনে করা হয়।

গাওনা দ্বিরাগমন। মুর্শিদাবাদে প্রচলিত আঞ্চলিক ভাষা।

গায়ে হলুদ বিয়ের তারিখের দিন সাতেক আগে শুভ দিন দেখে বর-কনের গায়ে হলুদ দেওয়ার লৌকিক অনুষ্ঠান। এই দিন এয়োরা হলুদ কুটে সেই হলুদ বরের শরীরে লাগানো হয়, বরের শরীরে স্পর্শ করা হলুদ, কনের বাড়িতে পাঠানো হয়। কনেকে নতুন বস্ত্র পরিয়ে পাঁচ, সাত বা নয় জন এয়ো কনের কপালে, দুই কাঁধে, বুকে ও পায়ে সেই হলুদ মাখিয়ে দেয়।

এই সময় এয়োরা প্রত্যেকেই অপরের বাঁ হাতের উপর নিজের বাম হাতে রাখে, সবার উপরের বাম হাতের উপর পাথরের একটা ছোট নুড়ি রাখে। এই নুড়িতে সাত বার সাত ফোঁটা তেল দেওয়া হয়। কনের শরীরে যে যে স্থানে হলুদ লাগানো হয়েছিল, তেল মাখানো নুড়ি সেই সেই স্থান স্পর্শ করা হয়। এই সময় উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করা হয়। আজকাল এয়োরা আত্মীয়দের মধ্যে হলুদ মাখামাখি করেন। গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে ঢোল, সানাই প্রভৃতি বাদ্যেরও ব্যবস্থা করা হয়। গায়ে হলুদের পর কনেকে স্নান করিয়ে তার হাতে কাজললতা দেওয়া হয়। এই দিন কনের মা বা মাতৃস্থানীয় কেউ তাকে আলপনা দেওয়া পিঁড়িতে বসিয়ে পঞ্চব্যঞ্জনে অন্ন ও পিঠে পায়েস খাওয়ান।

গায়ে হলুদের গান বিয়ের আগে বর বা কনের গায়ে হলুদ দিয়ে স্নান করাবার সময় সেকালে বয়স্কা মহিলারা গায়ে হলুদের গান গাইতেন। গ্রামের দিকে এখনও এই গান শোনা যায়।

গায়ে হলুদের তত্ত্ব বরের বাড়ি থেকে কনের পিত্রালয়ে পঞ্জিকায় লেখা শুভ দিন-ক্ষণ দেখে বরকর্তা, নাপিত ও অন্য লোকজন নিয়ে বরের গায়ে ছোঁয়ানো হলুদ, আঁচলাযুক্ত লালপাড়ের দেশি বস্ত্র, বেনারসি বা চেলির শাড়ি, গন্ধদ্রব্য, পাটি, সিঁদুরের চুপড়ি বা ঝাঁপি, শাঁখা-লোহা, কাজললতা, জরিপাড়ের কাপড়, স্নানের জন্য চৌকি, তেল ভর্তি পিতলের ঘটি, কাঁসা বা রুপোর চন্দনবাটি, পিতলের প্রদীপ ও পিলসুজ, খাবার কাঁসার থালা-বাটি-গেলাস, রিকাব, মাছ, দই, ক্ষীর, সন্দেশ, পান-সহ পানের ডিবা, পান মশলা ইত্যাদি এবং কনের গায়ে যে পাঁচ এয়ো হলুদ দেবেন তাঁদের জন্য পাঁচটি শাড়ি, পাঁচটি সিঁদুর-চুপড়ি, সিঁদুর-কৌটো, চিরুনি, আয়না প্রভৃতি কনের বাড়িতে তত্ত্বরূপে পাঠানো হয়।

গায়ে হলুদের শাড়ি কনের বাড়িতে বরের শরীর স্পর্শ করা যে হলুদ কনের শরীরে লেপন করে স্নান করানোর জন্য তত্ত্বের সঙ্গে দেওয়া হয়, সেখানে হলুদ রঙের লালপাড় যে শাড়ি পাঠানো হয় সেটি গায়ে হলুদের শাড়ি নামে পরিচিত।

গাঁটছড়া খোলা বিয়ের পর চতুর্থ, অষ্টম বা দশম দিবসে কনের বাপের বাড়িতে মঙ্গলসূত্র ও গাঁটছড়া খোলার অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানের অন্য নাম চতুর্থীমঙ্গল, অষ্টমঙ্গলা, দশমঙ্গলা।

গাঁটছড়া বিবাহ অনুষ্ঠানে সম্প্রদানের পর বরের উত্তরীয়ের সঙ্গে কনের আঁচলের গ্রন্থিবন্ধন। এই সঙ্গে হলুদ ছোপানো নতুন গামছায় হরীতকী, আমলকী, বয়রা, জায়ফল, সুপারি এই পাঁচ ফলের একটি পুঁটলি করে তার এক প্রান্ত বরের উত্তরীয়ের সঙ্গে কনের বস্ত্রাঞ্চলকে একত্র করে বেঁধে দেওয়া হয়।

গাঁটছড়া বাঁধা বিয়ের সময় বরের উত্তরীয়ের সঙ্গে কন্যার বস্ত্রাঞ্চল বাঁধার স্ত্রী-আচার।

গাত্র হরিদ্রা বিয়ের দিন ঠিক হলে, বিয়ের সপ্তাহকালের মধ্যে বর-কনের গায়ে হলুদ দিয়ে স্নান করার অনুষ্ঠান। আজকাল পঞ্জিকায় গাত্রহরিদ্রার দিনক্ষণ লেখা থাকে। অনেক জায়গায় মাসকলাই বাটা, হলুদ ও অন্যান্য জিনিসের সংমিশ্রণে তৈরি হলুদ বর ও কনের গায়ে লেপন করে এয়োরা স্নান করিয়ে দেয়।

গাত্র হরিদ্রার তত্ত্ব বিয়েতে গায়ে হলুদের জন্য বরের বাড়ি থেকে এয়োদের দ্বারা যে হলুদ কোটা হয়ে থাকে তা পাঠানো হয়, সঙ্গে দেওয়া হয় নানা তত্ত্ব।

গাত্র হরিদ্রার দিন এ-পার বাংলা ও-পার বাংলা— দুই বাংলা বিয়ের অনুষ্ঠানে অনেক কিছুরই মিল নেই, যেমন 'গাত্র হরিদ্রা'র দিন। 'স্মৃতিতে সেকাল' গ্রন্থে যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন— 'বিখ্যাত জ্যোতিষী পণ্ডিত ধীরানন্দ কাব্যনিধি মহাশয়কে গাত্রহরিদ্রার জন্য একটা শুভদিন দেখিতে অনুরোধ করিলে 'হিতবাদী'র [পত্রিকার] তদানীন্তন সম্পাদক পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বলিলেন, 'বিবাহের পূর্বে পৃথক একটা দিনে গাত্রহরিদ্রা আমাদের দেশে নাই, ওটা পশ্চিমবঙ্গেই প্রচলিত দেখিতে পাই।' আমি বলিলাম— 'কিন্তু পঞ্জিকাতে তো গাত্রহরিদ্রার দিন শুভকর্মের তালিকায় লেখা থাকে।' তাহাতে তিনি বলিলেন, 'অধিকাংশ পঞ্জিকাই পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়, সেই জন্যই পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত গাত্রহরিদ্রার দিনও পঞ্জিকাতে লিখিতে হয়। আমাদের ত্রিপুরায় বিবাহের পূর্বে একদিন 'অভিষেক' হয়, আপনাদের দেশে অভিষেক বলিয়া কিছু হয় না।'

গ্রন্থিবন্ধন বিয়েতে গাঁটছড়া বাঁধা। বিবাহ বাসরে বরের ডান হাতের উপর কনের ডান হাত রাখলে নারী পুত্রবতী ও সৌভাগ্যশালিনী হয় বলে বিশ্বাস। এই সময় এয়োগণের উলুধ্বনির মধ্যে কুশ দ্বারা দুটি হাত বেঁধে দেওয়া হয়। এই বন্ধন চিরবন্ধন মনে করা হয়।

গ্রন্থিবন্ধন মন্ত্র বিয়ের সময় বর-কনের দু' হাত যখন কুশের গ্রন্থিতে বাঁধা হয় তখন

এই মন্ত্রটি উচ্চারিত হয়—

'ওঁ ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ চন্দ্রার্কাবশ্বিনাবুভৌ।
তে ভবা গ্রন্থিনিলয়ং দধাতাং শাশ্বতীঃ সমাঃ॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, চন্দ্র, সূর্য এবং অশ্বিনীকুমার-যুগল তোমাদের এই বিবাহ বন্ধনের গ্রন্থিতে অবস্থান করুন এবং চিরকাল এই গ্রন্থিকে অবিচ্ছিন্ন ভাবে অটুট রেখে রক্ষা করুন।

গ্রাম খরচা বিয়ের পরদিন কনে নিয়ে বাড়ি যাওয়ার পথে গ্রামের ছেলেরা বরপক্ষের কাছ থেকে যে খরচা পায়।

গ্রামভাঁটি বিয়ের সময় বরপক্ষের কাছ থেকে কন্যাপক্ষীয় গ্রামবাসীরা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য যে অর্থ আদায় করত, অনেকে মনে করেন, গ্রামের ছেলেদের ভাঁটি বা মদ খাওয়ার জন্য অর্থ দেওয়া হত বলে এই নামকরণ। আবার কারও কারও মতে, সেঁজ তোলার অর্থ পায় মেয়েরা, আর গ্রামের ছেলেরা বিয়ের জন্য পায় ভেট বা বকশিস— এ থেকেই গ্রামভাঁটি নামকরণ।

গ্রামভেটি বিয়ের সময় বরপক্ষের কাছ থেকে গ্রামের দেবতা বা গ্রামের সাধারণ ভাণ্ডারের জন্য নেওয়া অর্থ।

গৃহ সাধারণ অর্থে ঘর। স্মৃতি বচনে বলা হয়েছে, পুরুষ স্ত্রীর জন্যই ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চার প্রকার পুরুষার্থ প্রাপ্ত হয় বলে স্ত্রী-ই গৃহ।

গৌড় বচন আর্য সভ্যতার প্রথম যুগে অতিথি সেবার জন্য বছর দুয়েকের একটি গরুকে মেরে তার মাংস রান্না করে মধুপর্কের সঙ্গে রাখা হত। বৈবস্বত মনুর পুত্র পৃষধ্র নামে রাজার যজ্ঞে যজ্ঞীয় পশুর অভাবে অজস্র গো বধ করায় অতিসার রোগের প্রথম আবির্ভাব ঘটে। তখন থেকে গো বধ নিষিদ্ধ করা হয়। এর পর অতিথি সেবায় গরু আনা হলেও তাকে বধ না করে ছেড়ে দেওয়ার প্রথা প্রবর্তিত হয়। নিষেধ বাক্যটিতে বলা হয়:

'ওঁ মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসুনাং
স্বসাহদিত্যানামমৃতস্য নাভিঃ।
প্রনুবোচং চিকিতুষে জনায়
মা গামনাগানদিতিং বধিষ্ট॥ (ঋগ্‌বেদ ৮/১০১/১৫)

এই গাভী রুদ্রগণের মাতা, বসুগণের দুহিতা, আদিত্যগণের ভগিনী এবং অমৃতরূপ দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতির জন্মস্থান, যাদের জ্ঞান আছে, সেই প্রজ্ঞাবান সজ্জনদের আমি এই কথা বলছি— এই নিষ্পাপ অদিতিকে তোমরা কেউ বধ করো না।

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে আর্য সমাজে গো মাংস ভোজন প্রথা একেবারে বন্ধ হয়ে গেলে মধুপর্কের সঙ্গে মাংস দেওয়ার প্রথা উঠে গিয়ে শুধু নিয়মরক্ষায় একটি গরুকে এনে মণ্ডপের কাছে বেঁধে রাখা হয়। শুধু গৃহস্বামী অথবা নাপিত 'গৌঃ গৌঃ গৌঃ' অর্থাৎ 'গরু আছে, গরু আছে, গরু আছে' তিনবার উচ্চারণ করা হয়। 'গৌঃ' শব্দটি দ্রুত উচ্চারণ থেকে গৌ গৌর গৌঃ শব্দটি চলে এসেছে। কন্যাকর্তার গৌ গৌর গৌরঃ বলার সঙ্গে সঙ্গে নাপিতের কিছু অর্থশূন্য হাস্যকর ছড়া কাটা একটি প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ছড়াগুলিকে নগৌরঃ বচন বা গৌর বচন বলা হয়।

ঘ

ঘটক ঘট + ষক (ক) = ঘটক। এর দুটি অর্থ, এক, যিনি কোনও ঘটনা ঘটিয়ে থাকেন। দুই, যিনি বিয়েতে বরপক্ষ ও কনেপক্ষকে কাছে এনে বিয়ে সংঘটন করে দেন। বিয়ের সম্বন্ধ-স্থাপন করা হয় যাঁর মাধ্যমে। বিবাহের বিষয়ে যিনি পাত্রপক্ষ ও পাত্রীপক্ষে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন।

ঘটকী ঘটকের স্ত্রীলিঙ্গে হয় 'ঘটকা' কিন্তু কলকাতার ভাষায় তা হয়েছে 'ঘটকী'। যে স্ত্রীলোক বিবাহের সম্বন্ধ স্থাপন করে দেন। আগে কুলের বিচার করে বংশ পরিচয়ে বিবাহে ঘটকের ভূমিকা ছিল বড়, ঘটক বাড়ির কর্তার কাছে বংশ পরিচয় দিয়ে বিয়ের সম্বন্ধ করাতেন। কলকাতায় হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠার পর জলপানি পাওয়া ছাত্র হয়ে গেল হিরের টুকরো ছেলে। গিন্নি মায়েদের কাছে শিক্ষিত ছেলেদের খবর পৌঁছে দিয়ে বিয়ের সম্বন্ধ করতে ঘটকীদের গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছিল অনেক। উনিশ শতকের মধ্যভাগে কলকাতায় ঘটকী প্রথার সূত্রপাত হয়েছিল বলে মহেন্দ্রনাথ দত্ত জানিয়েছেন— 'আমাদের শৈশবে ঘটক হইতে ঘটকীর প্রথা উঠিল। কারণ বাটীর গিন্নিরা বিবাহকার্যে নিজেদের প্রাধান্য স্থাপন করিলেন।'

শ্রদ্ধেয় অমৃতলাল বসু স্মৃতিকথায় লিখেছেন— 'বিশ্ববিদ্যালয়ের সে এক দিন গেছে; পাশকরা ছেলে তখন [১৮৬৫ খ্রি.] বাঙ্গালা দেশে নূতন চীজ, বি.এ, এম.এ-র ত কথাই নেই; স্কুলের ছেলেদের চোখে বি.এ, এম.এ ডিগ্রিধারী যেন কোন দেবলোক হতে আগত পুরুষ, পুর নারীর চোখে প্রথম ষষ্ঠীবাটায় সমাগত নূতন জামায়ের চেয়ে তার মুখ প্রলোভনীয় দৃশ্য, বঙ্গের সমস্ত শাশুড়ীর সুখের স্বপ্নের সোনার মূর্তি বি.এ, এম.এ-রা।...

পাশ প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই এক প্রকার 'ঘট্‌কী'র সৃষ্টি... আধপাকা চুলে টক্‌টকে সিঁদুর প'রে দু'হাতে সোনার খাড়ু নাড়া দিয়ে 'শিবি ঘট্‌কী'র দল যখন একেবারে

অন্দরমহলরূপ ফোর্ট উইলিয়ামে ঢুকে মেয়ের মা পিসি ঠাকুমারর সামনে 'এনটেন্' পাশ করা ছেলের খবর পৌঁছে দিতে আরম্ভ করলে, তখন পুরুষজাতীয় ঘটকরা আস্তে আস্তে সট্‌কে পড়লেন।

ঘট্‌কী- ওগো, বাছা, তোমাদের একটি বছর নয়েকের মেয়ে বিয়ের যুগ্যি হয়েছে না?

গিন্নী- হ্যাঁ, আছে, কেন?

ঘট্‌কী- একটি ভাল পাত্র আছে, দেবে? মেয়ে কেমন?

গিন্নী- মেয়ে আমার দেখতে হবে না। কোথাকার পাত্র শুনি?

ঘট্‌কী- পাত্র খুব ভাল, কুলীনের ঘর।

গিন্নী- (অগ্রাহ্য ভাবে) আপত্তি নেই।

ঘট্‌কী- কল্‌কেতায় বাড়ীঘর আছে।

গিন্নী- (অগ্রাহ্য ভাবে) তা মন্দ কি?

ঘট্‌কী- ছেলের বাপ-মা বেঁচে।

গিন্নী- (অগ্রাহ্য ভাবে) তা থাক্ গে।

ঘট্‌কী- বাপ বেশ মোটা মাইনের চাকরী করে।

গিন্নী- (অগ্রাহ্য ভাবে) কে— রাণী!

ঘট্‌কী- ছেলেটি দেখতে শুনতে বেশ।

গিন্নী- (অগ্রাহ্য ভাবে) তা ভাল।

ঘট্‌কী- বয়স সবে এই পনেরো পেরিয়েছে।

গিন্নী- হুঁ।

ঘট্‌কী- এক বছর ভাঁড়িয়ে এগজামিন দেছল।

গিন্নী- (একটু মনোযোগের সহিত ঐ একজামা কি বন্নে— দেছল?

ঘট্‌কী- হ্যাঁ গো, ছেলের বাপের আপিসের বড় সাহেবের সঙ্গে কালেজের সাহেবের ভাব আছে কিনা, তাই ষোল বছর লিখে নেছে।

গিন্নী- (সাগ্রহে) তারপর তারপর?

ঘট্‌কী- পাশ করেছে— একেবারে এন্‌টেন পাশ।

গিন্নী- বল কি ঘটক ঠাকরুণ— সত্যি বলছ, বাছা?

ঘট্‌কী- (সোল্লাসে) পাশ বলে পাশ বাছা, একেবারে দশ দশ টাকা জলপানি।

গিন্নী- (সোল্লাসে অগ্রসর হইয়া দুই হস্তে ঘট্‌কীর হস্তধারণ করত) অ বাছা, ঐ বরটি— ঐ বরটি! উমো আমার বড় আদরের মেয়ে। ঐ বরটি তুমি

আমার উমোর জন্যে করে দাও, আমি তোমায় বাল রকম বিদেয় করবো।

ঘট্‌কী- কিন্তু মা, একটু খাঁই আছে, পাশ করা ছেলে ত, আগাগোড়া বাঁউটী সুটের গহনা দিতে হবে, পায়েও গুজরীপঞ্চম পাঁজর তোমাদের-ই দিতে হবে; এ ছাড়া ছেলের খাট-বিছানা, পেতলের দানসামগ্রী, আর রূপোর চারখানা থালা, গেলাস, চন্দনের বাটী আর [পানের] বাটা, আর ছেলের পাথর বসানো আংটি, হার আর বাজু।

নগদ ২/৫ হাজার বা সোনা রূপোর ওজনের কথা, ঘড়ী, ঘড়ীর চেন, রূপোর যোড়শ, আলমারী, কোচ, কেদারাগোছ ফরমাসের স্বপ্ন তখন এম.এ-র বাপ-ও দেখেননি।

গিন্নী- (ইষৎ ভগ্ন স্বরে) তাই ত মা, খাঁইটা কিছু বেশি দেখছি; বাঁউটী সুটের গয়নাতেই সাত আটশো টাকার ওপর পড়ে যাবে, আবার এ সবের ওপর-ও বরযাত্র কন্যাযাত্র আছে, গায়ে হলুদ, আইবুড়ো ভাত এ সব—

ঘট্‌কী- তা বাছা, তারাও কি খরচ করবে না? এই ধর কোমরের গয়না ত তোমরা দিচ্ছ না— কোমরে রুপো পরা ত উঠে যাচ্ছে, ছেলের বাপ সোনার চন্দ্রহার দেবে। শাশুড়ী যে বালা দিয়ে আশীর্বাদ করবে, তা ত ধরা কথা, তার উপর জড়োয়া ঝাপটা (এটা ফাঁকি— তখন টাকা ৩০/৩৫ এর মধ্যে ঝুটো পাথর বসান জড়ওয়া পাওয়া যেত) দেবে, কানে নতুন ইংরেজী গয়না যা হয়েছে,— ইয়ারিং, তা দেবে। তোমরা ছেলেকে বাজু দিও, মেয়েকে শুধু তাবিজ দিও, মেয়ের হাতের বাজু আমি তাদের কাছে আদায় করে নেব। ভাল পরামর্শ চাও ত এ সম্বন্ধ ছেড় না। পরশু একবার হুগলীতে আমায় একটা মেয়ে দেখাতে যেতে হবে, আসতে পারব না, সোমবার আসব' একটা পরামর্শ ঠিক করে রেখ, তারপর দেখাদেখি চুকিয়ে এই বোশেখ মাসেই বিয়ে দিয়ে দেন।

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান]'

ঘটক ও কুলীন বিদায় সেখানে বিয়ের পর ব্রাহ্মণ ও ঘটক বিদায় একটি বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল। ১৮২২ সালের ৯ মার্চ তারিখে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানের সংবাদে জানানো হয়েছে— 'সামাজিক ব্রাহ্মণ ও অধ্যাপকেরদিগের নিমন্ত্রণপূর্ব্বক সমাদরে আনয়ন করিয়া নানাবিধ সম্মান দিয়াছেন এবং দেশ বিদেশীয় ঘটক কুলীন যত আসিয়াছিলেন তাহারদিগের বিবেচনা মত পুরস্কার করণে অতিশয় সুখ্যাতি হইয়াছে' (সমাচার দর্পণ ৯ মার্চ ১৮২২)।

ওই পত্রিকার ১৮২৪ সালের ১ মে তারিখের 'বিবাহ নির্ব্বাহ'-তে লেখেন 'পর দিবস বৈকালে পূর্ব্বমত সমারোহপূর্ব্বক কাশীপুরের বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন ঘটক কুলীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদায় বিষয় বিশেষ জানা যায় নাই, অনুমান হয় যে তাহাও উত্তমরূপ হইয়া সুখ্যাতি হইবেক।'

ঘটকালি ঘটকের কাজ। বিয়ের সম্বন্ধে পাত্র-পাত্রী দুই পক্ষের সঙ্গে যে কথাবার্তা চালানোর কাজ।

ঘর দেখা বরপক্ষের কনে পছন্দ হলে, কনেপক্ষ থেকে বরের বাড়িতে ঘরের অবস্থা দেখতে বরের বাড়িতে যাওয়ার অনুষ্ঠান।

ঘর বর চাওয়া বিয়ের কথা পাকা করার আগে কনেকর্তা বা কনেবাড়ির লোক বর ও বরের বাড়ির অবস্থা দেখতে আসা ও কথার বলার প্রসঙ্গ। প্রাচীন এই রীতিটির উল্লেখ রয়েছে মৈমনসিংহ গীতিকায়:

'বাপের নাই সে উঠে মন হইল বিষম লেঠা।
ঘর বর পছন্দ হইল বংশে আছে খুটা।।'

ঘর বর স্থির বিয়েতে কোন ঘরে ছেলে বা মেয়ের বিয়ে সেই বিষয়টিই বড় ছিল, এখনও আছে। মহেন্দ্রনাথ দত্ত এ বিষয়ে জানিয়েছেন— 'বিবাহের প্রথম অনুচর ঘটক।... প্রথমত, ঘটক আসিয়া পাত্রপাত্রীর কথা স্থির করিত। তার পর পাড়ার বৃদ্ধেরা ঘর বর স্থির করিত অর্থাৎ কোন ঘরের সহিত কোন ঘর বা কোন বংশের সহিত কোন বংশের বিবাহ হইতে পারে এটা স্থির করা, ইহা বড় জটিল ব্যাপার ছিল। অমুক বংশের এই দোষ, আর অমুক বংশের ওই দোষ এই নিয়ে ঘোঁট চলিত। এই নদী সাঁতরে পার হতে পারলে তবেই বিবাহ।'

চ

চতুর্থী হোম বরের বাড়িতে বিয়ের রাত থেকে চতুর্থ রাত্রে মধ্যভাগে এই হোম করা হত। এই হোমের সময় বধূ বরের ডান দিকে বসত। এই হোমকে বিবাহ-হোমের শেষাংশ বলা হয়। এই হোম এখন আর করা হয় না।

চাইলন বাতি পূর্ব বঙ্গে বর্তমান বাংলাদেশের অনেক জেলায় বরণডালা এই নামে পরিচিত।

চাল খেলা বর-কনে মঙ্গল হাঁড়ি নিয়ে খেলা করে। এর মধ্যে হলুদ মাখানো চারটি কড়ি, একটি সুপারি, একটি কলা, একটি মোড়া পানের বিড়া, চারটি আস্ত হলুদ ও কিছু চাল থাকে। বর তিন বার ওই চালগুলি চালে, কনে তা তুলে দেয়। বর প্রত্যেকবার কনের নাম করে একটি ঢাকনা দিয়ে ওই মঙ্গল হাঁড়ির মুখ বন্ধ করে

দেয়। অনেক সময় হাঁড়ির বদলে দুটি সরা দিয়ে কাজ সারা হয়।

চুমানো মেদিনীপুরে আঞ্চলিক ভাষায় বর-কনেকে কপালে চুম্বন এঁকে আশীর্বাদ করা।

চেলী বিয়েতে যে রেশমি বস্ত্র ব্যবহার করা হয়।

চোরপানি বিয়েতে জলভরার স্ত্রী-আচার অনুষ্ঠান। ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে কনের বাড়িতে ভোর না হতে কনের মা-বাবা এক সঙ্গে বস্ত্রাঞ্চলে গিঁট বেঁধে এয়োদের নিয়ে কোন জলাশয়ে জল ভরতে যায়। বাবার হাতে থাকে খাঁড়া, ছুরি বা কোনও লোহার অস্ত্র আর মায়ের হাতে ও কাঁখে থাকে কলসি। জলে নেমে বাবা খাঁড়া দিয়ে জলের উপর যোগচিহ্ন এঁকে দুবার জল কেটে দেয়, মা সেখান থেকে তক্ষুনি কলসিতে জল ভরে নেয়। বাড়িতে এসে কলসিতে পাঁচটি ফল ও একছড়া মালা রেখে নতুন কাপড় দিয়ে তার মুখ বেঁধে দেয়। কলসিটি যে ঘরে থাকে, রাতে বরকে নিয়ে সেই ঘরেই স্ত্রী-আচার পালন করা হয়।

ছ

ছন্দ বংশের প্রথা

ছলনাতলা লৌকিক ভাষায় ছাঁদনাতলা।

ছড়উনি হাঁড়ি নদিয়া জেলায় প্রচলিত আঞ্চলিক নামে নানা রঙে চিত্রিত বিয়ের মাঙ্গলিক হাঁড়ি।

ছাঁদনাতলা বিবাহস্থান। যেখানে বিবাহের কাজ সম্পন্ন করা হয়। শাস্ত্রে বিবাহ, চূড়াকরণ, উপনয়ন, কেশান্ত ও সীমন্তোন্নয়ন এই পঞ্চকর্ম সংস্কার ঘরের বাইরে মণ্ডপের ভিতর করতে নির্দেশ দেওয়া রয়েছে। ঘরের বাইরে যে স্থানে শুভ বিবাহ কার্য সম্পন্ন হয় সেই স্থানকে ছাঁদনাতলা বলে। এই স্থানে শালগ্রাম চক্র, অন্যান্য দেবতার পট ও ঘট স্থাপিত হয়, এর চার দিকে কলার গাছ পুঁতে রাখা হয়। অবস্থানুসারে এই স্থানকে ফুল, আলো ও অন্যান্য শৌখিন দ্রব্য দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে বিয়ে যে বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়, সেই বাড়ির আঙিনায় চাঁদোয়া টাঙিয়ে তার নীচে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। আবার কোথাও উন্মুক্ত আকাশের নীচে চারটি কলাগাছ বা বাঁশের কঞ্চি পুঁতে তার বেষ্টনীর মধ্যে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

ছাঁদতলায় বিয়ের প্রসঙ্গ-কথায় বিয়ের পদ্যে লেখা হয়েছে—

> 'ছাঁদনা তলায় বরকে ডাকে যুবা এয়োদের দল।
> সভা হতে বরকে নে যায় ছাদনা তলায় সবে।
> শঙ্খ আবার উঠলো বেজে হাজার হাজার রবে।।

কনে আনো সবাই আদেশ, পড়লো আবার সাড়া।
বুকের মাঝে কনের তখন, বাজছে প্রেমের কড়া॥
মন কাঁপছে প্রাণ কাঁপছে উঠছে শিউরে গাঁটা।
সারা দেহ মন্ মন্ মন্, টন্ টন্ টন্ পাটা॥

ছাঁদনাতলায় কনে আনার একটি প্রাচীন বর্ণনায় লেখা হয়েছে— 'পট্টবস্ত্র পরিহিতা কন্যাকে ছাদনাতলায় আনা হয়। তাঁহার মুখাবরণে সিঁথি, মৌড়, ক্রোড়ে চণ্ডী পুঁথি এবং সশীর্ষ ডাব, কবরীতে কাজললতা, গলে পুষ্পমাল্য এবং সর্ব্বাঙ্গে যথোপযুক্ত অলঙ্কার।'

ছাঁদতলার অনেকগুলি আঞ্চলিক নাম রয়েছে, যেমন— ছাদলাতলা, ছানলাতলা, ছাননাতলা, ছলনাতলা।

ছাদলাতলা ছাঁদনাতলার আঞ্চলিক নাম।

ছাননাতলা আঞ্চলিক ভাষায় ছাঁদনাতলা।

ছান্নাতলা ছাঁদনাতলা।

ছানলাতলা ছাঁদনাতলা।

ছায়না কলকাতা ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলে ছাঁদনাতলা এই নামে পরিচিত।

ছায়না তলা 'ছায়না' অর্থে যার দ্বারা ছায়া পাওয়া যায়। 'তল' মানে নীচে, অর্থাৎ মণ্ডপ বা সামিয়ানার নীচে। ছায়নাতলা-ই ছাঁদনাতলা নাম পেয়েছে। প্রাচীনকালে দিনের বেলায় বিয়ে হত। ঘরে বিয়ে হত না, ঘরের বাইরে বিয়ে হত বলে বিয়ের স্থানে চন্দ্রাতপ খাটানোর দরকার হত। এখন রাতে বিয়ে হলেও অনেক জায়গায় অনুষ্ঠান স্থানের উপরে চাঁদোয়া টাঙানো হয়।

ছায়ামণ্ডপ বিবাহস্থানের শাস্ত্রীয় নাম ছায়ামণ্ডপ। কন্যা সম্প্রদানের জায়গা। এটি ছাঁদনাতলা নামেই বিশেষ ভাবে পরিচিত।

ছিরি শ্রী। কথ্যভাষায় বর-বরণের ডালা।

জ

জজ্কা মালদহে প্রচলিত আঞ্চলিক শব্দে বিবাহে স্ত্রীলোকেরা মুখে যে মঙ্গলধ্বনি করে। জোকার।

জলভরা পূর্ববঙ্গে (বর্তমান বাংলাদেশ) বিয়ের দিন বর-কনেকে স্নান করাতে এয়োরা বিশেষ ঘটা করে বাদ্য সহকারে 'জলভরা' গান গেয়ে শঙ্খ ও উলুধ্বনির মধ্য দিয়ে নদী বা পুকুর থেকে জল ভরে নিয়ে আসে। এই জল দিয়ে নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের দিন

থেকে বিয়ের দিন পর্যন্ত আচার সহ স্নান করানো হয়। এটি একটি আনন্দঘন স্ত্রী আচারের অনুষ্ঠান। এই স্নান না হওয়া পর্যন্ত বর-কনেকে খাদ্য গ্রহণ করতে দেওয়া হয় না।

জল সওয়া বিয়ের শুভ কাজে নদী বা পুকুর ঘাটে অনুষ্ঠিত স্ত্রী-আচার।

জল সওয়ার গান জল সওয়া বা জল ভরা অনুষ্ঠানে গুরুস্থানীয় মহিলাদের গান গাইবার প্রথা প্রচলিত ছিল। হারিয়ে গেছে সেই সব লৌকিক সঙ্গীত। জল সওয়ার গানের একটি উদাহরণ:

'সই লো সই মকর গঙ্গাজল
আজ হবে কামিনীর বিয়ে
সইতে যাব জল।
উলু দিয়ে শাঁক বাজিয়ে
বরণডালা মাথায় লয়ে
জলের ঝারা হাতে করে
জল সইতে চল।'

জল সহা প্রাচীনকালে পঞ্চতীর্থ হতে জল সংগ্রহ করে সেই জল দিয়ে বিয়ের অভিষেক কার্যটি সম্পন্ন করা হত। জল সহা সেই অভিষেক ক্রিয়ারই অনুকল্প হিসেবে প্রচলিত রয়েছে।

কোনও কোনও স্থানে বর-কনেকে স্নান করাতে দেবমন্দির ও পাড়া পড়শিদের বাড়ি থেকে সোহাগজল প্রার্থনা করে আনার বিশেষ অনুষ্ঠান। এর অন্য নাম জল সাধা।

এয়োরা প্রথমে দেবমন্দিরে যায় জল আনতে, তার পর প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে জল নিয়ে তাদের পান সুপারি ও মিষ্টি দিয়ে অন্য বাড়িতে যায়। এই ভাবে ঘুরে ঘুরে জলের ঘটগুলো ভরে গেলে তারা বাড়িতে ফিরে আসে এবং এই শুভেচ্ছা-জলে কলাতলায় শিলের উপর বসিয়ে বরের বাড়িতে বরকে ও কনের বাড়িতে কনেকে স্নান করানোর অনুষ্ঠান।

জোকার বিবাহে স্ত্রীলোকদের মঙ্গলসূচক মুখধ্বনি।

জোড়ভাঙা বিয়ের পর বরকে নিয়ে কনে পিত্রালয়ে এলে সেখানে গাঁটছড়া, হাতের মঙ্গলসূত্র খোলার অনুষ্ঠান।

জোড়ামিল বিবাহ অনুষ্ঠানে বর-কনের কোষ্ঠী বিচারে জোড়া-মিল হলে উভয়পক্ষে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের কথাবার্তা শুরু হত।

ঝ

ঝুমুরওয়ালির নাচ সেকালের কলকাতায় বিয়েতে ঝুমুরওয়ালির নাচের প্রচলন ছিল। মহেন্দ্রনাথ দত্ত জানিয়েছেন— 'তখনকার দিনে বিবাহতে গরুর গাড়িতে কাগজের ময়ূরপঙ্খী করে তার উপর ঝুমুরওয়ালির নাচ দিত। ঝুমুরওয়ালিরা সেই ময়ূরপঙ্খীর উপর নাচিত, আর পিছনে একটা লোক ঢোল কাঁশি বাজাইত। তাদের গানের একটা উদাহরণ দিচ্ছি, সেটা [মা] কালীর বর্ণনা, 'মাগী মিনসেকে চিৎ করে ফেলে বুকে দিয়েছে পা, আর চোখটা করে জুলুর জুলুর মুখে নেইকো রা।' তাদের ভাষা অতি গ্রাম্য কিন্তু কাহারও কাহারও ভিতরে বেশ কবিত্ব ছিল। কিন্তু গানের মাথামুণ্ডু বিশেষত্ব ছিল না, তারস্বরে বলিত 'আরে রে' পরে ঝুমুরওয়ালি অতি নিন্দার কথা হইল।'

ত

তত্ত্ব বিয়ের অনুষ্ঠানে কনের বাড়ি থেকে বরের বাড়ি বা বরের বাড়ি থেকে কনের বাড়িতে পাঠানো বস্ত্রালঙ্কার, ফল-ফুল, দই-সন্দেশ, মাছ ইত্যাদি যে উপঢৌকন। এই অনুষ্ঠানের অনেকগুলো নাম আছে যেমন, অধিবাসের তত্ত্ব, গায়ে হলুদের তত্ত্ব, ফুলশয্যার তত্ত্ব, পূজার তত্ত্ব ইত্যাদি।

তেল কাপড় পূর্ববঙ্গে বহু অঞ্চলে বিয়ের আগের দিন বরের বাড়ি থেকে কনের বাড়িতে তত্ত্ব পাঠানো হয়। এই তত্ত্বে বরের শরীরে স্পর্শ করা কাঁচা হলুদ, গন্ধ তেল অবশ্যই পাঠাতে হয়। একে গায়ে হলুদের তত্ত্বও বলে।

দ

দই মাছ বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেলে মালদা অঞ্চলে পাত্রপক্ষের বাড়ি থেকে পাত্রীপক্ষের বাড়িতে দই ও মাছ পাঠাবার যে বিশেষ প্রথা রয়েছে।

দধিমঙ্গল বিবাহের পূর্ব রাত্রে দধিমিশ্রিত মিষ্টান্ন ভক্ষণ। কোথাও কোথাও বিয়ের দিন খুব ভোরে কনের মা কনের কপালে দই ও চন্দনের ফোঁটা দিয়ে এয়োস্ত্রীদের সঙ্গে দই চিড়ে খাওয়ানোর স্ত্রী-আচার। অনেক জায়গায় দই-চন্দনে মেশানো জল একটি পান দিয়ে কনের শরীরে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। কোনও কোনও অঞ্চলে বরকে দই-চন্দনের ফোঁটা দেওয়ার প্রথা রয়েছে। বাংলাদেশে শ্রীহট্টে বর যখন বিয়ে করতে এসে 'কুঞ্জে' গিয়ে দাঁড়ায় তখন কনের মা একটি পর্দার আড়ালে থেকে পেছন হতে বরের হাত দুটি দই দিয়ে ধুইয়ে দেন।

দর্শনী বিয়ের পাকা দেখার পর কনের হাতে দেওয়া আশীর্বাদী অর্থ।

দুটি হৃদয় এক হোক বিবাহ ক্রিয়ার প্রধান উদ্দেশ্য দুটি হৃদয়কে এক করার শপথ

বাক্য পাঠ করানো। ঋগ্‌বেদে (১০/৮৫/৪৭) এই শপথ বাক্যের যে পাঠ লেখা রয়েছে, বিবাহ-মন্ত্র হিসেবে পুরোহিতগণ তা পাঠ করান—

ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বেদেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ।
সম্‌মাতরিশ্বা সং ধাতা সমুদ্রেষ্ঠী দধাতু নৌ॥

হে বিশ্বদেবতাগণ, আমাদের দুটি হৃদয় এক করুন; জল, আমাদের হৃদয় এক করুন। বায়ু, আমাদের বুদ্ধিকে পরস্পরের অনুকূল করুন। বিধাতা এবং সরস্বতী দেবী, আমাদের দুটি হৃদয় এক করুন।

দিনে বিবাহ প্রাচীনকালে দিনের বেলায় বিবাহ সংস্কার হওয়া শাস্ত্রসম্মত বলা হয়েছে। পরবর্তী কালে দিনে বিবাহ নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

দ্বিরাগমন বিয়ের পর নববধূর পিত্রালয় হতে দ্বিতীয়বার পতিগৃহে আগমনের স্ত্রী-আচার। প্রাচীনকালে অল্প বয়সে বিয়ে হত। বিয়ের কয়েক দিন পর কন্যা পিত্রালয়ে ফিরে আসত, পরে যৌবনে পদার্পণ করার পর দ্বিরাগমন নামক সংস্কার করে দ্বিতীয়বার পতিগৃহে চিরদিনের জন্য চলে আসত।

দাসী আনতে যাওয়া বিয়ে করতে যাওয়ার সময় পুত্র মাকে বলে যায়, 'তোমার জন্য দাসী আনতে যাচ্ছি'— এটি প্রাচীন রেওয়াজ।

ধ

ধর্মপত্নী স্ত্রী। ধর্মকে সাক্ষী রেখে বিবাহকর্ম সম্পন্ন হয় বলে হিন্দুর ভার্যা ধর্মপত্নী নামে পরিচিত।

ধুতুরা কাটাইল শ্রীহট্টে বিয়ের দিন আনুষ্ঠানিক স্নানের পর বর ও কনের হাতে কলার মাজ, ধুতুরা, লোহার পেরেক প্রভৃতি সাতটি দ্রব্যের একটি গুচ্ছ দেওয়া হয় তার নাম ধুতুরা কাটাইল। 'কুঞ্জে' মালা বদলের সময় বর-কনে ধুতুরা কাটাইলও বদল করে।

ধুতুরা পিদিম বর বরণের সময় শুকনো ধুতুরার খোলায় সরষের তেলের যে প্রদীপ জ্বালানো হয়।

ধুলাপায়ে গমন বিয়ের প্রথম দিন সর্ব কার্য শুভ মনে করায় শুভ দিনের জন্য অপেক্ষা না করে বিয়ের আট দিনের মধ্যে পতিকে নিয়ে নববধূর 'ধুলা পায়ে গমন' বা ধুলা পায়ে পিত্রালয়ে গমন।

ধ্রুবতারা দর্শন ঋগ্‌বেদীয় পদ্ধতি মতে বধূকে ধ্রুব, সপ্তর্ষি ও অরুন্ধতী তারা দর্শনের কথা লেখা রয়েছে। গৃহ্যসূত্রের মতে 'বিবাহ সংসার সম্পন্ন হওয়ার পর সূর্যদেব

অস্তমিত হলে বধূকে ধ্রুব দর্শন করাবেন।' বর বধূকে ধ্রুবতারা দেখিয়ে মন্ত্রে বলে, 'ধ্রুবতারা দেখো, হে বধূ তুমি ধ্রুবা, শাশ্বতী, অবিনাশিনী হও। যেহেতু তোমাকে ধ্রুবতারা দেখাচ্ছি, তাই আমাতে, আমার সম্পর্কে তুমি শাশ্বতী, পোষণীয়া, আমার সন্তানগণের পালয়িত্রী হও। এই উদ্দেশ্যে ব্রহ্মা, প্রজাপতি তোমাকে আমার হাতে অর্পণ করেছেন। এর পর তোমার সঙ্গে আমার পুত্রপৌত্রাদিযুক্তা হয়ে একশত বর্ষ ধরে জীবন ধারণ করো।'— এই কথা শুনে বধূ বলবে— 'পশ্যামি' অর্থাৎ আমি ধ্রুবতারা দেখছি। প্রাচীন কালে দিনের বেলায় বিবাহক্রিয়া অনুষ্ঠিত হত, তান্ত্রিক যুগে তান্ত্রিকাচারের প্রভাবে রাতে বিবাহকর্ম শুরু হয়— যা আজও রয়েছে।

ন

ননদ পুঁটুলি বিয়ের সময়ে কনের ননদের জন্য যে উপহার দেওয়া হয়।

ননদ পেটারি ননদকে দেওয়া নতুন বউয়ের উপহার।

নবদম্পতি নতুন বর-বধূ।

নবপত্রিকা কবজ ফল, মূল, শস্য তিন রকম উপাদানের নটি গাছকে নবপত্রিকা নামে মহাশক্তি পূর্ণরূপ দুর্গারূপে পূজা করা হয়। কলা, কচু, জয়ন্তী, বেল, ডালিম, অশোক, মানকচু, ধান ও হলুদ-এর অংশ হলুদ ছোপানো সুতোয় বেঁধে নববধূর গলায় কবচ করে ঝুলিয়ে রাখার প্রথা ছিল।

নবসত দ্বিরাগমন, আঞ্চলিক ভাষায়।

নয়াবসত নদিয়া ও মেদিনীপুরের আঞ্চলিক ভাষায় দ্বিরাগমন।

নমস্কারী বিয়ের সময় যে বস্ত্রাদি দিয়ে বর-বধূ গুরুজনদের নমস্কার করে।

নাইওর স্বামীর গৃহ হতে কনের পিতৃগৃহে আসা। অঞ্চলভেদে এর নাম নাইয়র, নাইহর, নৈহর, নায়র, লাইয়র।

নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ বিয়ের শুভ কাজ শুরুর আগে স্বর্গত প্রপিতামহ থেকে ঊর্ধ্বতন চোদ্দোপুরুষের উদ্দেশে শ্রদ্ধাজ্ঞাপক অনুষ্ঠান। ব্রহ্মপুরাণে 'নান্দী' শব্দের অর্থ সমৃদ্ধি কল্যাণ বা উন্নতি যার মুখ বা উদ্দেশ্য তাকেই নান্দীমুখ বলা হয়েছে। বিবাহের পুত্রাদি সমৃদ্ধির আদি কারণ ভাবনায় এই অনুষ্ঠান।

বর অথবা কনে স্নান করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধবাসরে গমন করেন। পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠান শেষে বর অথবা কনে দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুজনদের প্রণাম করে।

নাপিত শুদ্ধ বিবাহ কাজে বর কনেকে নাপিত এসে নখ কেটে না দিলে নাকি গায়ে অশৌচ এঁটে থাকে। তাই বিয়ের দিন নাপিত এসে নখ খুঁটে দিয়ে যায়।

নাপিতের ছড়া বিবাহে শুভ দৃষ্টির সময় যদি কোনও ছেলে-মেয়ে পাশের খুঁটি বা চালের বাতা ধরে থাকে অথবা কোনও ঋতুমতী নারী সেখানে উপস্থিত থাকে তা হলে নাকি দাম্পত্য-জীবন খুব অশান্তিকর হয়; এমনকী বিচ্ছেদ পর্যন্ত হয়ে থাকে। সেই সময় কেউ অন্যমনস্ক ভাবে বা ভবিষ্যৎ অনিষ্ট করার ইচ্ছায় এমন করে তা থেকে বিরত হওয়ার জন্য নাপিত কন্যাপক্ষের হয়ে সেখানে উঁচু গলায় কটূক্তিপূর্ণ নানা রকম ছড়া আবৃত্তি করে থাকেন। যেমন—

'শুন সবে, এবে আমি করি নিবেদন।
ছাঁদনাতলায় এসেছে বর বৃষভ বাহন।।
মন্দলোক থাক যদি, যাও সরে যাও।
ছাউনি নাড়ার সময় হল, এয়োরা দাঁড়াও।।
খুঁটি-খাটা ছেড়ে দাও, ভাতার পুতের মাথা খাও,
যে ধরবে চালের বাতা, সে খাবে ভাতারের মাথা
যে জন করবেক কু, তার বাপের মুখে গু।'

নিছনি ডালা বিয়ের সময় স্ত্রী-আচার অনুষ্ঠানের অঙ্গরূপে সাজানো বরণডালা। 'নিছনি' শব্দের অর্থ আপাদ বা বালাই। সংস্কৃত ভাষায় একে 'নির্ম্মচ্ছন্ন' বলে, প্রাকৃতে এর নাম হয় নিছনি। যে ডালায় বরকে নির্মঞ্ছন করে অর্থাৎ তার অঙ্গ মুছে সব বালাই দূর করার উদ্দেশ্যে যে বিবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্য সাজানো থাকে। স্ত্রী আচারের জন্য পান, সুপারি, হলুদ, সিঁদুর, কড়ি, তেল ইত্যাদি জিনিস দিয়ে বরণডালা সাজানো হয়। স্বামীকে স্ত্রীর বশীভূত রাখার জন্য স্ত্রী-আচারের সময় বরকে বরণডালা দিয়ে বরণ করার রীতি প্রচলিত রয়েছে। সম্ভবত এই কারণেই বরণডালাকে 'ঔষধের ডালা'ও বলে। ধর্মমঙ্গলকাব্যে কর্ণসেনকে বরণ করতে রঞ্জাবতীর মা মন্থরা রাজবাণী উত্থানের থালা হাতে এয়োদের সঙ্গে এসে জামাইকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে চরণে পাদ্য অর্ঘ, দধি ঢালেন, তার পর—

'নানামত ঔষধ করিয়া সাবধানে।
পান নিছিয়া ফেনাইল হুলুই চারিপানে।।'

নিতকনে বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার সময় কনের সঙ্গে যে সখী যায়। বিয়েতে কনের ছোট্ট সঙ্গিনী, কনে সাজে যে তার পাশে বসে থাকে।

নিতবর বিয়ের সময় বরের সঙ্গে বরবেশে যে ছোট্ট কুমার যায়।

নিতে নিমন্ত্রণ। ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনার আঞ্চলিক ভাষা। এর অন্য নাম 'নিতা'।

নিদ্রা কলস বিয়ের দিন অতি প্রত্যুষে কনের মা ও বাবা এক সঙ্গে বস্ত্রাঞ্চলে গিঁট

দিয়ে জল ভরার অনুষ্ঠান। সম্ভবত সকালে সকলে নিদ্রিত থাকা কালে জল ভরে বলে এই নামকরণ। ঢাকা অঞ্চলে বিয়ের আগের দিন ভোরে মেয়ের বাড়ি ও ছেলের বাড়িতে যে জল ভরা অনুষ্ঠান হয়।

নিমন্ত্রণ বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানানো; এই অনুরোধ পত্রদ্বারা অথবা নিজে গিয়ে করা হয়।

নিমন্ত্রণ খাওয়া মানুষ সেকালে প্রচুর খেতে পারতেন এমন মানুষের সংখ্যা ছিল অনেক। তার মধ্যে যাঁরা আরও বেশি খেতে পারতেন, তাঁদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া হত খাওয়ার জন্যে। 'এক মণ' জিনিস খেতে পারতেন এমন একজন মানুষের নাম ছিল 'মুন্‌কে রঘু'। যিনি আধ মণ জিনিস এক পাতে খেতে পারতেন তিনি 'আধমণী কৈলাস' নামে বিখ্যাত ছিলেন। নিমন্ত্রণ খাওয়াই ছিল তাঁর পেশা। তাঁর কথায় বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন:

'এক মণ খাদ্য খেত একই বৈঠকে,
অদৃষ্টে হয়নি দেখা মুন্‌কে রঘুকে।
আধমোণী কৈলাস ব্রাহ্মণ সাধাসিধি,
বিপুল খাবার রাশি খেয়ে মেটে ক্ষিধে।
রঙ্গপুর জমিদার তনয় বিবাহ,
কলিকাতা আসি কার্য করেন নির্বাহ।
সেই উপলক্ষে বিপ্র পেয়ে নিমন্ত্রণ,
মোদের মেসেতে আসিয়া হাজির হন।...
নানা ধনী গৃহে তিনি প্রত্যহ খেতেন,
নগদ বিদায় ধুতি চাদর পেতেন।...
নিমন্ত্রণ খেয়ে তাঁর চলিত সংসার,
আক্ষেপ পারে না খেতে পুত্রগণ তাঁর।'

নিম্ত্রন চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় নিমন্ত্রণ। অঞ্চলভেদে এর নাম নেমতন্ন, নিমন্তন্ন, নিমন্তন।

নিরক্ষণ পত্র নিরীক্ষণ— দেখা। কনের পাকা দেখার পর বিবাহের তারিখ, লগ্ন ইত্যাদি বিষয় যে পত্রে লেখা হয়।

নিষ্ক্রমণ বিবাহে সম্প্রদানের পর সম্প্রদানের স্থান হতে বধূসহ নিষ্ক্রান্ত হওয়া বা বের হয়ে অগ্নিস্থাপন স্থানে গমন। এখন সম্প্রদান স্থানের কাছেই অগ্নি স্থাপিত হয় বলে প্রকৃত নিষ্ক্রমণ এখন আর হয় না।

প

পণ বিয়েতে কন্যাপক্ষ বরপক্ষকে বা বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে বাধ্যতামূলক যে অর্থাদি দেবেন বলে পণ বা প্রতিজ্ঞা করেন।

পণপ্রথা বিয়ের সময় পাত্রপক্ষ বা কনেপক্ষকে যে পণ দেওয়ার রীতি।

পত্রকরণ পঞ্জিকায় শুভ দিন দেখে, মেয়ের আশীর্বাদ হয়ে গেলে মেয়ের বাড়িতেই বরপক্ষের পুরোহিত একটি কাগজে লাল কালিতে বর-কনের নাম, পিতার নাম, বিয়ের দিন, লগ্ন, স্থান, বিয়ের স্থান প্রভৃতি লিখে বরকর্তা স্বাক্ষর করে কনেকর্তার হাতে এবং কনেকর্তা বরকর্তার হাতে যে পত্র তুলে দেন, সেই অনুষ্ঠান।

পদ্দি ময়মনসিংহের লৌকিক ভাষায় বংশের প্রথা।

পরিণয় সূত্র বিবাহরূপ বন্ধন।

পয়নামাপত্র পত্রকরণের আঞ্চলিক নাম।

প্রজাপতির পাখ্না ঘটক। পক্ষ না থাকলে যেমন কোনও পতঙ্গ উড়তে পারে না, তেমনই বিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রজাপতির পাখ্না 'ঘটক' না হলে নাকি এই কর্ম অকর্মণ্য হয়ে পরে, ঘটকগণ এমন দাবি করে থাকেন।

পাকস্পর্শ বিবাহের পর প্রথম পতিগৃহে এসে নববধূকে প্রথম পাক বা রন্ধন স্পর্শ করানো অনুষ্ঠান।

পাকা কথা কনে পছন্দ হলে বরপক্ষের গুরুস্থানীয় ব্যক্তি কোনও একটি নির্দিষ্ট শুভ দিনে নিকটাত্মীয় ও পুরোহিতকে সঙ্গে নিয়ে কনের বাড়িতে যান। পুরোহিত মহাশয় কনের মাথায় ধান, দূর্বা ও কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে আশীর্বাদ করার পর বরপক্ষের ওই গুরুস্থানীয় ব্যক্তি টাকা, গিনি বা অলংকার দিয়ে আশীর্বাদ করেন। কনে পছন্দের পর্ব এখানেই শেষ। বিবাহ বিষয়ে কনেকর্তাকে পাকা কথা দেওয়া হয় বলে এই অনুষ্ঠানের নাম পাকা কথা।

পাকা দেখা 'পাকা' শব্দে পূর্ণতা প্রাপ্তি বোঝায়। পাকা দেখা অর্থে কনেকে দেখে পছন্দের শেষ কথা দেওয়া। দু'পক্ষের পছন্দের পর বিবাহের কথা পাকা করতে অনুষ্ঠানিক কথা বলার অনুষ্ঠান।

পাট বংশের প্রথা।

পাটিপত্র যে দিন বরকর্তা কনের বাড়িতে গিয়ে কনেকে আশীর্বাদ করে বিবাহ পাকা করণ অনুষ্ঠান করে, সেই দিনই পাত্রপক্ষের পাত্রের নাম, পিতার নাম, বিবাহের দিনক্ষণ, লগ্ন ইত্যাদি লিখে স্বাক্ষর করে বরকর্তা কনেকর্তার হাতে দেন। শীতলপাটি শুভ বলে এই অনুষ্ঠান নতুন পাটির উপর বসে করারই নিয়ম। পাটিতে বসে এই পত্রকরণ অনুষ্ঠানটি হত বলে এই নামকরণ।

পাণিগৃহীতী বিয়ের মাধ্যমে যে নারীর পাণি গ্রহণ করা হয়েছে। বিয়ের জন্য যাকে জল দিয়ে উৎসর্গ করা হয়েছে।

পাত্র বর। বিবাহার্থী।

পাত্র দেখা মেয়ের বিয়ে দিতে পাত্রীপক্ষ থেকে ছেলে ও ছেলের বাড়িঘর দেখতে যাওয়ার অনুষ্ঠান। কনেপক্ষ কন্যার বিবাহ কারণে যে পাত্রকে দেখতে যায় সেই অনুষ্ঠান।

পাত্র নির্বাচন বিবাহযোগ্যা মেয়ের জন্য পছন্দ হওয়া পাত্র।

পাত্রী বিবাহযোগ্যা কন্যা।

পান বিবাহের অধিবাস দ্রব্যের মধ্যে পান একটি অপরিহার্য উপকরণ।

পানখিলি বিবাহের সর্বপ্রথম যে আচারটি পালন করা হয়। ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে লগ্নপত্রের দিন বা কয়েক দিন পর প্রথমে বরের বাড়িতে এবং পরে কনের বাড়িতে 'পানখিলি' বা 'পান ভাঙানি' নামে এক অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে এয়োরা একত্রিত হয়ে কেউ আলপনা দেয়, কেউ মঙ্গলঘট বসায়, কেউ ধূপ-দীপ জ্বালায়। সকল এয়ো বসে এক-একটা গোটা পান হাতে নিয়ে পানটি ভাঁজ করে খড়কে দিয়ে গেঁথে খিলি দেয়। সঙ্গে সঙ্গে উলু ও বিয়ের গানের মধ্য দিয়ে অমোদ-আহ্লাদ করে। গৃহকর্ত্রী সবাইকে পান-সুপারি-মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়িত করে, এ ভাবেই বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়।

পানগুয়া পান সুপারি। বিবাহ অনুষ্ঠানে লৌকিক মাঙ্গলিক আচার-অনুষ্ঠানে পান-সুপারির গুরুত্ব অপরিসীম। খুব প্রাচীন কাল থেকে এর ব্যবহার চলে আসছে। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গলে ধনপতি সওদাগরের বিবাহ উপলক্ষে যে অধিবাস প্রেরণ করেছিলেন সেখানে এই পানগুয়ার উল্লেখ রয়েছে:

'তৈল সিন্দুর পানগুয়া বাটা করি গন্ধ চুয়া
আম্র দাড়িম্ব পাকা কাঁচা।
পাটে ভরি নিল খই ঘড়া ভরি ঘৃত দই
সাজয়্যা সুরঙ্গ নিল বাছা।।'

পানচিনি পাকা দেখা। কনেকে আশীর্বাদ উপলক্ষে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে বরপক্ষ থেকে পাঠানো পান-সুপারি ও চিনি-বাতাসা বিতরণ করার অনুষ্ঠান।

পান দেওয়া নিমন্ত্রণ করা।

পান নেওয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা।

পানসুপারি বশীকরণ ক্রিয়া সম্পাদনের উপকরণ হিসেবে পান-সুপারির প্রয়োগ

দেখা যায়। বলা হয়, পানের রস কামোত্তেজক এবং কাঁচা সুপারি নেশা ধরায়।

নববধূর মুখে পান দিয়ে তার পর বধূ-দর্শন বা ধান দূর্বা দিয়ে পুত্র ও নববধূকে আশীর্বাদ করে আশপাশে পান-সুপারি ফেলা বা 'দোঁহার মুখেতে দোঁহে দিল পান-গুয়া'। এটি প্রাচীন লোকাচার।

গৌরীরূপী নববধূ যেন হররূপী বরের মুখের তাম্বুল হতে পারে প্রতিটি কনের মায়ের এই আকাঙ্ক্ষা। কবিচন্দ্রের 'শিবায়ন'-এ মেনকার জল সওয়াতে সেই কথাই লেখা হয়েছে:

'পানের বরজে রাণী আইল কুতূহলে।
অভিষেক করি পঞ্চ শস্য দিল মূলে ।।
ধূপ-দীপ দিয়া এই করিল কামনা।
বিলাসিনী প্রিয় কে-বা তোমরা যোজনা ।।
এই বর দিয়া তুমি হও অনুকূল।
গৌরী যেন হয় হরের মুখের তাম্বুল ।।'

সুপারি বাংলাদেশের পণ্য ছিল না। প্রাচীন বাংলার বণিকগণ সমুদ্রযাত্রায় সিংহল প্রভৃতি দেশে গিয়ে বিনিময় বাণিজ্যে 'গুয়া বা গুবাক' নিয়ে আসত— 'বহড়ার বদলে গুয়া' বলে কবিকঙ্কনের চণ্ডীতে এর উল্লেখ রয়েছে। সফরে গিয়ে এই দ্রব্য আনা হয়েছে বলে এটি 'গুয়া-সফরী' পরে সুপারি হয়েছে বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মতো বাংলায়ও বিবাহ আচারে সুপারি জায়গা করে নিয়েছিল। অনুষ্ঠানে সমবেত সধবা রমণীদের গুয়া-পান খেতে দেওয়ার রীতি রয়েছে। এই প্রথাটির পিছনে যে কারণটি রয়েছে তা হল, যার হাতে পান-সুপারি তুলে দেওয়া হল, তিনি তা গ্রহণ করলে বুঝতে হবে ওই ব্যক্তি কার্যভার গ্রহণ করতে রাজি রয়েছে। এটি খুব প্রাচীন বিশ্বাস। কবিকঙ্কনের কালকেতু উপাখ্যানে চণ্ডীদেবী মর্তে তাঁর প্রচারে ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরকে ভক্ত হিসেবে চাইলেন। শিব কিন্তু রাজি হলেন না, কারণ নীলাম্বর এবং পিতা ইন্দ্র সপরিবার শিবের ভক্ত। চণ্ডী পরে শিবকে রাজি করিয়ে নেন। মুকুন্দরাম এ প্রসঙ্গে লিখলেন:

'অঙ্গীকার কৈলা শিব দুর্গা নিলা পান।
পান লয়্যা ভগবতী নারদে পাঠান ।।'

বিবাহে এয়োদের কাজের ভার অর্পণ করার সময় পান-সুপারি দেওয়া, এয়োদের পান-সুপারি গ্রহণ, কার্য পালনের সম্মতি দান হিসেবে প্রাচীন প্রথা হিসেবেই ধরা হয়।

পানে চোখ ঢাকা বিবাহ বাসরে ছাদনাতলায় বরকে সাত বার প্রদক্ষিণ করার আগে কনেকে যখন পিঁড়িতে বসিয়ে আনা হয়, তখন একটি গোটা পান দিয়ে কনের মুখ ঢেকে রাখার রীতি রয়েছে। অনেক বাড়ির নিয়ম, এই সময় কনের মুখে একটি আস্ত সুপারি রাখা হয়। বরের সঙ্গে প্রথম শুভ দৃষ্টি বিনিময়ের আগে যাতে কোন অশুভ শক্তির দৃষ্টি বা নজর না লাগে তার জন্য পান-সুপারির জাদুশক্তির উপর প্রাচীন মানুষ বিশ্বাস রাখত, সেই বিশ্বাস থেকেই এই প্রথা। মুকুন্দরাম কালকেতুর উপন্যাসে গৌরীর বিয়ে উপলক্ষে লেখেন:

'শিব প্রদক্ষিণ গৌরী কৈল সাতবার।
নিছিয়া ফেলিল পান কৈল নমস্কার।।'

পাল্‌টি যাদের সঙ্গে বিয়ের আদানপ্রদান চলতে পারে।
প্রণামী বিয়ের পর বর-কনে দু'পক্ষের গুরুজনদের প্রণাম করে দেওয়া অর্থ বা বস্ত্র।

ফ

ফুলশয্যা বিয়ের তৃতীয় দিন নবদম্পতির প্রথম একত্র শয়নের আচার, কনেবাড়ি থেকে ফুল, ফুলের তৈরি শিল্পবস্তু, ফুলের অলঙ্কার, ফুলের মালার সঙ্গে নানা রকম মিষ্টি, বস্ত্রালঙ্কার তত্ত্বরূপে বরের বাড়িতে পাঠানো হয়।

বর-বধূকে সেই রাতে আবার নতুন বস্ত্র পড়িয়ে কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে একত্রে খাওয়ানো হয়। এই সময় বর কনের মুখে, কনে বরের মুখে খাবার তুলে দেয়। খাওয়া শেষে মালা বদল করানো হয়। এয়োরা দুজনকে নিয়ে নানা রকম ফুল দিয়ে সাজানো কোমল বিছানায় শয়ন করিয়ে চলে যান।

ফুটছিটানো বিয়ের সময় বরকে দাঁড় করিয়ে কনেকে সাত বার প্রদক্ষিণ করানো হয়। প্রতি বারই কনে বরের মুখোমুখি হলে সুন্দর মুদ্রায় হাত দুটি কাঁপিয়ে বরের দিকে ফুল ছুঁড়ে দিয়ে, করজোড়ে প্রণাম করার অনুষ্ঠান।

ফিরুনি নেওয়া শ্বশুরবাড়ি থেকে মেয়ের বাড়িতে বিয়ের পর প্রথম ফিরে যাওয়ার অনুষ্ঠান।

ব

বউ গড়া বিয়ের পরদিন নতুন বউ শ্বশুরবাড়িতে এলে শাশুড়ি যে স্ত্রী-আচার করেন।
বউঘরা বধূবরণ অনুষ্ঠান। নতুন বউ স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়িতে এলে তাকে নিয়ে যে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বরণ করে ঘরে তোলা হয়। বাংলাদেশের ময়মনসিংহ অঞ্চলের ক্রিয়া।

বউপুচ্ছা বাংলাদেশে ফরিদপুর অঞ্চলে বধূবরণ অনুষ্ঠান।

বউভাত নববধূকে স্বগৃহে নিয়ে এলে বরপক্ষের আত্মীয়গণ সমাজের সবাইকে নিয়ে যে অনুষ্ঠান করেন। নববধূ স্বামীগৃহে প্রথম রান্নাঘরে প্রবেশ করে রান্নায় প্রথম হাত দেয় ও বরের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ও সমাজভুক্ত ব্যক্তিদের পাতে নববধূর হাত দিয়ে পরিবেশন করানোর অনুষ্ঠান।

বর বিয়ের পাত্র। জামাতারূপে যাকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যে শ্রেষ্ঠ বা যাকে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান দেওয়া হয়েছে। যে সদ্য বিয়ে করতে যাচ্ছে বা বিয়ে করেছে।

বর আহ্বান বিয়ের লগ্নকাল উপস্থিত হলে যিনি কন্যা সম্প্রদান করবেন তিনি বরকর্তার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে বরকে সম্প্রদান স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য আহ্বান করেন।

বরকর্তা বিবাহকার্যে বরের অভিভাবকরূপে যিনি কাজ করেন। শাস্ত্রে বিবাহক্রিয়ায় বরকে 'কর্তা' রূপে এবং কন্যাকে 'কর্ম' রূপে নির্দেশ করা হয়েছে।

বর কনে পাত্র পাত্রী।

বরপক্ষ বিয়েতে পাত্রপক্ষের ব্যক্তিগণ।

বর পণ সমাজে পুত্রের বিবাহ সময়ে পুত্রের পিতা বরপণ গ্রহণ করে থাকেন। পণ কথার অর্থ হল দাম, তাই পণ নিয়ে পুত্রের বিয়ে দেওয়ার অর্থ হল ছেলেকে তার পিতা বিক্রি করে দিচ্ছেন। বৈদিক যুগেও বরপণ প্রথা ছিল। ঋষি কক্ষীবান বিয়েতে বরপণে দশটি রথ, বহু নারী ও এক হাজার ষাটটি গাভী নেন। ঋগ্বেদে (১/১২৬) গোষ্ঠীপতি হিসেবে প্রতীকী রাজস্বরূপে এই বরপণ পেতেন বলে মনে করা হয়।

মহাভারতের শৈল্যপর্বে বৃদ্ধ কন্যা সুভ্রূর উপাখ্যানে বরপণের বা বরকে প্রলোভনের বস্তু প্রদানের প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। পণপ্রথার কুফলে সমাজ বিব্রত হয়ে পড়েছে।

বর বধূ বর কনে।

বরবরণ কন্যাদাতার বাড়িতে বর প্রধান দরজায় এসে পৌঁছলে পুরস্ত্রীগণ তাঁকে বরণ করে নিতে আসেন। এই স্ত্রী আচারের এয়োগণ দু' হাতে দুটি করে বরণের জিনিস নিয়ে বিশেষ ভঙ্গিমায় হাত দুটি কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে বরণযোগ্য ব্যক্তি অর্থাৎ বরের গায়ে ও কপালে স্পর্শ করে দু' দিকে ফেলে দেন। বিয়ের সময় শাশুড়ি বরকে যে সব প্রক্রিয়ায় বরণ করেন তার উদ্দেশ্য হল বশীকরণ অর্থাৎ জামাই বাবাজীবন যেন চিরকাল তাঁর মেয়ের গোলাম হয়ে থাকে।

প্রধান ফটক থেকে বরকে বরাসনে বসিয়ে কন্যাকর্তা অর্ঘ্য, আচমনীয়, চন্দন,

পুষ্প, বস্ত্র এবং অলঙ্কার দিয়ে তার অর্চনা করে দূর্বা ও আতপ চালের সঙ্গে বরের দক্ষিণ জানু ধরে মাস, পক্ষ, তিথি ইত্যাদির উল্লেখ করে উভয় পক্ষের তিন পুরুষের নাম, গোত্র ও প্রবরের উল্লেখ করে 'অমুকী কন্যাকে বিয়ে করার জন্য তোমাকে অর্চনা করে বরণ করছি'— এই কথা বলেন।

বরভোজনের চাল শুভদৃষ্টি, মালাবদলের পর উলটো করে রাখা পিঁড়ির উপরে বরের পরিত্যক্ত কাপড় রেখে ওই কাপড়ে যে চাল বেঁধে দেওয়া হয়। ওই কাপড়ের উপরে কনেকে বসানো হয়।

বর মাল্য কনে যে পুষ্পমাল্য বরকে প্রদান করে।

বরযাত্র বিয়ের দিন বরের সঙ্গে যাওয়া আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবগণ।

বরযাত্রা কন্যাপক্ষের আহ্বানে বিবাহার্থী বরের সাড়ম্বর কন্যাগৃহে যাত্রা।

বরযাত্রী বিয়ের দিন বরের সঙ্গে বরের নিকট আত্মীয় যাঁরা কনের বাড়িতে যান।

বরযাত্রী কন্যাযাত্রী বিরোধ সেকালে বরযাত্রী দলে প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের সংখ্যা থাকত বেশি, যুবক ও বালকের সংখ্যা হত খুবই অল্প। তখন পুত্রের বিবাহে গাত্রহরিদ্রা বা পাকস্পর্শ উপলক্ষে তিন-চারশো লোককে নিমন্ত্রণ করতেন, কিন্তু বরযাত্রী নিয়ে যাওয়ার সময় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জনের বেশি হত না। বরযাত্রী যখন কনে বাড়িতে উপস্থিত হতেন, তখন উভয়ে উভয়কে ঠকাবার জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে থাকতেন, এ গিয়ে তৈরি হত বিরোধ। এ প্রসঙ্গে যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় 'স্মৃতিতে সেকাল'-এ জানিয়েছেন:

'সেকালে বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীদের মধ্যে যেন একটা বিরোধ ভাব দেখা যাইত। উভয়পক্ষ পরস্পরকে ঠকাইবার বা জব্দ করিবার জন্য যেন পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকিত। ইহার ফলে অনেক ক্ষেত্রে বচসা হইতে অবশেষে মারামারি পর্য্যন্ত হইত এবং সেটা অধিক বালক ও যুবকগণের মধ্যে হইত। তবে অনেক ক্ষেত্রে, সেই বিবাদে প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধেরা পর্যন্ত জড়াইয়া পড়িতেন। সেই কলহবিবাদের ফলে অনেক বিবাহ পর্য্যন্ত হইত না, বরের অভিভাবক বিবাহের পূর্ব্বেই বরকে লইয়া প্রস্থান করিতেন। সেইরূপ ঘটনায় কন্যার পিতা, সেই রাত্রেই প্রতিবেশী বা গ্রামবাসীদের মধ্য হইতে একজন পাত্রের সন্ধান করিয়া তাহারই সহিত কন্যার বিবাহ দিতেন। কারণ, সেই রাত্রেই কন্যার বিবাহ দিতে না পারিলে কন্যার পিতাকে সমাজচ্যুত হইতে হইত, পরে সেই কন্যার বিবাহ বড়ই কঠিন হইত।'

বরযাত্রীর মহাজ আগে বরযাত্রী বিয়ের সপ্তাহকাল আগে থেকে কনের বাড়িতে চলে আসতেন। তাঁদের তুষ্ট করতে চাল, ডাল, তরকারি, মাছ, ঘি, দই, ক্ষীর, মিষ্টি

দেওয়া হত। তার সঙ্গে অবশ্যই 'মহাজ' [মহা + অজ = বড় ছাগল] থাকত। তাই এই ভোজ 'মহাজ' নামেই পরিচিত ছিল। এই প্রথা এখন আর নেই।

বরযাত্রীদের অশিষ্টতা 'সেকালে যে সকল যুবক ও বালক বরযাত্রী হইয়া যাইত, তাহাদের মধ্যে অনেকেই কন্যাপক্ষের অনিষ্ট করিবার জন্য পূর্ব হইতে সঙ্কল্প যেন করিয়া যাইত। অনেকে ছুরি বা কাঁচি পকেটে করিয়া লইয়া যাইত, বরযাত্রী কন্যাযাত্রীদিগের উপবেশনের জন্য যে-সকল আসন পাতা হইত, অনেকে সেই আসন, জাজিম বা চাদর কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিত। কেহ বা ভোজনকালে পাত হইতে লুচি ও মিষ্টান্ন লইয়া জানালা দিয়া ফেলিয়া দিত। এই সকল অন্যায় কার্য করা অনেকে বিশেষ বাহাদুরি বলিয়া মনে করিত এবং বাটিতে প্রত্যাবর্তন করিয়া বন্ধু-বান্ধবের নিকট গর্বভরে গল্প করিত। প্রধানত ওই সকল কার্য করিবার সময় কেহ ধরা পড়িলেই কলহ বিবাদ ও মারামারি হইত। সুখের বিষয়, ওইরূপ অশিষ্টতা ও অন্যায় একালে বড় দেখা যায় না।'

বর যাত্রিকের অবস্থা 'বর যাত্রিকের অবস্থা' এই শিরোনামে সেকালে বরযাত্রী-ঠকানোর প্রতিযোগিতায় কি করা হত তার পরিচয় পাওয়া যাবে। সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮২৫ খ্রি. ২১ মে তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায়:

'সংপ্রতি জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি হরিপুর গ্রামনিবাসি রামমোহন বসু নামক এক কায়স্থের পুত্রের বিবাহ আতড়িখড়শী গ্রামের মিত্রেরদের কন্যার সহিত হইয়াছিল। তাহাতে যে সকল বিশিষ্ট সন্তান বরযাত্র গিয়াছিলেন তাহারদিগের সহিত পরিহাসের কারণ কন্যা যাত্রিকেরা কএক হাঁড়ির মধ্যে হেলে ঢোঁড়া ও ঢেম্না এই তিন প্রকার সর্প পরিপূর্ণ করিয়া এক গৃহমধ্যে রাখিয়া সেই গৃহে বরযাত্রিরদিগকে বাসা দিয়া দ্বার রুদ্ধপূর্ব্বক কৌশলক্রমে ঐ সকল হাঁড়ি ভগ্ন করিল তাহাতে এককালে সর্প বাহির হইয়া হিলিবিলি করিয়া ইতস্ততঃ পলায়নের পথ না পাইয়া ফোঁস ফোঁস করত বরযাত্রিকেরদের গাত্রে উঠিতে লাগিল তাহাতে বরযাত্রিকেরা ঐ সকল বীভৎসাকার সর্পভয়ে ভীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বাপরে মলেমরে ওরে সাপে খেলেরে তোমরা এগোওরে বলিয়া মহা ব্যস্ত সমস্ত হওয়াতে গ্রামের চৌকিদার প্রভৃতি ডাকাইত পড়িয়াছে বলিয়া ধাবমানে আসিয়া পরিহাস শুনিয়া হাসিয়া দ্বার খুলিয়া দেওয়াতে সকলে বাহির হইয়া এক প্রকার রক্ষা পাইল এবং সর্প সকলও ক্রমে ২ প্রস্থান করিল যাহা হউক এতদ্বিষয় আমারদিগের প্রকাশের তাৎপর্য্য এই যে এতৎপ্রদেশীয় অনেক ২ বৈবাহিক বরযাত্রিকেরদের মধ্যে বিবিধ রহস্য ও অবস্থা শ্রুত দৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু এমত অদ্ভুত রহস্য কেহ কুত্রাপি দেখেন নাই এবং শুনেনও নাই।'

বরার্চনা বিয়ের দিন বর কন্যাদাতার বাড়িতে আসামাত্র কন্যাদাতা তাঁকে বিশেষ সম্মানের সঙ্গে সুন্দর আসনে বসিয়ে পা ধোয়ার জল এবং ঘটি বা গাড়ুতে মুখ ধোয়ার জল দিতেন। পা মোছার জন্য গামছা, মুখ মোছার জন্য তোয়ালে দিতেন। তার পর দই, দুধ, মধু ও ঘি দিয়ে তৈরি স্নিগ্ধ পানীয় বিশেষ দিয়ে সম্মানের সঙ্গে অর্চনা মন্ত্রে সম্প্রদাতা বলেন:

'...শ্রীঅমুকী দেবীম্ এনামকন্যাং শুভ বিবাহায় দাতু মেভিঃ গন্ধাদিভিঃ অভ্যর্চ্য ভবন্তমহং বৃণে।'

এই কন্যা বিবাহ দিতে অমুক বংশের অমুক গোত্রের বরকে শ্রেষ্ঠ জেনে বরণ করছি।

বরাসন বিবাহ আসরে সম্প্রদাতা বরকে যে শ্রেষ্ঠ আসনে বসাচ্ছেন এমন ভাবনায় আসনরূপ 'বিষ্টর' দান করেন। বর ওই আসনের উপর বসে মন্ত্র উচ্চারণে বলেন:

'ওঁ বর্ষোহস্মি সমানানামুদ্যতামিব সূর্যঃ।
ইমন্তমভি তিষ্টামি যোমা কশ্চাভিধাসতি॥

আকাশে উদিত বস্তুর মধ্যে সূর্যই উজ্জলতম ও শ্রেষ্ঠ। এখানে যাঁরা আমার সামনে আসছেন তাঁদের মধ্যে আমিই বররূপে শ্রেষ্ঠ আসনে আসীন হচ্ছি। যদি এখানে কোনও হিংসাকারী থাকেন তবে তাকে এ ভাবে চেপে বসাব।

বরানুগমন বিয়ের সময় পাত্রের সঙ্গে তাঁর সঙ্গীদের বিবাহ আসরের উদ্দেশে গমন।

বরাভরণ বিয়েতে পাত্রকে যে পোশাক ও অলঙ্কার দেওয়া হয়।

বরের অন্নগ্রহণ অনেক স্থানে বিয়ের দিন রাতে কনের পিত্রালয়ে বর অন্ন কিংবা অন্য কোনও খাদ্যদ্রব্য ভোজন করেন না। আগে বরের বাড়ি থেকে চাল ডাল প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য সেখানে নিয়ে যাওয়া হত, বরপক্ষের কোনও ব্যক্তি রন্ধন করে তাঁকে ভোজন করাতেন। বিয়ের পরদিন বর শ্বশুরবাড়িতে অন্ন গ্রহণ করতেন। এই প্রথা এখন প্রায় হয় না বললেই চলে।

বরের অলঙ্কার আগে বরেরা কানে সোনার বীরবৌলি, গলায় হার, হাতে বালা, বাহুতে বাজু নামে অলঙ্কার পরে কনের বাড়িতে বিয়ে করতে যেতেন।

বরের খাবার বিয়ের কাজ সম্পূর্ণ হলে অনেক জায়গায় বর, বরযাত্রী ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সঙ্গে পঙ্‌ক্তিভুক্ত হয়ে ফলাহার করে থাকে।

বরের চতুর্দোলা এক সময় বর বিয়ে করতে যেত চতুর্দোলা করে। শ্রদ্ধেয় মহেন্দ্রনাথ দত্ত-র কথায়— চতুর্দোলাটি 'কাঠের একটা ঠাকুর দালান [মত] করিয়া তাহাতে পিতলের পাত মুড়িয়া রূপালি হলকরা করিত। মধ্যবিত্ত লোকেরা সুখাসন বা তাঞ্জামে

যাইত। একটা লম্বা বাঁশকে বক্র ভাবে করিয়া— দুই ডগা সিধে এবং মাঝখানটা অর্ধচন্দ্রের ন্যায়। বাঁশের এই অর্ধচন্দ্রের উপর বসিবার হাওদার মতো একটা কাঠের ফ্রেম থাকিত যেন একটা সোফা কৌচ এবং নিচে পা ঝুলান যাইতে পারে... এই আসন নানা রকম সাজিয়ে সামনে পিছনে সেটাকে কাঁধে করিত। এরূপ যানকে সুখাসন বা তাঞ্জাম বলিত'।

বরের পঙ্‌ক্তি ভোজন বিয়ের পর, রাতে নিমন্ত্রিত, বরযাত্রী, কনেযাত্রীদের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসে বরকে খাওয়ানো হয়। অনেক স্থানে বিয়ের রাতে পঙ্‌ক্তিতে বর ফলাহার [লুচি, তরকারি, মিষ্টি ইত্যাদি] গ্রহণ করে।

বরের পিঁড়ি বিবাহ স্থানে আলপনা দেওয়া যে সুচিত্রিত পিঁড়ির উপরে বরকে এনে পূর্বমুখে বসানো হয়। বর উপুড় হয়ে এমন ভাবে বসবেন যে তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি যেন ভূমিস্পর্শ করে।

বরের বাড়িতে বিয়ে মনুসংহিতায় রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহ বরের বাড়িতেই করার নিয়ম ছিল।

বরের হাতে মঙ্গলসূত্র বিয়ের দিন বরের হাতে মাঙ্গলিক সুতো পরিয়ে দেওয়া হয়। বিয়ের পরদিন কালরাত্রি, তার পরদিন রাত্রিতে ফুলশয্যা হয়। এই দিন বরের হাতের মঙ্গলসূত্র খুলে দইয়ের বাটিতে রেখে দেওয়া হয়। প্রথানুসারে ওই সুতো মাটিতে ফেলতে নেই, পরে ওই দইয়ের বাটি থেকে মঙ্গলসূত্রটি তুলে নিয়ে কোনও জলাশয়ে ফেলে দেওয়া হয়।

বরণ কন্যাদানকালে জামাতাকে অভ্যর্থনা। বিবাহ আসরে কন্যাকর্তা উত্তর দিক হয়ে যথাবিহিত মন্ত্রপাঠ করে বরকে হাঁটু স্পর্শ করে বস্ত্রদান করে বরণ করার পর, নাপিত তাঁকে ছাদনাতলায় নিয়ে যান। সেখানে পট্টবস্ত্র পরিহিতা সাত জন এয়োস্ত্রী উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করে বরকে মাঙ্গল্যদ্রব্য রাখা বরণডালা দিয়ে সাত বার ঘুরে বরণ করে।

বরণডালা মাঙ্গল্যদ্রব্যে সাজানো বরণকুলো, যা দিয়ে বর-কনেকে বরণ করা হয়।

বরণাঙ্গুরী বিয়ের সময় যে আংটি দিয়ে বরকে বরণ করা হয়।

বান বিয়েবাড়িতে রান্নার জন্য লম্বা করে কাটা বড় উনুন, উত্তর চব্বিশ পরগনার আঞ্চলিক ভাষা।

বান ধারণ বিয়ে করতে যাওয়ার সময় ক্ষত্রিয়-পাত্রকে হাতে একটি বান ধারণ করতে হয়।

ব্রাহ্মণের পাত সেকালে নিমন্ত্রণ বাড়িতে খাওয়া শুরু হত ব্রাহ্মণভোজন দিয়ে।

ব্রাহ্মণগণ যখন পাত পাতবেন, তখন অব্রাহ্মণদের বসা নিষেধ ছিল। সেকালের কথায় 'যম দত্তের ডায়ারী'তে যতীন্দ্রমোহন দত্ত লিখেছেন:

'এঁড়েদার উমেশ মিত্রের পুত্র বরদা মিত্র সেকেলে এল এম এস পাশ ডাক্তার।... বাল্যকালে তাঁহার বড় ভূতের ভয় ছিল। যখন তাঁহার বয়স ১৩/১৪ বৎসর, তখন একবার পার্শ্ববর্তী বেলঘরিয়া গ্রামে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছেন। গৃহস্থ যেমন বলিলেন যে, ব্রাহ্মণদের পাতা হইয়াছে, বরদাবাবু অমনি তাড়াতাড়ি চাঁদের আলোয় আলোয় বাড়ি ফিরিবেন বলিয়া ব্রাহ্মণের সহিত বসিয়া গেলেন। খাওয়া আরম্ভ হইয়াছে এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁহাকে ব্রাহ্মণ নয় সন্দেহ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে ছোকরা! তোমার নাম কি? বরদাবাবু অমনি অম্লানবদনে বলিলেন, আজ্ঞা আমার নাম শ্রীবরদাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। প্রশ্নকর্তা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন মেল, কাহার সন্তান? বরদাবাবুর শুনা ছিল খড়দহ মেল, আর ধনপতি চাটুজ্যের সন্তান— তিনি তাহাই বলিলেন। প্রশ্নকর্তা চুপ করিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার সন্দেহ ঘুচে নাই।

ক্রমে খাওয়া শেষ হইয়া আসিল। পাতে দই, সন্দেশ পড়িতেছে। এমন সময়ে সেই প্রশ্নকর্তা এঁড়েদার অপর ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন— ছোকরা তোমার নাম কি? বরদাবাবু পূর্বের ন্যায় বলিলেন— শ্রীবরদাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। পিতার নাম? আজ্ঞে শ্রীউমেশচন্দ্র মিত্র। প্রশ্নকর্তা রাগিয়া বলিলেন যে, আমার সঙ্গে ফাজলামি! বাপের নাম ভাঁড়াইতে লজ্জাবোধ হয় না। বরদাবাবু বলিলেন যে, ভুল করিয়া ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বসিয়া গিয়াছি, ভুল শুধরাইবার জন্য নিজের নাম ভাঁড়াইলাম, আপনি তাহাতেও ছাড়িলেন না। তাহাতে যাহা মনে আসিল তাহাই বলিলাম। আপনি এখন বাপের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন— বাপের নাম কি করিয়া মিথ্যা বলিব। ঠিক বলিলাম আর আপনি আমার ওপর চটিতেছেন। প্রশ্নকর্তা চুপ হইয়া গেলেন।'

বধূবরণ বর যখন নতুন বউকে নিয়ে বাড়ি আসেন, তখন তাঁদের দেখতে ও শাঁখ বাজিয়ে উলু দিয়ে বরণ করে নিতে সমাজের মানুষ বাড়িতে ভিড় করেন। বিভিন্ন অঞ্চলে এই বধূবরণের নানান আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত রয়েছে। কোথাও নববধূ দুধ ও আলতা গোলা পাথরের থালায় দাঁড়ায়, কোথাও কাঁখে জলের কলস, কোথাও মাথায় ধানের কুন্‌কো, কোথাও হাতে একটি জ্যান্ত মাছ বা মাছের ডোলা নিয়ে দাঁড়ায়, তখন বরের মা ও মাতৃস্থানীয়রা বা এয়োরা বরণডালায় সাজানো মঙ্গলদ্রব্য দিয়ে নতুন বউকে বরণ করে ঘরে নিয়ে যায়। ঘরে ওঠার সময় কোথাও নতুন

বউকে 'আওটা হতে দুধ উথলিয়ে পড়ছে' দেখানো হয়। কোথাও রান্নাঘরে নিয়ে 'হাঁড়িভরা ভাত' দেখানো হয়। সুখ স্বচ্ছলতা উপচে পড়ার মধ্য দিয়ে নববধূ সংসারে বিরাজ করুক এই আকাঙ্ক্ষায় এই স্ত্রী আচারের অনুষ্ঠান। শ্বশুরবাড়ির লোকের কথা নববধূ মধুর শুনুক ও মুখে মধুর কথা বলুক এই উদ্দেশ্যে কোথাও বধূর আলপনা করা পিঁড়িতে বসিয়ে মুখে ও কানে মধু স্পর্শ করানো হয়।

বধূর অভিষেক হোমের সময় একজন একটি কলস কাঁধে নিয়ে অগ্নির ডান দিকে দাঁড়িয়ে ওই কলস থেকে জল নিয়ে বর-বধূর মাথায় ছিটিয়ে দেন। বর্তমানে এই ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গেছে, তবে কোষা থেকে ত্রিপত্র দিয়ে জল বধূর মাথায় ছিটিয়ে অভিষেক মন্ত্র পাঠ করেন।

বধূর হৃদয় স্পর্শ পশুপতির পদ্ধতিতে বর কর্তৃক বধূকে সূর্য দর্শন করিয়ে বধূর হৃদয় স্পর্শ করে সমাগত নরনারীদের কাছে শুভকামনাসূচক আশীর্বাদ প্রার্থনা করার কথা বলা হয়েছে।

বস্ত্রাঞ্চল ধারণ যে বংশের কন্যা, সেই বংশ অপেক্ষা উচ্চ বংশের বরের সঙ্গে বিয়ে হলে কন্যা বস্ত্রের অঞ্চল ধারণ করবে— এ কথা শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে।

বহুবিবাহকারী সেকালে বহুবিবাহ করতেন এমন কুলীন ব্রাহ্মণের সংখ্যা ছিল অনেক। বহুবিবাহকারীগণ কী করে এত পত্নীকে নিয়ে ঘর করতেন? এই প্রসঙ্গে যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'স্মৃতিতে সেকাল'-এ জানিয়েছেন:

'বহু বিবাহকারীরা সকলে পত্নীকে ও তাঁহাদের গর্ভজাত পুত্রকন্যাদিগের ভরণপোষণ করিতেন না, সাধারণত তাঁহারা একটি বা দুটি পত্নীকে লইয়াই 'ঘর' করিতেন; অনেকে কলহ বিবাদ ও পারিবারিক অশান্তির ভয়ে একাধিক পত্নীকে বাড়িতে রাখিতেন না, কেহবা পর্যায়ক্রমে দুইটি বা তিনটি স্ত্রীকে বাড়িতে রাখিতেন, অবশিষ্ট সকল পত্নীই চিরকাল পিতা বা ভ্রাতার সংসারে বিনা-বেতনে পাচিকা ও দাসীরূপে কালযাপন করিতেন। বৎসরের মধ্যে এক দিন বা দুই দিন যদি তাঁহারা পতিসেবার সুযোগ পাইতেন, তাহা হইলে আপনাকে ধন্য বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহাদের গর্ভে যে-সকল পুত্রকন্যা জন্মিত, তাহারা চিরকাল মাতুলালয়ে বাস করিত, মাতুলেরাই তাহাদের ভরণপোষণ, শিক্ষা এবং বিবাহের ভার লইতেন, ভাগিনেয়ীর বিবাহ মাতুলেরাই দিতেন।'

বাগদান বিয়ের কথা পাকা করতে কনের ভাই, বন্ধু, পুরোহিত ও আত্মীয়স্বজন-সহ বরের বাড়িতে আসেন। কথা পাকা হয়ে গেলে শাস্ত্রানুসারে কনের ভাই ভাবী বরকে বাগদানের অভিপ্রায়ে বলেন—

'তস্মিন্‌কালেহগ্নিসান্নিধ্যে স্নাতং স্নাতোহ্যরোগিণীম্।
অব্যাঙ্গেঁহপতিতেহক্লীবে পিতা তুভ্যং প্রদাস্যতি॥

দশকর্ম্ম কৌমুদী

—হে সজ্জন, আমার পিতা স্নান পূর্বক সেই বিবাহকালে হোমাগ্নির সম্মুখে, অঙ্গবৈকল্য বিহীন পতিত্যাদি দোষ রহিত, অক্লীব এবং সুস্নাত তোমাকে আমার ভগিনীকে প্রদান করবেন।

কনের ভাইয়ের এই অভিপ্রায় থেকে পরিষ্কার, বরের কোনও অঙ্গবৈকল্য দোষ নেই, তিনি কোনও পাপের জন্য সমাজে পতিত হননি বা তিনি পুরুষত্বহীন নন; এগুলি বুঝেই বোনকে প্রদান করার বাগ্‌দান দেওয়া হল। এর পর যদি ওই দোষত্রয় প্রকাশিত হয় তা হলে এই বাগ্‌দান চুক্তি বাতিল করা যাবে।

সেকালে বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকায় পুত্রের জননী বা পিতা বন্ধুর কন্যাকে পুত্রবধূ করার জন্য বাগদান দিয়ে সময়ে বিবাহকার্য সম্পন্ন করতেন।

বাঁধা রোশনাই সেকালে বড়লোকের বাড়ির বিয়েতে বাঁধা রোশনাই হত। বাঁধা রোশনাই হলে বরের বাড়ি থেকে কনের বাড়ি পর্যন্ত যে রাস্তা পড়বে সেই রাস্তার দু' দিকেই খাস গেলাসের ঝাড় পুঁতে দিয়ে আলোকসজ্জা করা। একেই বাঁধা রোশনাই বলা হত।

বাসরঘর যে ঘরে বর-কনে বিয়ের রাত্রে শয়ন করে। বিয়ের পর রাতে এয়োগণ বর কনেকে বাসরঘরে নিয়ে যান। অনেক জায়গায় কনের অধিবাস ঘরেই বাসরঘর হয়ে থাকে। বাসরঘরের গান, ঠাট্টা, তামাশা ইত্যাদি নানান আমোদ অনুষ্ঠান হত। রাত্রি ভোর হলে বাসরঘর ভেঙে যায়। কালিদাসের সময়ের আগে থেকেই বাসরঘরের কৌতুক ছিল, কুমারসম্ভবে (৭/৯৪-৯৫) হরপার্বতীর বিবাহ প্রসঙ্গে এর উল্লেখ রয়েছে।

বাসর জাগানি বাসর জাগার জন্য কন্যাপক্ষের প্রাপ্য যে অর্থ বরপক্ষের কাছ থেকে পাওয়া যায়। বাসরে বর-কনের সঙ্গে যারা রাত জাগে তারা বরপক্ষের কাছ থেকে যে অর্থ পায়।

বাসরঘরে প্রদীপ বাসরঘরে সারা রাত একটি প্রদীপ জালিয়ে রাখার ব্যবস্থা কোথাও থাকে। স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রথম সোহাগ করা উপলক্ষে 'বাতি' জ্বালানো হয় বলে এই প্রদীপকে 'সোহাগ বাতি' বলা হয়।

বাসি বিয়ে বিয়ের পরদিন সকালে কনের বাড়িতে যে লৌকিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এটি প্রধানত স্ত্রী-আচারের অনুষ্ঠান, কোথাও কোথাও বাসি বিয়ের এই আচার-অনুষ্ঠান

বিয়ের রাতেই পালন করা হয়।

বিয়ের মাঙ্গলিক ক্রিয়ার বাকি থাকা অনুষ্ঠান পরের দিন অনুষ্ঠিত হয় বলে এর নাম বাসি বিয়ে। কনের বিবাহ অনুষ্ঠানের আঙিনায় চারিদিকে চারটি কলাগাছ পুঁতে ওই গাছের নীচে বর-কনেকে বসিয়ে এয়োগণ তাদের গায়ে অঙ্গরাগ মাখিয়ে নানা রকম আমোদ-অনুষ্ঠান করে, বাসি বিয়ের গান, উলুধ্বনির সঙ্গে কলসে রাখা জল দিয়ে স্নান করিয়ে, বর-কনেকে আবার বিবাহ বেশে সুসজ্জিত করে সাত পাঁকে ঘোরানো হয় কোথাও।

বিয়ের পরদিন সকালে বর-কনেকে প্রাঙ্গণে মাদুরে বা পাটিতে বসিয়ে পাঁচজন সধবা উলু ধ্বনির সঙ্গে বর-কনের মাথায় সুগন্ধি তেল মাখিয়ে দেন। এয়োরা সকলের বাম হাত পরপর স্থাপন করে সর্বশেষটির উপর একটি নুড়ি রেখে তাতে তেল ঢেলে দেয়। একজন এয়ো ডান হাত দিয়ে বরের ও বাম হাত দিয়ে কনের মাথায়, দুই কাঁধে ও বক্ষে ওই নুড়ি-তেল স্পর্শ করান। বিয়ের রাতের পর দিন বাসি বিয়ের সঙ্গে কোথাও এক সঙ্গে কুশন্তিকা হোম একত্রে সম্পাদন করা হয়। বাসি বিয়ে একটি স্ত্রী-আচার মাত্র।

বাসি বিহা বাসি বিয়ে, আঞ্চলিক ভাষা।

বাসি বিয়ের ভোজন বাসি বিয়ের অনুষ্ঠান বরের বাড়ি থেকে করার নিয়ম থাকায় বরের বাড়ি থেকে অনেকে বাসি বিয়ের অনুষ্ঠানে আসেন। কন্যাকর্তা তাঁদের এবং নিকট আত্মীয়দের উত্তম ভোজনের ব্যবস্থা করেন।

বিবাহ দানে কএদি মুক্ত অনেকে ঋণ করে শোধ করতে না পারলে সেকালে যাদের জেল হত, বড়লোকের ছেলে-মেয়ের বিয়েতে সেই সব কএদিদের মুক্ত করতেন বরকর্তা বা কনে কর্তারা। ১৮১৯ খ্রি. ৩০ জানুয়ারি তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় এমন একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল: 'কলিকাতার মধ্যে এক বড় বিবাহ হইয়াছে... ঐ বিবাহে কলিকাতার ছোট আদালত জেলের কএদি অনেক দুঃখি লোকেরদিগকে আপন ধনদ্বারা মুক্ত করিয়াছেন এ অতি উত্তম কর্ম্ম এই কর্ম্মের ফল উত্তম ও বহু কাল পর্য্যন্ত থাকিবে।'

বিবাহ পদ্যের লেখক সেকালে বিয়ের আনন্দে বিয়ের-কবিতা ছিল অসম্ভব জনপ্রিয়। সেই সব পদ্য, গদ্য, কবিতার লেখক লেখিকাদের খুঁজে পাওয়া যাবে না, সেকালেও যেত না। কারণ, যিনি লিখতেন তিনি বাবা, মা, দাদু, দিদিমা প্রভৃতি নামে ছাপতেন, ফলে লেখক-লেখিকাদের নাম পাওয়া অসম্ভব। যাদের নামে ছাপা হত এ ক্ষেত্রে তাঁরাই লেখক বা লেখিকা, এটা ধরে নিয়ে এক হাজার ছাপানো পদ্য থেকে

যতীন্দ্রমোহন দত্ত প্রথমে একটি শ্রেণিবিভাগ করে নিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, 'বিবাহ উপলক্ষে লিখিত, ছাপানো ও বিতরিত সকল রকমের লেখাকেই আমরা এক কথায় বুঝাইবার জন্য পদ্য বলিয়া ধরিয়াছি। এক হাজার পদ্যর মধ্যে ৯৫০টি নিছক পদ্য (Pure Verse), ২৭টি কোষ্ঠী, আর ২৩টি স্রেফ গদ্য।

এখন এই পদ্য বা গদ্য বা কোষ্ঠী কে কে লিখিয়াছেন, অর্থাৎ কাহার নাম দিয়া ছাপানো হইয়াছে তাহার একটা হিসাব করা যাউক—

বাবা	২
মা	১০৩
ঠাকুরদাদা	১৪
দিদিমা সমেত ঠাকুরমা	৪৫
ছোট ভাই	৫০
ছোট বোন	৭৫
বড় দাদা	১৭
বড় বোন	৬৮
বউদিদি	২২১
বন্ধুবর্গ	২৭৮
মামা	২০
মামীমা	৪৫
পিসিমা	৩৫
মাসীমা	৭
অন্যান্য	২০
	১০০০

এক একটি বিবাহে বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ উভয়পক্ষই পদ্য ছাপাইয়াছেন, বরপক্ষ হয়তো ৫টা ছাপাইয়াছেন; কন্যাপক্ষ হয়তো ৪টা ছাপাইয়াছেন; আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে বরপক্ষ ২টা, কন্যাপক্ষ ৫টা— এই রকম উভয়পক্ষের পদ্য যোগ করিয়া দেখা গেল যে হাজার করা-র—

বরপক্ষের পদ্য (মায় গদ্য) বা কোষ্ঠী	৪৫৭
কন্যাপক্ষের পদ্য বা গদ্য	৫৪৩
	১০০০

বর বড় না কনে বড়-র একটা modern version পাওয়া গেল। বরপক্ষে পদ্য ছাপানো হইয়াছে। কন্যাপক্ষে পদ্য ছাপানো হয় নাই— এইরূপ সংখ্যা ১৭টা। অপর দিকে বরপক্ষে পদ্য ছাপানো হয় নাই, কন্যাপক্ষে ছাপানো হইয়াছে— এইরূপ সংখ্যা ৩৭টা। কেন যে এইরূপ হইল, ইহার কৈফিয়ত আমরা দিতে পারিলাম না।'

বিবাহ-পদ্যর ছাপাখানা সেকালে প্রায় সব ছাপাখানাতেই বিয়ের পদ্য ছাপা হত। এই পদ্য যে কাগজে ছাপা হত, সেই ছাপার বিশেষত্ব হল, মালা হাতে পরী, লতাপাতার নানান সজ্জায় সেটি সজ্জিত হত। যতীন্দ্রমোহন দত্ত স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন:

'তখনকার দিনে বিবাহে পদ্য প্রায় বড় প্রেসে কম্পোজ করা বা বর্ডার সহ ফর্মা বাঁধাই থাকিত। ফলে, সময় সময়ে শ্রাবণ মাসে কোকিল ডাকিত ও ঘোর অন্ধকারে অমাবস্যার রাত্রিতে চাঁদের আলো ফুটিয়া উঠিত। কেবল বর কনের নামধাম বিবাহ বাসরের স্থান ও তারিখ পালটাইয়া দিয়া ছাপানো হইত।'

বিবাহ যৌথ কর্ম বিবাহ একটি দ্বিপাক্ষিক যৌথ কর্ম। বিবাহ একটি দলগত কাজ। বিয়ের দিন পর্যন্ত বর কনেকে সব হাঙ্গামার বাইরে রাখা হয়। পাত্রপক্ষ ও পাত্রীপক্ষ দু' পক্ষ থেকেই বর কনের ইচ্ছে, রুচি, সম্মতি, আপত্তি সম্বন্ধে একটা ঔদাসীন্য বা তাচ্ছিল্য থাকে। তাঁরা মনে করেন এটা দুই পরিবারের ব্যাপার, এর মধ্যে বর কনের কোনও ভূমিকা নেই। শিক্ষার কারণে এই মনোভাবের অনেক সংশোধন হয়েছে।

বিবাহ বাসর ছাদনাতলা, যেখানে বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়।

বিবাহ বাসরে কবি স্বীকৃতি রমেশচন্দ্র দত্তের কন্যার বিবাহবাসরে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে কবি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে গলায় মালা পরিয়ে দেন। দিনটি ছিল ১৮৮২ সালের ২৪ জুলাই।

বিবাহ সভা সেকালে বিয়ের অনুষ্ঠানে সামাজিক পণ্ডিতদের বিশেষ ভাবে আমন্ত্রণ জানিয়ে সভায় নিয়ে আসা হত। 'সভাতে কুলজ্ঞের কুলজ্ঞতার চন্দন ব্যবস্থাদি জন্য কোলাহল ধ্বনি ও ব্রার্হ্মণ পণ্ডিতের স্বস্বাধীত শাস্ত্র প্রসঙ্গ কোলাহল ধ্বনিতে উদ্বেলমিবসাগরং।' ('সমাচার দর্পণ' ১ মে ১৮২৪)

বিবাহ সভার বাক্‌যুদ্ধ সেকালে বরযাত্রী এলে কনেপক্ষ থেকে বাকযুদ্ধের কূটকাচালিতে ঠকাতে চেষ্টা করত। সেকালের এই বাকযুদ্ধে বরযাত্রী কনেযাত্রীদের কথায় যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় 'স্মৃতিতে সেকাল'-এ জানিয়েছেন:

'সেকালে বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীরা পরস্পরকে কথায় ঠকাইবার জন্যও বিশেষ চেষ্টা করিতে ক্রটি করিত না। ...হুগলি জেলায় গঙ্গার তীরে অবস্থিত গুপ্তিপাড়া এবং গঙ্গার অপর পারে নদিয়া জেলার উলা বা বীরনগর গ্রামের মধ্যে নানা বিষয়ে

প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইত। গুপ্তিপাড়া অঞ্চলে হনুমানের অত্যন্ত উপদ্রব ছিল। ওই অঞ্চলে যত অধিকসংখ্যক হনুমান ছিল এবং এখনও আছে হুগলি জেলার অন্য কোনও স্থানে সেরূপ নাই। সেই জন্য উলা বা শান্তিপুরের লোক রহস্য করিয়া গুপ্তিপাড়ার অধিবাসীদিগকে পাকেপ্রকারে হনুমান বলিয়া আমোদ উপভোগ করিত।

একবার গুপ্তিপাড়ার একটি পাত্রের সহিত উলার একটি কন্যার বিবাহ হয়। সেই বিবাহে কন্যাপক্ষ বরযাত্রীদিগকে আহ্বান করিবার জন্য একটা হনুমান ধরিয়া কন্যার বাড়ির দ্বারে বাঁধিয়া রাখিয়া ছিল। ওইরূপ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, গুপ্তিপাড়া হইতে এক দল হনুমান বরযাত্রী হইয়া আসিতেছে, সুতরাং একটা হনুমানই কন্যাপক্ষের প্রতিনিধি-স্বরূপ তাহাদের অভ্যর্থনা করুক। বরযাত্রীরা বর লইয়া কন্যার বাড়ির নিকট উপস্থিত হইবামাত্র সেই হনুমানটাকে দেখিতে পাইল এবং কন্যাপক্ষের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল। তখন বরযাত্রীদের মধ্যে একজন প্রৌঢ় অগ্রসর হইয়া হনুমানের নিকটবর্তী হইলেন এবং হনুমানের গালে একটা চড় বসাইয়া দিলেন। তাহা দেখিয়া কন্যাপক্ষের এক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়া হনুমানকে চড় মারিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সেই প্রৌঢ় বরযাত্রী তাঁহার কথার উত্তর না দিয়া হনুমানকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, 'বেহায়া, দেশে থাকিয়া কি খাইতে পাইতিস না, তাই এই শ্বশুরবাড়িতে ঘরজামাই হইয়া দ্বারবানগিরি করিতেছিস?'

আর একবার গুপ্তিপাড়ায় এক দল বরযাত্রী শান্তিপুরে বিবাহ দিতে গিয়াছিলেন। কন্যাকর্তার বাড়ির দ্বারদেশে কন্যাকর্তার ভাগিনেয় বরযাত্রীদিগের অভ্যর্থনার জন্য দণ্ডায়মান ছিল। সেই যুবক প্রত্যেক বরযাত্রীকে 'আসুন, আসুন, আসিতে আজ্ঞা হউক' বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন— 'মহাশয়, লঙ্কার সংবাদ কি?' রামায়ণে বর্ণিত আছে যে, রামচন্দ্র সীতার সংবাদ জানিবার জন্য হনুমানকে লঙ্কায় প্রেরণা করিয়া আগ্রহ সহকারে তাহার প্রত্যাবর্তন প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, তাই ওই যুবক প্রত্যেক বরযাত্রীকে লঙ্কার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া প্রকারান্তরে তাঁহাদিগকে হনুমান বলিতেছিল। বালক ও যুবক বরযাত্রীরা তাহার কথার কোনও উত্তর দিল না। অবশেষে বরের পিতৃস্থানীয় এক বৃদ্ধকে ওই প্রশ্ন করাতে তিনি বলিলেন, 'তুমিই? তা বেশ হইয়াছে আমাকে আর অধিক অনুসন্ধান করিতে হইল না; আমার সঙ্গে এসো, আমি একটু বিশ্রাম করিয়া ধূমপানের পর সব কথা বলিতেছি।' এই বলিয়া তিনি গম্ভীর ভাবে সভামধ্যে গিয়া উপবেশন করিলেন। যাহারা ওই প্রশ্ন এবং বৃদ্ধের কথা শুনিয়াছিল, তাহারা, বৃদ্ধ কি উত্তর দেন শুনিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া সভায় গিয়া উপবেশন করিলেন। বৃদ্ধের ধূমপান শেষ হইলে সেই যুবা আবার তাঁহাকে

বলিল, 'মহাশয়, লঙ্কার সংবাদ কি বলুন।' তখন বৃদ্ধ বলিলেন, 'লঙ্কার সংবাদ জানিবার জন্য তোমার আগ্রহ হইবারই কথা। আমিও এই মাত্র লঙ্কা হইতেই আসিতেছি। লঙ্কার সংবাদ বড় ভাল নহে। লঙ্কাতে গিয়া দেখিলাম, তথায় অনেক গৃহ দগ্ধ ও বিধ্বস্ত হইয়াছে। ব্যাপার কি জানিবার জন্য আমি রাবণ রাজার সঙ্গে দেখা করিলাম। তিনি বলিলেন যে, সাগরপার হইতে একটা হনুমান আসিয়া তাঁহার সুবর্ণপুরী লঙ্কার এই দশা করিয়াছে, তিনি প্রতিশোধ লইবার জন্য হনুমানটাকে ধরিয়া তাহাকে বন্ধনপূর্বক সমুদ্রতীরে পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং অনুচরদিগকে আদেশ দিয়াছেন যে, হনুমানটাকে যেন জীবিত অবস্থায় দগ্ধ করা হয়। রাজার মুখে ওই কথা শুনিয়া আমি তখনই সমুদ্রতীরে গিয়া দেখিলাম, একটা বীর হনুমান রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় সমুদ্রতীরে পড়িয়া আছে, রাজার অনুচরেরা দূরে চিতাসজ্জা করিতেছে। আমি হনুমানের কাছে যাইবামাত্র সে আমাকে দেখিয়া কাতর স্বরে বলিল, 'আপনাকে দেখিয়া বাঙালি বলিয়া মনে হইতেছে। যদি আমার এই আসন্ন মৃত্যুকালে একটি উপকার করেন, তাহা হইলে বড়ই বাধিত হইব।' আমি তাহার উপকারে সম্মত হইলে সে বলিল, 'আমার পুত্রকে আমার এই বিপদের কথা জানাইয়া তাহাকে অবিলম্বে এখানে আসিতে বলিবেন।' আমি বলিলাম— 'আমি ত তোমার পুত্রকে চিনি না, কোথায় তাহার সাক্ষাৎ পাইব?' তাহাতে সে বলিল, 'আমার পুত্র শান্তিপুরে আছে। আমি লঙ্কায় আসিয়াছি সে জানে। অনেক দিন আমার সংবাদ না পাইয়া সে বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। সে যাহাকে দেখিতেছে, তাহাকেই লঙ্কার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছে।' যাহা হউক, সহজেই তোমার সহিত দেখা হইল। আমাকে আর অধিক অনুসন্ধান করিতে হইল না। এখন ত লঙ্কার সকল সংবাদ শুনিলে, যাহা কর্তব্য হয় কর।'

এইরূপ বাকযুদ্ধ সেকালে বিবাহসভায় বরযাত্রীদের মধ্যে সর্বদাই হইত।'

বিবাহে কড়ি মধ্যযুগে মুদ্রা হিসেবে কড়ির প্রচলন ছিল। এ ছাড়া কড়ির গয়না পরারও চল ছিল, বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গল'-এ— 'দুই হাতে পিতলের খাড়ু কানে মদন-কড়ি'র উল্লেখ রয়েছে।

বিবাহে বরণডালায় কড়ি রাখার রীতি বহু প্রাচীন। কড়িকে প্রজনন ক্ষমতার প্রতীক বা চিৎ করা কড়িকে স্ত্রী-অঙ্গের প্রতিরূপ হিসেবে গ্রহণ করে এই রীতির প্রচলন হয়। নববিবাহিত দম্পতিকে নিয়ে এয়োদের কড়ি খেলার রীতি আজও প্রচলিত। এ ছাড়া সেকালে 'কড়ি' মুদ্রা মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হত বলে ঐশ্বর্যদেবী লক্ষ্মীর সঙ্গে কড়িকে এক করে দেখে সৌভাগ্যলক্ষ্মীরূপে কড়িকে সিঁদুর চুপড়িতে বসানো হয়েছে।

বিবাহে এসিটিলীন আলো সেকালে বড়লোকের বিবাহের শোভাযাত্রায় এই আলো ব্যবহৃত হত। এই আলোর কথায় ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানিয়েছেন— 'কেরোসিনের আলোর রকমারি বেশী বাহির হইতে না হইতে, যখন রাস্তাঘাটে গ্যাসের আলো দেওয়া হইল, তখন কলিকাতার ধনীদিগের অনেকে নিজ নিজ প্রাসাদেও গ্যাসের আলো লইতে লাগিলেন।... কিছুকাল পরে এসিটিলীন গ্যাসের আলোর প্রচলন হইল। ব্যবসায়িগণ দেখিল, বিবাহাদিকালে শোভাযাত্রায় ব্যবহৃত খাসগেলাশগুলি ব্যবহারের পর কুলীরা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নষ্ট করে; তৎপরিবর্ত্তে টিনের ও কাচের নির্ম্মিত আলোকপাত্র এবং সেই সঙ্গে এসিটিলীন গ্যাস ব্যবহার করিলে প্রচুর পরিমাণে আলোকেরও ব্যবস্থা হইবে এবং ঐ পাকা আলোকপাত্রগুলিও কুলীরা ভাঙ্গিয়া নষ্ট করিতে সাহস পাইবেন না। এখন শোভাযাত্রা হইতে খাসগেলাশ উঠিয়া গিয়া ঐ এসিটিলীন গ্যাসের আলোর ব্যবহারই চলিয়াছে' (কলিকাতায় চলাফেরা)।

বিবাহে কোষ্ঠী বিচার বিয়ে ঠিক হলে দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ দিয়ে বর-কনের কোষ্ঠী বিচার করানো হয়। জোড়া মিলিয়ে কোষ্ঠী বিচারের পর, অনেক সময় কনের হস্তরেখা দেখানো হয়। এই প্রথা অনেকটাই কমে গেলেও এখনও রয়েছে। থ্যালাসেমিয়া রোগাক্রান্ত সন্তানসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার কারণে একটি স্লোগান লেখা হয়েছে— 'কোষ্ঠী বিচার নয়, পাত্র-পাত্রীর রক্ত পরীক্ষা করান।'

বিবাহে কাঙালি ভোজন সেকালে কলকাতায় বড়লোকের বাড়িতে বিবাহ উপলক্ষে কাঙালি ভোজন ও ভোজন-দক্ষিণা দিয়ে বিদায় করা হত। ১৮১৯ খ্রি. জানুয়ারি মাসে 'কলিকাতার মধ্যে এক বড় বিবাহ হইয়াছে।' ৬ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা সূত্রে জানা যায়— 'ঐ বিবাহেতে অনেক কাঙ্গালি লোক জমায়েত হইয়াছিল তাহারদের বিদায়ের সময়ে এক বাটীতে তাহারদিগকে পূরিতে দুই জন কাঙ্গালি মরিয়াছে আর এক জন আঘাতী হইয়াছে।'

বিবাহে ঋণ সেকালে কুলীন কন্যাকে বিয়ে করতে পণ দিতে হত। ঋণ করে অনেকে বিয়ে করতেন বা অর্থ জোগাড় করতে না পারলে অনেকের বিয়েই হত না। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে এক বড়লোকের বিয়েতে তাঁর এক বন্ধু বলেছিলেন, খরচ কমিয়ে আপনি এই ধরনের ব্রাহ্মণদের বিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু তা শোনা হয়নি। এই খবরটি পেয়ে ৩০ জানুয়ারির 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল— '...বিবাহের পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল যে বরকর্ত্তার কোন অন্তরঙ্গ লোক পরামর্শ দিয়াছিলেন যে দুঃখি ব্রাহ্মণেরা অধিক ধনব্যতিরেকে বিবাহ করিতে পারে না ধনব্যয় করিয়া তাহারদের বিবাহ দিলে অতি ভালো হয়। বরকর্ত্তা তাহা করিলেন না। যদি এই মত করিয়া

আপন পুত্রের বিবাহ দিতেন তবে অতি সুন্দর হইত যেহেতুক অনেক লোকের উপকার হইত যাহারা বহু ধন ব্যতিরেকে বিবাহ করিতে পারে না তাহারদের এত ধনোপার্জন কোথা হয় এই প্রযুক্ত অনেকের বিবাহ হয় না যদ্যপি কাহারো হয় তথাপি তাহারো অতিকষ্টে ভূম্যাদি বন্ধক দিয়া ঋণ দ্বারা বিবাহ নিষ্পন্ন হয় পরে ঐ ঋণদ্বারা অশেষ ক্লেশ হয়। যদ্যপি এমন দুই তিন শত লোককে ডাকিয়া তাহারদের বিবাহ দেওয়া যাইত তবে এ দেশের অনেক উপকার হইত। যদি বরকর্ত্তা সুখ্যাতি চাহিতেন তবে এমত কর্ম্ম করিলে তাঁহার নাম ও ঐ বিবাহের নাম অক্ষয় হইত...।'

বিবাহে ক্ষৌরকর্ম শাস্ত্রমতে, সব বার, তিথি, নক্ষত্রে ক্ষৌরকর্ম করা যায় না। কিন্তু বিবাহের সময় কোনও নিষেধাজ্ঞা থাকে না।

বিবাহে গণ্ডগোল বিয়ের দেনা-পাওনা নিয়ে সব যুগেই বরপক্ষের সঙ্গে কনেপক্ষের বিবাদ হতে দেখা যায়। ছোট ঘটনা কী ভাবে বড় হয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয় তার একটি উদহারণ 'যম দত্তের ডায়ারী'তে যতীন্দ্রমোহন দত্ত দিয়েছেন:

'আমরা একদিন প্রমথ শীলদের বৈঠকখানায় বসিয়া আছি। শীতকাল— দরজা জানলা বন্ধ। হঠাৎ গোলমাল শুনিয়া বাহিরে আসিলাম। কয়েকজন ভদ্রবেশধারী ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয় গোয়ালা পাত্রী আপনাদের সন্ধানে আছে? ভদ্রলোকদের ঘরের ভিতর বসিতে অনুরোধ করিয়া ব্যাপার কী জানিয়া লইলাম। এক গোয়ালা বড়লোকের কন্যার সহিত একটি ম্যাট্রিক পাশ অতি সুদর্শন গোয়ালা যুবকের বিবাহ সম্বন্ধ হয়। পাত্রের পিতার ১৫০ বিঘা জমি ও ৮০টি গরু আছে। পাত্রের পিতা পাত্রকে লইয়া সভাস্থ হইলে তাঁহাকে তাঁহার মান্য অনুযায়ী ৩ আঁটি খড় বসিবার জন্য দেওয়া হয় নাই। ইহাতে তিনি ৩ আঁটি খড় দাবি করিলে কন্যাপক্ষীয় এক ব্যক্তি ব্যঙ্গ করিয়া বলেন, ভেমো গয়লার কার্পেটে বসিয়া সুখ হইল না, চাই ৩ আঁটি খড়। পাত্রপক্ষীয়রা বলিলেন যে, যখন ইহাদের মর্যাদা (নিয়ম) ৩ আঁটি খড় তখন দিতে আপত্তি কী? কথা কাটাকাটি চলিতে থাকে, ইতিমধ্যে পাত্রকে অন্দর মধ্যে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। এমন সময়ে এক বরযাত্রীর সহিত এক কন্যাযাত্রীর ধাক্কা লাগে, ফলে কথা কাটাকাটি বন্ধ হইয়া মারামারিতে পর্যবসিত হয়। পাত্রকে অন্দর হইতে উঠাইয়া আনা হয়।

প্রমথর দাদা বলিলেন যে, কেরোসিনের দোকান করেন একজনকে চিনি, তিনি বোধ হয় আপনার স্বজাতি, কিন্তু তাঁহার কন্যাকে ঘুঁটে দিতে দেখিয়াছি, মেয়েটি কালো, বয়সেও এই পাত্রের সহিত মানাইবে না। পাত্রের পিতা বলিলেন যে, হউকগে মেয়ে কালো, আমি আজ রাত্রিতেই ছেলের বিবাহ দিব। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া

ডাকেন সেই কেরোসিনওয়ালাকে। আধ ঘণ্টার মধ্যে বিবাহ পাকা হইয়া গেল ও সেই রাত্রিতেই বিবাহ হইল।'

বিবাহে চরখা এক সময় বিবাহে চরখা দেওয়া হত। যম দত্ত তাঁর ডায়ারীতে জানিয়েছেন— 'আগে বিবাহে চরখা দেওয়া হইত; ঠাকুরমার বিবাহের খেলা-ঘরের চরখা [ঠাকুরমার ৭/৮ বছরে বিবাহ হইয়াছিল] আজও আমাদের বাড়িতে আছে। বিবাহে চরখা দেওয়া যতদূর জানিতে পারিয়াছি ইং ১৮৭০-৮০ সাল থেকে উঠিয়া গিয়াছে।'

বিবাহে নাচ সেকালে বড় লোক বাড়িতে বাই নাচ ছাড়া বিয়ের কথা চিন্তাও করা যেত না। ১৮১৯ খ্রি. ৩০ জানুয়ারি তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় লেখা হয়েছে— 'কএক দিবস হইল কলিকাতার মধ্যে এক বড় বিবাহ হইয়াছে... সে অতিসমারোহ ও অনেক প্রকার রৌশনাই হইয়াছিল... তাহাতে মজলিস নাচ প্রভৃতি অতিসুন্দর হইয়াছিল।'

বাবু রামদুলাল দে সরকার ১৮২০ খ্রি. [১২২৬ সন] দুই ছেলের বিয়ের দিন ঠিক করেছেন ৭ ও ১১ ফাল্গুন। এই উপলক্ষে 'ইংগ্লন্ডীয় সাহেবেরদের কারণ ১/২ ফাল্গুন এই দুই দিন নিরূপণ করিয়াছেন যে তাঁহারা ঐ দুই দিন তাঁহার শিমলের বাটীতে গিয়া নাচ প্রভৃতি দেখেন ও খানা করেন। এবং আরব ও মোগল ও হিন্দু ভাগ্যবান লোকেরদের কারণ ১৩/১৪/১৫/১৬ তারিখ নিরূপিত হইয়াছে তাহারাও উপযুক্ত মত আমোদ প্রমোদ করিবেন।' এই সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল ১লা ফাল্গুন [১২ ফেব্রুয়ারি] তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায়।

সেকালে নিকী নর্ত্তকী মাসে কত টাকা আয় করত, তা ১৬ অক্টোবর ১৮১৯ সনের দর্পণে প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়— 'শহর কলিকাতায় নিকী নামে এক প্রধান নর্তকী ছিল কোন ভাগ্যবান লোক তাহার গান শুনিয়া ও নৃত্য দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এক হাজার টাকা মাসে বেতন দিয়া তাহাকে চাকর রাখিয়াছেন।'

শুধু নিকী নয়, সঙ্গে আরও বড় বড় গাইয়ে নর্তকীও বিয়েবাড়ি মাতিয়ে রাখত। ১৮২২ সালের ৯ মার্চের সমাচার দর্পণে দেখা যায়— 'বিবাহের পূর্ব্ব চারি দিবস নাচ ও গান হইল। তাহাতে বড় মিয়া ও ছোট মিয়া ও নেকী ও কাশ্মিরী প্রভৃতি প্রধান ২ গায়ক আর ২ অনেক তরফাও আসিয়াছিল এ সকল গায়কেরা যে মজলিসে আইসে সে মজলিস সুখদায়ক হয়।'

অনেকের ধারণা সেকালে শুধুমাত্র সাহেবদের তুষ্ট করতেই বাবুরা বিয়েতে নাচের ব্যবস্থা করতেন। ১৮২৪-এর ১ মের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা থেকে জানা যায়— '...শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্রীর [শুভ বিবাহে] কাশীপুরে বিবাহের পূর্ব্বে

পাঁচ দিবস মজলিস হইয়াছিল তাহার প্রথম তিন দিবস কেবল ইঙ্গরাজের মজলিস হইয়াছিল ঐ মজলিসে শহরাস্থ অনেক ভাগ্যবান সাহেব লোক ও বিবি লোক আগমন করিয়াছিলেন এবং শহরস্থ তাবৎ নর্ত্তক নর্ত্তকী আসিয়াছিল তাহারদিগের নৃত্য ও গীত দর্শন শ্রবণ করিয়া সকলে তুষ্ট হইয়াছে... শেষ দুই দিবস বাঙ্গালি মজলিস হইয়াছিল তাহাতে শহরস্থ অনেক ২ ভাগ্যবান লোক ও দেশ বিদেশস্থ নিমন্ত্রিত ঘটক কুলীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রভৃতির আগমন হইয়াছিল. ঐ দুই রাত্রিতে উত্তমরূপ নাচ গানেতে অতিশয় আমোদ হইয়াছিল।'

বিবাহে প্রথম পদ্য 'যম দত্তের ডায়ারী'তে যতীন্দ্রমোহন দত্ত 'বিবাহে পদ্য' প্রসঙ্গে জানিয়েছেন— 'কবে এই প্রথা আরম্ভ হইল— এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। কেহ কেহ বলেন, রাজা সুবোধ মল্লিকের বিবাহে এইরূপ পদ্য প্রথম দেখেন। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, রাজা সুবোধ মল্লিকের বিবাহ ১৩০৪ সালে হইয়াছিল, আর তাঁহার পিতৃব্য ৺মন্মথচন্দ্র মল্লিক বার-অ্যাট ল এই প্রথার প্রবর্তক। কেহ কেহ আবার বলেন যে, রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের বিবাহ উপলক্ষ্য করিয়া তদীয় পিতামহ রাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর তাঁহার মৃত পুত্র শরদিন্দুনাথকে স্মরণ করিয়া এক শোক-বিলাপ ছাপান— ইহাই হইল বিবাহে পদ্য ছাপানোর সূত্রপাত। আমরা যতদূর অবগত হইয়াছি তাহাতে বলিতে পারি যে, রাজা প্রফুল্লনাথের বিবাহ সাল ১৩০৫ বা সন ১৩০৬ সালে হইয়াছিল। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ দাদামহাশয় বলেন যে, তাঁহার বিবাহেই প্রথম পদ্য ছাপানো হয়। আর তাঁহার বিবাহ নাকি সন ১৩০২ সালে হইয়াছিল।'

বিবাহে পান সাজা বিয়েতে পানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পান সাজা, সুপারি কাটা একটা বিশেষ আর্ট ছিল। সেকালের বিয়েতে পান-প্রসঙ্গে 'যম দত্তের ডায়ারী'তে যতীন্দ্রমোহন দত্ত লিখেছেন: 'আগেকার দিনে ক্রিয়া-কর্মোপলক্ষে থালায় করিয়া সাজা পান, দোক্তা, জরদা, লাল-সুপারি, তাম্বুল-বিহার প্রভৃতি থাকিলেও পানের বাটা সাজাইয়া দেওয়া হইতো— মধ্যকার ছোট রেকাবির উপর সির কাটা কাঁচা পান, আর তাহার চারিপাশে দশটি বাটি বা ছোট ছোট ভাঁড়ে চুন, খয়ের, ধনের চাউল, মৌরি, কাটা সুপারি, বড় এলাচ, ছোট এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ ও জায়িত্রী থাকিত। যাঁহার যে রকম রুচি পান সাজিয়া লউন, আলাহিদা রেকাবীতে হরিতকীর টুকরা থাকিত। বাটা হইতে পান সাজিয়া লইতে বড় একটা কাহাকেও দেখি নাই, তবে বাটা সাজাইয়া দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। অন্যান্য সামাজিক প্রথার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাটার রেওয়াজ উঠিয়া গিয়াছে। গ্রামাঞ্চলে এখনও কিছু কিছু আছে বলিয়া শুনিয়াছি।

বিবাহে অন্যান্য দান-সামগ্রীর মধ্যে পানের বাটা, পানের ডিবা দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। পানের বাটা আর বড় একটা দেখিতে পাই না। পানের ডিবা এখন পর্যন্ত পূর্ণ-গৌরব বজায় আছে।

বড় লোকের বাড়িতে সভায় পানের থালার বদলে পানের বাক্স, পানের ময়ুর ইত্যাদি তাহাও আবার রূপার দেওয়া হয়। একবার ইং ১৯০৮ সালে... বাবা শখ করিয়া একটি পানের ময়ুর কিনিয়াছিলেন তাহার পেটের ভিতর ১০/১২টা তাজা খিলি ধরিত— বাহির হইতে দেখা যাইত যে পেটের ভেতর খিলি আছে।'

'পান সাজারও শিল্প কর্ম আছে। দাসী দিদি, বয়সে মায়ের চেয়েও কিছু বড় বই ছোট হইবেন না, এক বোঁটায় ছোট ছোট ৫/৬ খিলি পান সাজিতে পারিতেন; মাও এক বোঁটায় দুই ধারে দুই খিলি ও নীচে চৌকা পান সাজিতে পারিতেন। আজকাল এ সব বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না।'

বিবাহে বাজী পোড়ানো সেকালে কলকাতায় বিবাহে বাজী পোড়ানো হত না। বাজীর আগুনে বহু খোলার ঘর পুড়ে যাওয়ার কারণে কলকাতায় উনিশ শতকের প্রথমে বিবাহে বাজী পোড়ানো নিষিদ্ধ হয়ে যায়, কলকাতার বাইরে কিন্তু বাজী পোড়ানো যেত। ১৮২৬ খ্রি. ২৭ মে তারিখে শ্রীরামপুরে একটি বিয়ের সংবাদ দিয়ে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় লেখা হয়— 'বিবাহের রাত্রিতে বরের সমভিব্যাহারে কৃত্রিম পর্ব্বত ও ময়ূরপংক্ষী এবং তদঙ্গীভূত আশা শোটা প্রভৃতি নানাপ্রকার সজ্জা গিয়াছিল ও অনেক লোকের সমারোহও হইয়াছিল। পথের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীক্রমে উত্তম রোশনাই ও মধ্যে ২ অগ্নিক্রীড়া অর্থাৎ নানাবিধ বাজি হইয়াছিল। কলিকাতা শহরে বাজী পোড়াইতে হুকুম নাই যদি তাহা থাকিত তবে ঐ নগরস্থ ধনি লোকেরা বিবাহোপলক্ষে ইর্ষা করিয়া বাজী পোড়াইতে ক্রটি করিতেন না অর্থাৎ আড়াআড়িতে কলিকাতা নগরের অধিক ভাগ পুড়িত। আমাদের শ্রীরামপুর উত্তম স্থান এখানে কোন লেঠা নাই এবং এই বিবাহেতে যেমন স্থান তদুপযুক্ত বাজী হইয়াছে।'

বিবাহে বসা বিবাহ সময়ে অগ্নি সমীপে শুভলগ্ন সম্পাদনকালে পশ্চিম মুখে কন্যাদান ও পূর্ব মুখ হয়ে গ্রহণ করার নিয়ম।

বিবাহে বাদ্য শাস্ত্রানুসারে 'ভূষণ, বস্ত্র, ভোজ্যদ্রব্য দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করে বাদ্যাদি উৎসবের মধ্যে কন্যা প্রদান করে পিতা নিত্য স্বর্গপ্রাপ্ত হন।' মৎস-পুরাণে, 'বিদ্বান ব্যক্তি অমঙ্গলের বিনাশ ও ঋদ্ধির জন্য বিয়ের সময় মাঙ্গল্য বাদ্যের ধ্বনি, বেদপাঠ ও গান করাবে বলা হয়েছে, প্রাচীন প্রথা মেনে আজও বিবাহে বাদ্যানুষ্ঠান করানো হয়।

বিবাহে ভাংচি দেওয়া ভাংচি দিয়ে বিয়ে ভেঙে কিছু মানুষ আনন্দ পেত, এটাই তাদের নেশা ছিল। এই শ্রেণির মানুষের সংখ্যা সেকালে অনেক ছিল বলে 'যম দত্তের ডায়ারী'তে যতীন্দ্রমোহন দত্ত জানিয়েছেন— 'বিবাহে ভাংচি দেওয়া আগেকার দিনে অনেকের স্বভাব ছিল। তাঁহারা গাঁটের কড়ি খরচ করিয়া কন্যা বা বরপক্ষের খোঁজখবর লইয়া সত্যের সহিত এমন মিথ্যার, কুৎসার নিন্দার ভিয়ান দিতেন যে, কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা তাহা ধরা খুব শক্ত। আগেকার দিনে লোকে সহজে নিন্দা বা কুৎসা বিশ্বাস করিত ও তাহা খুব আগ্রহের সহিত শুনিত, বিশ্বাস করিত ও রটনা করিত। কোনও কার্য দোষের না হইলেও দোষের বলিয়া ঘোট পাকাইত।'

অনেকগুলি উদাহরণ দিয়েছেন, তার মধ্যে একটি— 'নাট্যকার অমৃতলাল বসু মহাশয়ের কোন এক পিতৃব্য বালির কাগজের কলে ছেঁড়া কাগজ প্রভৃতি যোগান দিতেন।... এই পিতৃব্যের নাম হরিষবাবু। তাঁহাদের বাড়ির এক মেয়ের সহিত কোনও এক ভদ্রলোকের ছেলের বিবাহসম্বন্ধ হয়। কথাবার্তা অনেক দূর আগাইয়াছে, এমন সময়ে 'নসু বাবু' যাচিয়া আসিয়া পাত্রের পিতাকে বলিলেন যে, ছিঃ ছিঃ তুমি 'ন্যাকড়া হরিষের' বাড়িতে ছেলে দিতেছ? উহারা ভদ্রসমাজে জাতে ঠেলা? ইত্যাদি। পাত্রের পিতা ইহাতে দমিলেন না দেখিয়া পাত্রীর বাটীতে যাইয়া এমন কতগুলি কুৎসা রটনা করিলেন। যেমন ছেলের বার দোষ আছে, ছেলের বোধ হয় বুকের ব্যায়ারাম আছে— সে বিবাহ ভাঙ্গিয়া গেল।'

এমন 'নসু বাবু'দের ভাংচিতে কোনও বিবাহ ভেঙে যেত, আবার 'পিপুলবাবুদের ভাংচি অনেক সময় ফলবতী হত না— 'পিপুল'বাবুর ভাংচি ফলবতী হইল না। বিপুলবাবুর কিন্তু কোন লজ্জা নাই। তিনি পাত্রপক্ষের পরম হিতৈষী এইরূপ ভাব দেখাইতে লাগিলেন। আবার গিরিজা মিত্রদের মতো মানুষদের 'পাড়ার লোকে ভাল চক্ষে দেখিত না, বলিত যে 'শনি ঠাকুর' আসছেন, বিবাহে ভাংচি দেওয়া গিরিজা মিত্রের পরমানন্দ হইত এবং তিনি জাতি ধর্মনির্বিশেষে তাহা করিতেন।'

'পূর্বে আমাদের দেশে ও সমাজে পাড়ায় বহু গিরিজা মিত্র ছিল। এখন ইহাদের সংখ্যা খুবই কমিয়া গিয়াছে। একটি বিনা পয়সায় কারবার— যে কারবারে কোনও লাভ লোকসান নাই, আছে কোন বিশুদ্ধ আনন্দ, বাংলা দেশ হইতে উঠিয়া যাইতেছে। এই সব গিরিজা মিত্রদের, পিপুলবাবুর, নসু বাবুর আলেখ্য লিখিয়া রাখা দরকার। ...এই বিষয়ে নূতন গবেষকগণ দৃষ্টি দিলে বড় ভাল হয়।'

বিবাহে রন্ধন 'যে মহিলা রন্ধনে বিশেষ দক্ষা, তাঁহার জাতীয় কোন গৃহে ক্রিয়াকলাপে তাঁহার আদর দেখে কে, ক্রিয়ার পূর্ব্ব হইতে ক্রিয়াকর্ত্তারা তাঁহারই সহিত পরামর্শ

করিতেন। তাঁহার আদেশ মত দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করা হইত এবং রন্ধনশালার ও ভাণ্ডারের ভার সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইত। অন্যান্য মহিলারা তাঁহার সহকারিণী হইবার জন্য পূর্ব্ব হইতে তাঁহার তোষামোদ করিত। 'অমুকের বিবাহে যে ডাল ধরাইয়া ফেলিয়াছিল, যে পায়স আকিয়াঁ দিয়াছিল, যে অপরিষ্কার, যে পরিশ্রমকাতর, যে অসাবধানে হাত পুড়াইয়া ফেলিয়াছিল প্রভৃতি অকর্ম্মণ্যদিগের নাম খারিজ হইয়া যাইত। যাঁহারা নির্ব্বাচিতা হইতেন, তাঁহাদের উৎসাহ দেখে কে, 'আমার হাতের ময়লা দশজনে খাইবে' ইহাকে পরম সৌভাগ্য মনে করিয়া দেবতার পূজা মানিতেন। ক্রিয়া দিবসে সকলে প্রাতঃস্নান করিয়া শুদ্ধবস্ত্রে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের দলকর্ত্রী অগ্নির পূজা করিতেন, সকলে অগ্নিকে প্রণাম করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। দলকর্ত্রীর আদেশ সর্ব্বদা শিরোধার্য্য করিয়া ভয়ে ও মহা উৎসাহে সমস্ত দিন এবং রাত্রি পর্য্যন্ত যতক্ষণ সমস্ত লোকের ভোজন সমাধা না হয়, ততক্ষণ রন্ধন ও পরিবেশন করিয়া শেষে আপনারা ভোজন করিতেন। ভোজনীদিগের নিকট রন্ধনের সুখ্যাতি শুনিলে আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইতেন। ক্রিয়া শেষে সমস্ত মহিলা একত্র হইয়া শুভচণ্ডীর পূজা করিতেন।'

'কলিকাতার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে শ্রদ্ধেয় প্রাণকৃষ্ণ দত্ত বিবাহে যাঁরা রান্না করতেন তাঁদের প্রসঙ্গকথা এ ভাবে জানিয়েছেন।

বিবাহে হাঁচি উপবেশনে, শয়নে, দানে, বস্ত্রসংগ্রহে, বিবাদে এবং বিবাহে হাঁচি শুভ বলা হয়েছে।

বিবাহে হোম হোমের তিনটি ভাগ— কুশণ্ডিকা, প্রকৃত কর্ম ও উদীচ্য কর্ম। বিয়ের হোমকে সাধারণত 'কুশণ্ডিকা হোম' বলা হয়। আগে বিয়ে উপলক্ষে বরকে দুটি হোম করতে হত, প্রথমটির নাম 'বিবাহ হোম' দ্বিতীয়টি 'চতুর্থী হোম'। দ্বিতীয় হোমটি বিয়ের পর বরের বাড়িতে চতুর্থ রাত্রে করা হত। এখন আর এটি করা হয় না। একটি হোমই এখন করা হয়।

বিবাহের আমিষ ভোজ বিবাহ অনুষ্ঠানে আগে নিরামিষ ভোজেরই ব্যবস্থা করা হত। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রথমে মাছ, পরে মাংসের ভোজ শুরু হয়। ১৩৫৫ সালে ফাল্গুন সংখ্যায় শনিবারের চিঠিতে 'যম দত্তের ডায়ারী'র নিমন্ত্রণ-এ আমিষ নিরামিষ-এর শতকরা হিসাব দিতে লিখেছেন:

'কলিকাতার কোন বিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদকের পুত্রের বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম, বউভাতের দিন দেখি, লোকে লোকারণ্য। ১০০০-১২০০ লোক খাইবে, পাতা পড়িল। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ দাদামহাশয় হাত ধরিয়া বলিলেন,

আয় আমার পাশে বসিয়া খাইবি। আমি বলিলাম, দাদু! আমি fishy ব্যাপারে নাই; তিনি রাগ করিয়া বলিলেন, তবে দ্বারবানদের পাশে বসিয়া খা। কর্মকর্তার জামাতা বহু চেষ্টা করিয়া আমাকে আলাদা বসাইয়া নিরামিষপদাদি সরবরাহ করিতে পারিলেন না। একজন পরিবেশক রাগ করিয়া বলিলেন যে, ভদ্রলোক যদি নিরামিষ খাইবেন তবে শরবৎ লইয়া চলিয়া গেলেন না কেন? পরে পত্রিকার দ্বারবানেরা আসিতে শুরু করিল। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের ভবিষ্যৎবাণী অচিরেই ফলিয়া গেল। আর এই বিবাহে আমিষ ও নিরামিষ আহারীদের অনুপাত ১০০০/১২০০: ১। এইবার আমাদের সংগৃহীত তথ্যগুলি নিম্নে সাজাইয়া দিলাম।

কন্যার বিবাহে:

আমিষ— মাংস-৮২, মাংস, মৎস্য-১১। নিরামিষ— ৭ = ১০০

বউভাত:

আমিষ— মাংস-৭৬, মাংস, মৎস্য-২৪। নিরামিষ— × = ১০০

বিবাহের গান পাকা দেখা, আশীর্বাদ, জলভরা, গায়ে হলুদ, কনে সাজানো, বাসর যাপন, বধূবরণ, কড়ি খেলা, ফুলশয্যা— সমস্ত বিবাহ অনুষ্ঠানেই ছড়াগানের মধ্য দিয়ে লৌকিক স্ত্রী আচার সম্পন্ন হত। আশীর্বাদের দিন থেকে ছেলে, মেয়ে উভয়ের বাড়িতেই প্রতিদিন সন্ধ্যায় আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের মধ্যে বর্ষীয়সী মহিলা ও অল্প বয়সের এয়োদের সঙ্গে পানসুপারি নিয়ে গালে হাত দিয়ে শুরু হত মাঙ্গলিক গান। এই গান সেকালের বিয়ের অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তুলত।

বিবাহের নিরামিষ ভোজ সেকালে বিবাহে নিমন্ত্রণে নিরামিষ ভোজের ব্যবস্থা হত। 'যম দত্তের ডায়ারী'তে যতীন্দ্রমোহন দত্ত জানিয়েছেন:

'কন্যাপক্ষ আগে বরযাত্রী মায় কন্যাযাত্রীদের সকলের জন্য নিরামিষ আহারাদির আয়োজন করিতেন। বিবাহ তো একটি যজ্ঞবিশেষ। দশবিধ সংস্কারের শেষ সংস্কার ও শ্রেষ্ঠ সংস্কার। এ দিন অনর্থক জীব-হিংসা করা উচিত নহে।... আজকাল আবার মাছ-মাংসের ব্যবস্থা না করিলে তীব্র সমালোচনা শুনিতে হয়।' সেই সমালোচনার কথায় লিখেছেন:

'কিছুদিন আগে থাম-ওয়ালা বাড়িতে কন্যাপক্ষের নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলাম। কন্যার পিতা অল্প বয়সে মারা গিয়াছেন। কন্যার পিতামহ বিবাহ দিতেছেন। কুলপ্রথা অনুযায়ী আহারাদি নিরামিষ ব্যবস্থা। প্রায় ৩০/৪০ রকম নিরামিষ পদ, আমিষের অভাব নিরামিষ পদের প্রাচুর্যের দ্বারা যেন পুরাইয়া দিয়াছে। একেবারে সাতশত লোক আহারে বসিয়াছে। এমন সময়ে রামখুড়ো বলিয়ার উঠিলেন, এ যে দেখিতেছি

মেয়ের বিবাহ নয়, মেয়ের বাপের শ্রাদ্ধ, সবই নিরামিষ। পাশ হইতে সাহেব দত্ত বলিয়া উঠিলেন, হবে না? বাবা (ঠাকুরদা) থাকিতে মেয়ের বাবা মারা গিয়াছে; শ্রাদ্ধ হয় নাই। সেই জন্য দুই কাজই এক সঙ্গে সারা হইল। কি বল মদন? বলিয়া কন্যাপক্ষীয় কর্মকর্তা মদনের দিকে চাহিলেন, মদন নিরুত্তর।'

বিবাহের পদ্য সংগ্রহ বিয়ের পদ্য ছাপা না হলে এক সময় বিয়ের কাজ অসম্পূর্ণ বলে মনে করা হত। সেকালে অনেকেই পদ্য সংগ্রহ করতেন, কিন্তু সংরক্ষণের অভাবে সেই সব হারিয়ে গেছে। যতীন্দ্রমোহন দত্তের বড় বোনের সংগ্রহ ছিল দেখার মতো। ১৩০৪ সালে রাজা সুবোধ মল্লিকের বিয়েতে প্রথম বিয়ের পদ্য ছাপা শুরু হয় বলে জানা যায়। এর বছর দশেকের মধ্যে তা জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছে গিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে 'যম দত্তের ডায়ারী'তে লেখা হয়েছে:

'আমার বড় বোনের ডাক নাম ঘটু।... ঘটুর বিবাহ হইয়াছিল ১৩১৫ সালে। রাজা সুবোধ মল্লিকের বিবাহ হইতে ১০ বৎসরের মধ্যে বিবাহে পদ্য ছাপাইবার ফ্যাসন ফাগুন মাসে বাঁশবনে আগুন লাগাবার মতন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।...

ঘটুর বিবাহের পদ্য সংগ্রহ করা একটা বাতিক ছিল। সন ১৩১২ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া সন ১৩৪১ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩৫০০ (মায় গদ্য) বা বিবাহের কোষ্ঠী সংগ্রহ করিয়াছিল। এই সব বিবাহ কলিকাতা ও তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রাম বর্ধমান, আসানসোল, প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে হইয়াছিল। এই সংগ্রহটি একটি representative collection। যতদূর জানিতে পারা যায়, এই পদ্যগুলি অন্ততপক্ষে ১১টি বিভিন্ন জাতির বিবাহ উপলক্ষ করিয়া লিখিত হইয়াছে, যথা, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, সদগোপ, মোদক, গোয়ালা, উগ্রক্ষত্রিয়, সুবর্ণ-বণিক, গন্ধ-বণিক, রাজপুত, কুম্ভকার— অন্যান্য জাতিও থাকিতে পারে।'

হারিয়ে গেছে সামাজিক ইতিহাসের একটি মূল্যবান সংগ্রহ।

বিবাহের পদ্য সম্মানের সেকালে বিয়ের পদ্য অনুষ্ঠানের দিন বিলি করা সম্মানের বিষয় ছিল। এ প্রসঙ্গে 'যম দত্তের ডায়ারী'তে যতীন্দ্রমোহন দত্ত জানিয়েছেন— 'আমার বড় বোনের ডাক নাম ঘটু, ঘটুর বিবাহ বাবা খুব ঘটা করিয়া দেন, আমাদের অবস্থা তখন ভাল। বিবাহে বাড়ি ও বাগান গ্যাসাটিলিন গ্যাসের বাতি ও ঝাড় দিয়া সাজানো হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌর সানাইদার ওসমান হবিব সানাই বাজাইয়া ছিল; বাবুরাম ঢুলী এমন ঢোলের সঙ্গত করিয়াছিল, যে শুনিয়াছিল সেই তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে নাই। ঘটুর বিবাহে বাবা পদ্য ছাপাইবার কোনও ব্যবস্থা করেন নাই। নিমন্ত্রণে আসিলেন দাশীদিদি; দাশীদিদি ঘটুর বিবাহে পদ্য হইবে না শুনিয়া মর্মাহত

হইলেন। চারি রকমের পদ্য— একখানি দিদিমার নামে, একখানি মা'র নামে, একখানি আমার নামে, আর একখানি কাহার নামে এতদিন বাদে ঠিক স্মরণ হইতেছে না— বোধহয় ছোট মামার নামে নির্মলা প্রেস হইতে ফরমাইস দিয়া ছাপাইয়া আনিলেন। ...আমার ভগ্নীপতি একজন Mining Engineer; বর্ধমান চাণ্ডুর জমিদার কালিদাস মিত্রের পৌত্র। তাঁহাদের হাতি ছিল। যোল বেহারার রূপার পাল্কি ছিল, কিন্তু তাঁহাদের তরফে একখানিও পদ্য গদ্য ছিল না। এ জন্য বিবাহবাসরে আমার ভগ্নীপতিকে অনেক ব্যঙ্গ বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইয়াছিল। কেহ বলিলেন, রোঢ়ো অর্থাৎ রাঢ় দেশে বাড়ি, অতএব অ-সভ্য, কেহবা বলিলেন, বর্ধমেনে, কেহ বা ছড়া কাটিলেন— 'কাছা লম্বা, কোচা টান। তবে জানিবে বর্ধমান ইত্যাদি।'

বিবাহের বয়স আচার্য সুশ্রুত ভারতীয় নর-নারীর যৌবনপ্রাপ্তি ও বিবাহের উপযুক্ত বয়স প্রসঙ্গে অভিমত দিয়েছেন এ ভাবে—

'পঞ্চবিংশে ততো বর্ষে পুমান্ নারী তু ষোড়শে।
সমত্বাগতবীর্য্যৌ তৌ জানীয়াৎ কুশলো ভিষক।'

সুবিজ্ঞ বৈদ্যের জানা উচিত, পুরুষেরা পঁচিশ বছর বয়সে দেহের ও মনের যে রূপ অবস্থা এবং যৌবনোচিত বলবীর্য প্রাপ্ত হয়, নারীরা ষোল বছর বয়সেই সেই রকম দেহ-মনের অবস্থা এবং যৌবনোচিত বলবীর্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে।'

এর পর আচার্য জানিয়েছেন— 'অথাস্মৈ পঞ্চবিংশতিবর্ষায় ষোড়শবর্ষাং পত্নীমাবহেত। পিত্রা ধর্মার্থকায় প্রজাঃ প্রাপ্স্যতী ইতি।'

অতঃপর [রীতিমত বিদ্যালাভের পর] পুত্রের পঁচিশ বৎসর বয়স হইলে ষোড়শবর্ষীয়া কোনও সুযোগ্য পানিকার সহিত তাহার বিবাহ দিবে। তা হলে পুত্র [ধর্ম, অর্থ এবং কাম প্রাপ্ত হয়ে] দেবপূজা ও পিতৃপূজাদি গার্হস্থ্যধর্ম সম্পাদন এবং উপযুক্ত সন্তানসন্ততি উৎপাদন করতে সমর্থ হবে।

বিয়ে উপলক্ষে দান ১৮৮২ সালের ২ মে তারিখের বেঙ্গলী পত্রিকা সূত্রে জানা যায় কানাইলাল শীল তাঁর পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে নেটিভ হাসপাতালে ৫০০০ টাকা দান করলেন।

বিয়ে করা পিতামাতার পছন্দ করা পাত্র বা পাত্রী নয়, নিজেরা ঠিক করে যে বিয়ে করে, তাদের বিয়ে দেওয়া হয় না, নিজেরা বিয়ে করে।

বিয়ে দেওয়া সেকালে বাবা-ঠাকুরদারা ছেলে 'বিয়ে দিতেন', ছেলের বিয়ে করতেন না, নিজেদের পছন্দ অপছন্দের কথা গুরুজনদের কাছে বলা যেত না। অমৃতলাল বসু এ প্রসঙ্গে তাঁর আত্মস্মৃতিতে সুন্দর বলেছেন— 'তখন ১৫ বৎসর মাত্র বয়স,

এন্ট্রান্স পড়ি, ৩ বৎসর পূর্বে পিতৃবিয়োগ হয়েছে। বিয়ের সম্বন্ধ এল, ঠাকুরদা কনে দেখে এলেন, বর দেখতে এল, দেখা দিলুম, একটা স্কুল মাস্টার সঙ্গে ছিল, কড়া একজামিন করলে, তা-ও দিলুম, এই অবধি। বে'র কথা, বে' জানেন, দাদা জানেন, কাকা জানেন, আমার সঙ্গে সম্বন্ধ তাঁরা যা বলেন, তাই করা।'

বিয়েবাড়ির জটলা এক বাড়িতে বিয়ে হলে পাড়া প্রতিবেশী সকলে জানত তাদের মেয়ের বিয়ে, সকলে বেশ কিছু দিন আগে থেকেই এসে বিয়ের জটলায় যোগ দিত। এই সামাজিক ভাবনাটাই হারিয়ে গেছে, পুরোনো দিনের কথায় মহেন্দ্রনাথ দত্ত জানিয়েছেন— 'বিবাহেরী কয়েক দিন পূর্ব হইতেই পাড়ার সধবা স্ত্রীলোকেরা আহার করিয়া বিবাহ বাটিতে জটলা করিতে আসিতেন। নানারূপ গল্প হইত, ছড়া কাটানো হইত আর কেউ চরকায় সুতা কাটিত, কেউ পিঁড়িতে আলপনা দিত এবং কেউ খুরিতে নানারূপ দ্রব্য সাজাত, কেউ গুঁড়ি কুটে নাড়ু করিত— এই রূপ অনেক ব্যাপার হইত। তখনকার দিনে পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে সদ্ভাব ছিল। কারণ এক পাড়াতে পুরুষানুক্রমে বসতি করায় একটা সম্পর্ক হিসাবে সম্বোধন করিত। এখানে জাতি-বর্ণের কোনও কথা নেই। এখন পাড়ায় সব ভাড়াটে বাড়ি হওয়ায় সে ভাবটা চলিয়া গিয়াছে। বিবাহের পূর্বে পাঁচ সাতদিন হইতে পাড়াতে একটা আনন্দ উঠিত। সকলেই মনে করিত যেন তাদের বাটিতেই কাজ এবং কর্তারা আসিয়া যেমন খরচ করিতে পারিবে সেই হিসাবে ফর্দ করিয়া দিত। করা-কর্মানোর ভারটা পাড়ার লোকেরাই লইত।'

বিয়েবাড়ি সেকালের সেকালের বিয়েবাড়ি কেমন ভাবে সাজানো হত, তার একটি বিবরণ রয়েছে ১৮২২ খ্রি. ৯ মার্চের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায়— 'প্রথমত মজলিসের ঘর ডাকের সাজ ও মোমের সাজ দ্বারা সুশোভিত এবং অপূর্ব্ব বিছানাতে মণ্ডিত ও শ্বেত নীল পীত রক্তবর্ণ ঝাড় ও লাণ্ঠন ও দেয়ালগিরি প্রভৃতি নানাবিধ রোশনাই হইয়াছে।'

১৮২৪ খ্রি. ১ মে তারিখের সমাচার দর্পণের সংবাদ থেকে একটি বিয়েবাড়ির সাজ প্রসঙ্গে জানা যায়— 'নয় দণ্ড রাত্রির পর লগ্ন স্থির হইয়া সন্ধ্যা সময়ে বর ও বরযাত্র যাত্রা করিলে কৃত্রিম পাহাড় কোটা বাগান নৌকা প্রভৃতি নানাবিধ ছবি সঙ্গে গিয়াছিল।... যখন মহারাজের বাটীর মধ্যে সকল লোক প্রবিষ্ট হইল তখন নীচে উপরে স্থানে ২ এমত বিছানা ও রোশনাই ও মজলিস হইয়াছিল যে তাহা দেখিয়া অনেকে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন।'

বিয়ে হওয়া বর-কনের পিতা বা মাতা ঠিক করে যে পাত্র বা পাত্রীর বিয়ে দেন— তাদের বিয়ে হয়, তারা বিয়ে করে না।

বিয়ের আচার-অনুষ্ঠান বিয়ের অনেক আচার-অনুষ্ঠান আছে যা সব জেলায় সমান হয় না। জেলাভেদে অনুষ্ঠানের পার্থক্য যেমন আছে, তেমনই অনেক আচার-অনুষ্ঠান গ্রামভেদে, পরিবারভেদে আলাদা আলাদা রূপে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

বিয়ের কাঁচা দেখা সেকালে বিয়েতে কাঁচা দেখার প্রথা ছিল। এই কাঁচা দেখায় বরের বাড়ি থেকে কনের বাড়িতে এবং কনের বাড়ি থেকে বরের বাড়িতে দু' তরফের কর্তারা পরস্পর এসে কথাবার্তা বলে যেতেন। এই কথা পাকা কথা হত না বলে, কথা বলার পরও বিয়ে ভেঙে যেতে পারত, তাই একে 'কাঁচা দেখা' বলা হত।

বিয়ের গান বিবাহের অনুষ্ঠানে এক সময় মহিলাদের বিয়ের গান ছিল প্রধান উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। বিয়ের প্রতিটি অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে, সেই অনুষ্ঠানের বিষয় ধরে গান গাওয়া হত। লৌকিক অনুষ্ঠানের গানগুলি হারিয়ে গেছে। গানের বিষয়-বৈচিত্র্য ছিল বহুমুখী, যেমন:

জল ভরতে যাওয়ার গান
অধিবাসের গান
নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের সময়ের গান
বর-কনে নখ কাটার গান
বর-কনের স্নান করানোর গান
বর-বরণের গান
বিবাহ বাসরে কনেকে আনার গান
কনেকর্তা ও বরকর্তা একত্রে বসে পঞ্চদেবতার গান
হোমের কাজ শুরুর গান
কনেকে বিবাহ মণ্ডপে আনার গান
লাজ হোম শুরুকালীন গান
বর-কনের গাঁটছড়া বন্ধনকালীন গান
বর-কনের সপ্তপদী গমনকালীন গান।
বর-কনেকে আকাশে চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্র দেবতাদের সাক্ষী করার সময়ের গান।
বর-কনেকে বসিয়ে কনের আত্মীয়দের মাঙ্গলিক ক্রিয়ার গান
বর-কনেকে বরের মাতার বরণকালীন গান।

বিয়ের জল বিয়ের আগে মেয়ে রোগা থাকলে বা তেমন বাড়ন্ত না হলে সাধারণত বয়স্কা মহিলাগণ বলে থাকেন 'বিয়ের জল পড়লেই মেয়ে পুষ্ট হবে।'

বিয়ের ডালা বিয়েতে যে তত্ত্ব দেওয়া হয়, তার পাত্র।

বিয়ের তত্ত্বে সুপারির আংটি সেকালে বিয়েতে মেয়েদের হাতের কাজ দেখাবার প্রতিযোগিতা হত। সুপারি দিয়ে নানান জিনিস তৈরি করতেন। এই প্রসঙ্গে 'যম দত্তের ডায়ারী'তে যতীন্দ্রমোহন দত্ত জানিয়েছেন— 'পানের সুপারি কাটার বাহার আছে। ...দাসী দিদির সুপারি কাটার বাহাদুরি ছিল; সরু সরু চুলের মত সরু সুপারি কাটিতে পারিতেন। জাহাজী বড় সুপারী দুধে সিদ্ধ করিয়া তবে কাটিতেন। তিনি সুপারির কৌটাও করিতে পারিতেন। আবার সুপারিকে আগে গোল গোল পাতলা চাক্‌তির মতন করিয়া কাটিয়া তাহাতে ফুল তুলিতেও পারিতেন, কোনটা ধারের কাছে পদ্ম কাটা, কোনটা আবার গোলাপ ফুলের মতন করিয়া কাটা। এই সব শিল্পকর্ম না দেখিলে বুঝা যাইবে না। আমাদের ফুলশয্যার তত্ত্বে সুপারির আংটি দিয়াছিল। বাবা তাহা দেখিয়া দাসী দিদিকে বলেন, কৈ তোমার হাতের সুপারির আংটি ত দেখি নাই। পরদিনই দাসী দিদি সুপারির আংটি তৈয়ারি করিয়া (খুব ছোট ছোট আংটি) পান সাজিয়া বাবাকে দিয়াছিলেন।'

বিয়ের নিমন্ত্রণ বিয়ের পাকা-কথা, বা পাকা-পত্র হয়ে যাওয়ার পর নিমন্ত্রণপত্র লেখা হত। সেকালে কী ভাবে নিমন্ত্রণ করা হত তা আমরা জানতে পারি শ্রদ্ধেয় মহেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা থেকে— 'বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র ডাকে দিয়া পাঠানো হইত না। দূর দেশ হইলে লাল কাগজে হাতে লেখা চিঠি নাপিত দিয়া আসিত। কলিকাতার ভিতর হইলে সরকার অথবা অন্য লোক— কর্তার ছেলে বা ভাই আসিয়া নিমন্ত্রণ করিত। মেয়েদের নিমন্ত্রণ করিতে হইলে বাড়ির মেয়েরা পাল্কি করিয়া অপর বাড়ির মেয়েদের বলিয়া আসিত। তখন নিমন্ত্রণে যাইবে কিনা এই নিয়ে একটা জটলা চলিত। তখন জাত, কুল, মান এই নিয়ে ঝগড়া বাদ-বিসম্বাদ হইত। নিমন্ত্রণ করা ও খাইতে যাওয়া বড় ফেসাদের কাজ। ছেলেবেলায় আমি নিমন্ত্রণ করিতে গিয়া বড় বিব্রত হইয়াছিলাম।'

বিয়ের পদ্য বিয়েবাড়িতে পাত্রীপক্ষের বা পাত্রপক্ষের বিলি করা বিয়ের পদ্য। পাত্রীর বাড়ির দাদু-দিদিমা, মা-বাবা, দিদি-জামাইবাবু, পিসি, মাসিদের নামে পদ্য লেখা হত, এগুলি 'উপহার' নামে ছাপা হত—

'যাও মা গৌরী হরের ঘরে,
ধনে পুত্রে যেন পূর্ণ করে।
নতুন সেই আপনার ঘর,
স্মরণ রেখো চিরসাথী এই বর।'

বিয়ের পাকা পত্র শুভদিনে কনের পাকা দেখার পর, পাকা-পত্র করার প্রথা ছিল। এই পাকা-পত্র প্রসঙ্গে মহেন্দ্রনাথ দত্ত জানিয়েছেন— 'শুভ মুহূর্তে পাকা-পত্র হইত,

অর্থাৎ লাল তুলট কাগজ বা বিলাতি কাগজে বা অন্য কাগজে আলতা গুলে বা অন্য রং করে খাঁকের কলমে উভয়ের নাম, বর্ণ, গোত্র, বংশ ঠিকানা ইত্যাদি লেখা হইত এবং উপস্থিত ব্যক্তিদেরও নাম ঠিকানা লেখা হইত। তার পর একটা রূপার টাকাতে চন্দন মাখিয়ে সেই পাকা পত্রের মাথার কাছে শীলমোহর করা হইত এবং ধান, আলতা ও কলাপাতের খিলির ভিতর দুর্বাঘাস দিয়া, সম্ভবত একটা গিলা দিয়া লাল রেশমের সুতাতে সেই পত্র বাঁধিয়া বরের বাপ কনের বাপকে দিত আর চারদিকে শাঁখ বাজিত ও উলুধ্বনি পড়িত। তার পর অভ্যাগত লোকেরা পরিতোষ হইয়া আহার করিয়া চলিয়া যাইত। পাকা-পত্র প্রায় কনের বাটিতে হইত। এখন এ-প্রথা উঠিয়া গিয়াছে।'

বিয়ের সামাজিক বিয়ের সূচনা নিমন্ত্রণ দিয়ে, বাবুবাড়ির বিয়ের যেমন ঘটা তেমনই নিমন্ত্রণেও হওয়া চাই, একেই 'বিয়ের সামাজিক' বলা হত। সেকালের এই 'সামাজিক' প্রসঙ্গে মহেন্দ্রনাথ দত্তের কথা— 'যাহারা সংগতিসম্পন্ন লোক এবং দু পয়সা খরচ করিতে পারিত তাহারা 'সামাজিক' বাহির করিত। অবস্থা অনুযায়ী থালা বা ঘড়া, পিতলের বা তামার। যদি বড় মানুষ হইত, রূপার জিনিস। তাহাতে কিছু মিষ্টান্ন কাপড় দিয়া আত্মীয়, কুটুম্ব ও বিশিষ্ট লোকদের নিমন্ত্রণ করিয়া আসিত। কলিকাতায় এ-প্রথা এখন প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু গ্রামদেশে জমিদারদের ভিতর এ-প্রথা কিছু কিছু আছে।'

বিয়ের পিঁড়ি বিয়ের সময় আলপনা দেওয়া পিঁড়িতে বর-কনেকে বসিয়ে গায়ে হলুদ দেওয়া থেকে শুরু করে আশীর্বাদ, বিয়ে সবই এই বিয়ের পিঁড়িতেই বসিয়ে করানো হয়। এখন অবশ্য পিঁড়িতে আলপনা দেওয়া প্রায় হয়ই না, আলপনার পরিবর্তে চিত্রিত রঙিন কাগজ আঠা দিয়ে পিঁড়িতে লাগিয়ে কাজ চালানো হয়।

বিয়ের বিদায়ী পান বিয়ের পর মেয়ে যখন স্বামীর সঙ্গে পতি-গৃহে যাত্রা করেন তখন তার হাতে একটি পান দেওয়া হয়। দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া বিষয়ে পান দেওয়া প্রাচীন প্রথা।

এই প্রথা শুধু বিবাহে নয়, অন্য ক্ষেত্রেও দেখা যেত, যেমন কবি আলাওলের পদ্মাবতীতে একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। সেখানে বাদশা আলাউদ্দিন রত্ন সেনের রাজ্য চিতোর আক্রমণ করতে উদ্যত হলে তার অনুগত সুজনেরা বাদশাহকে এই কাজে বিরত থাকতে অনুরোধ জানান, না হলে বাদশাহ যেন তাঁদের পান দিয়ে বিদায় দেন।

বিয়ের শাঁখা বিয়ের দিন সকালে কনেকে হলুদ দিয়ে স্নান করিয়ে, কেউ কেউ

বিকেলে কনে সাজাবার সময় কনের হাতে শাঁখা ও লোহা পরিয়ে দেয়।

বিয়ের শাঁখ বিবাহ অনুষ্ঠানে প্রতিটি লোকাচার অনুষ্ঠানেই শাঁখ বাজাতে হয় বলে বিয়ের শাঁখকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

বিয়েতে পানের বাটা 'বিবাহে অন্যান্য দান-সামগ্রীর মধ্যে পানের বাটা, পানের ডিবা দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। আজকাল [১৯৬৬ খ্রি.], গত ২০/২৫ বছর পানের বাটা আর বড় একটা দেখিতে পাই না। পানের ডিবা এখন পর্যন্ত পূর্ণ-গৌরবে বজায় আছে।' কথাগুলি শুনিয়েছেন যম যত্ত ওরফে যতীন্দ্রমোহন দত্ত।

পানের বাটা অর্থাৎ পানের থালা। 'আগে বহু বাড়ীতে ক্রিয়া কর্মোপলক্ষে পান সাজিবার জন্য সরঞ্জাম থাকিত। বড় বড় পিতলের থালা, পান ভিজাইবার গামলা, চুনের ভাঁড়, খয়েরের ভাঁড়, চুন লাগাইবার মোটা পিতলের কাঠি, খয়ের দিবার ছোট হাতা, দারুচিনি, জয়িত্রী কাটিবার ছোট জাঁতি ইত্যাদি থাকিত। সুপারি কাটিবার জন্য ২/৩ রকমের জাঁতি থাকিত। আগেকার দিনে ক্রিয়া কর্মোপলক্ষে আগত স্ত্রীলোকেরা পান সাজিতে বসিতেন— এখন অপছন্দ করেন; ফলে দোকান হইতে আনা কাঁচি-কাটা ছাঁচিপানের খিলী আমদানী করা হয়।'

বাঁধা রোশনাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন— 'কখনও কখনও বড় মানুষেরা বাঁধা রোশনাই করিত। অর্থাৎ বাটি হইতে কনের বাড়ি পর্যন্ত যে রাস্তা পড়িবে সেই রাস্তার উভয় পার্শ্বে এই খাস গেলাসের ঝাড় পুঁতিয়া দিয়া যাইত। সাধারণ শোভাযাত্রায় খাস গেলাসের ঝাড় যেমন বরের সহিত হাতে করিয়া লইয়া যাওয়ার প্রথা, বাঁধা রোশনাই-এতে তাহা করিতে হইত না।'

বীজী বিবাহে ঘটক বরপক্ষ বরের বংশ গণনায় পরম্পরা যার থেকে শুরু ধরা হয়।

বীরমুঠার কড়ি উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে হলুদ ছোপানো এক খণ্ড বস্ত্রে একুশটি কড়ি, একুশটি হলুদ ও একুশটি সুপারি বেঁধে— যা বীরমুঠার কড়ি নামে পরিচিত— তা পাত্রের বাড়ি থেকে নাপিত কনের বাড়িতে নিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত কনের গায়ে হলুদ হয় না।

বৃদ্ধের বিবাহ 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় ১৮২১ খ্রিস্টাব্দ ৩০ জুন তারিখে 'বৃদ্ধের বিবাহ' শিরোনামে যে সংবাদটি ছেপেছেন— 'দক্ষিণ দেশে ফরকাবাদ নামে এক গ্রামের এক ব্রাহ্মণ বহুকালাবধি মাতামহালয়ে কলিকাতা থাকিয়া শিষ্য যজমান করিয়া কিঞ্চিৎ ধন সঞ্চয় করাতে পাঁচ শত টাকা ব্যয় করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন তাহাতে তিন চারি পুত্র ও দুই তিন কন্যা জন্মিয়া সংসার সুন্দররূপে নির্বাহ হইতেছিল ইতোমধ্যে ওই ব্রাহ্মণের স্ত্রীর কাল হওয়াতে তিনি দুঃখসাগরে মগ্ন হইয়া পৈতৃক বাটিতে গেলেন।

সেখানে গিয়া অনেক ঘটকের সাক্ষাতে কহিলেন যে আমার গৃহ শূন্য হইয়াছে যদি তোমরা আমাকে [সংসারে] স্থাপিত কর তবেইত সংসারে থাকি নচেৎ দুই চক্ষু যে দিকে যাইবে সেই দিকেই যাইব। ইহা কহিতে২ চক্ষুর জলে বুক ভাসিয়া গেল তাহা দেখিয়া ঘটকেরা তাঁহাকে আশ্বাসরূপ... কহিলেক মহাশয়ের বয়ঃক্রম কত হইবেক। তিনি কহিলেন যে প্রায় সত্তরি বৎসর কোষ্ঠী রাখি না ঠিক বলিতে পারি না ছেহত্তরের মন্বন্তরের সময়ে আমার বয়স বৎসর পঁচিশ ছাব্বিশ হইবেক... পরে ঘটকেরা কন্যার অন্বেষণে দিকে ২ গেল মোকাম বৈদ্যবাটীতে আটার উনিশ বৎসর বয়স্কা এক কন্যা স্থির করিয়া আসিয়া কহিল যে... পরম সুন্দরী উনিশ বৎসর বয়স্কা এক কন্যা স্থির করিয়াছি অবীরা কুলীনের মেয়ে ৫০০ টাকা পণ দিতে হইবেক আর সর্বাঙ্গে সোনার গহনা ইহা যদি পার তবে হইবেক আর আমাদের ঘটকালি ১০০ টাকা চাহি। মজুমদার ঐ কথা শুনিয়া আহ্লাদে ডুবু ২ হইয়া কহিলেন... আপনারা শীঘ্র গিয়া লগ্নপত্র করিয়া আইসুন।... ঘটকেরা কহিল... রাহা খরচের টাকা দেও মেয়ে এইখানে উঠিয়া আনি গিয়া।

ঘটকেরা ১০ টাকা রাহা খরচ লইয়া সেই কন্যার আলয়ে গেল। কন্যা সেই দণ্ডে এক পালকীতে আরোহণ করিয়া বরপাত্রের গ্রামের নিকটে উপস্থিত হইল। পাত্রটি সেইখানে গেলে কন্যা... কহিলেন যে আমি ও বুড়া বরকে বিবাহ করিব না।...

অনেক বুঝান সুজানের পর কন্যা রাজী হইলেন ও কহিলেন যে তবে আমি বিবাহ করিব যদি গয়না ও টাকা আমার হাতে দেয় তখন ব্রাহ্মণ... গয়না লইয়া গেলেন বাটীখানি বন্ধক রাখিয়া ৫০০ টাকা কর্জ করিয়া লইয়া দিলেন বিবাহ হইল বাসরঘরে অনুসার গেল না। সুশীলা কহিলেন যে আমার পীড়া আছে আমাকে স্পর্শ করিও না। পরে কলিকাতা আনিলেন ডাক্তারের ওষধি দিতে লাগিলেন দশ পোনের দিবসের পর কুলীনের কন্যা আপন কুলে পলাইয়া গেলেন।...

অতএব শুন বিবাহেচ্ছুক মহাশয়েরা সাবধান ২।'

এমন ঘটনা সেকালে বহু ঘটত।

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ বিবাহের আরম্ভ অনুষ্ঠান। পূর্বপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, আশীর্বাদ প্রার্থনা করে যে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করা হয়।

ব্যা বিবাহ। উত্তর চব্বিশ পরগনার আঞ্চলিক ভাষা।

বে বিয়ে, আঞ্চলিক ভাষা।

বিহা বিয়ে, আঞ্চলিক ভাষা।

বিহাখানা বিবাহের ভোজ, উত্তর চব্বিশ পরগনার অঞ্চলিক ভাষা।

ভ

ভগ দেবতা বিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

ভারি লগ্ন বিবাহে মধ্যরাত্রের লগ্ন।

ভার্যা 'উদ্বাহ জন্য সংস্কারবন্নারীত্বম্ ভার্যাত্বম'— বিবাহজনিত নারীগত সংস্কারকে ভার্যা বলে। অর্থাৎ নারী বিবাহ সংস্কার যুক্ত হলেই ভার্যা হন। এই অনুষ্ঠান দ্বারা স্ত্রীর বিশেষ ভাবে ভরণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন স্বামী। বিবাহ অনুষ্ঠানে বর মনে করে, এই কনেই আমার ভার্যা— 'মমেয়ং ভার্যা'। আর কনে মনে করেন, এই বরই আমার ভর্তা 'মমায়ং ভর্তা'।

ম

মঙ্গলস্নান গায়ে তেল-হলুদ মাখিয়ে বর-কনেকে স্নান করানো অনুষ্ঠান। বিজয় গুপ্ত মনসা মঙ্গলে এই অনুষ্ঠানকে 'মঙ্গলস্নান' বলে উল্লেখ করেছেন:

'পঞ্চস্বরে বাদ্য বাজে মনোহর।
বিবাহের মঙ্গল স্নান করে মুনিবর।।...
তিল তৈল আমলকি হরিদ্রা পীঠালি।
লেপিয়া মুনির অঙ্গে কৌতুক জল ঢালি।।
অষ্ট অঙ্গে ছোয়াইয়া রজকে দিন খার।
গঙ্গাজলে স্নান করাইল আরবার।।

মঙ্গলসূত্র বিয়েতে অধিবাসের দিন দূর্বা-তেল-হলুদে সিক্ত নতুন কার্পাস সুতো বরের ডান ও কনের বাম মণিবন্ধে বেঁধে দেওয়া সুতো।

মঙ্গলাষ্টক নবদম্পতির সৌভাগ্য কামনা করে বিয়েতে ব্রাহ্মণ যে আশীর্বাদ শ্লোকষ্টক পাঠ করেন।

মঙ্গলৌষধি বিয়ের পিঁড়িতে বর বসার পর বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি হস্তলেপ লেপন করবেন। ভবদেব লিখেছেন:

'মঙ্গলৌষধিলিপ্তেন দক্ষিণহস্তেন তাদৃশমেব
কন্যায়া দক্ষিণহস্তং স্বহস্তোপরি নিদ্ধ্যাৎ।'

নিজের মঙ্গল ঔষধিলিপ্ত দক্ষিণ হস্তের উপর কন্যার সেইরূপ মঙ্গলৌষধিলিপ্ত দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করবেন।

মঙ্গলৌষধি যে সব ভেষজ গাছ দিয়ে প্রস্তুত করা হত সেগুলির মধ্যে অন্যতম:

সহদেবা [এক প্রকার উদ্ভিদ ভেষজ]

ময়ূর শিখা [উদ্ভিদ ভেষজ]
বিষ্ণুক্রান্ত [অপরাজিতা]
শতপুষ্পী [মৌরী]
মোহিনী [অজ্ঞাত]
সর্জ্জরস শিকথ [মোম]
কুভকুম [জাফরান]
চন্দন-গুঞ্জ [কুঁচ]
কর্পূর-মদনকোষ [ধুতুরা ফুল]
কাকোলী লতা [অজ্ঞাত]
কস্তুরী [মৃগনাভি]
জাতিফল ইত্যাদি

মধুপর্ক সাধারণত ঘৃত, দধি, জল, মধু, চিনি একত্র করলে মধুপর্ক হয়। মধুপর্ক একটি নতুন কাঁসার বাটিতে রেখে আর একখানা কাঁসার বাটি দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। প্রাচীনকালে মাংস ছাড়া মধুপর্ক হত না। জনকরাজার মতো কেউ কেউ নিঁরামিষাশী ছিলেন। তাঁদের জন্য মাংস বাদ দেওয়া হত। মধুপর্কের জন্য গো-মাংস ছিল প্রশস্ত। বর আসার জন্য অপেক্ষা করার সময় তাঁর জন্য একটি গাভী রাখা হত। মধুপর্কের অনুষ্ঠানের প্রথমাংশ শেষ হলে, যখন মাংস দেওয়ার সময় হত তখন সম্প্রদাতা গাভীটি ও একটি খড়্গ নিয়ে বরকে প্রশ্ন করতেন, 'ওঁ গৌঃ-র্গো র্গৌঃ অর্থাৎ গাভীটি কি কাটব? যদি জামাতার মাংস খাওয়ার ইচ্ছে হত তা হলে তিনি 'হ্যাঁ' বা ইচ্ছে না হলে 'না' বলতেন। বর্তমানে গো-মাংস ভক্ষণ হিন্দুমতে নিষিদ্ধ হওয়ায় সম্প্রদাতা বা নাপিত বরকে জিজ্ঞাসা করেন 'ওঁ-গৌ-র্গৌ-র্গৌঃ। বর না খাওয়ার পক্ষে 'না' বলেন।

মধুচন্দ্রিমা বিয়ের পর নবদম্পতির প্রমোদবিহারে যাওয়া। কোথাও 'মধুচন্দ্র' বলে।

মনোদত্তা অমুকের সঙ্গে বিয়ে দেব এমন সংকল্প রয়েছে যার।

মাজদর্পণ পূর্ববঙ্গে বিয়ে করতে যাওয়ার সময় বর কলার মাজপাতা পেতলের বা লোহার দর্পণে বেঁধে হাতে নিয়ে যায়।

মালাবদল শুভদৃষ্টির পর মালাবদলের অনুষ্ঠান। বর নিজের গলার মালা কনের গলায়, কনে নিজের গলার মালা বরের গলায় পরিয়ে দেওয়ার অনুষ্ঠান।

মুখচন্দ্রিকা কনের আত্মীয়গণ কনেকে একখানা উলটো করা পিঁড়িতে বসিয়ে এনে প্রথমে বরের বাঁ দিকে পাশাপাশি করে পূর্বমুখ করে উঁচু করে ধরে। পরে বরকে

তার ডান দিকে রেখে প্রদক্ষিণ করে সাত বার ঘোরে। এই সময় বরের মুখ ঢাকা থাকে। শুভদৃষ্টির সময় বর কনের মাথার উপর দিয়ে একখানা কাপড় ধরা হয়। এটি বর-কনের পরস্পরের মুখ দেখার অনুষ্ঠান।

মুঙ্গলী হাঁড়ি চব্বিশ পরগনার ভাষা, মঙ্গল হাঁড়ি। অন্য আই হাঁড়ি। বিয়েতে আয়ু বৃদ্ধি সূচক নানা রঙে চিত্রিত মাটির মাঙ্গলিক হাঁড়ি। এতে হলুদ মাখা সিদ্ধ চাল, সুপারি, চারটি কড়ি থাকে।

মুড়লা বিয়েতে বরের মুকুট। অন্য নাম মুড়েলা।

মিত কনে বিয়েতে কনের শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার সময় যে সখী বা বন্ধু কনের সঙ্গিনী হয়ে যেত বা যায়। এর অন্য নাম 'মিতিন কন্যা'।

মিতবর বরের যে মিত্র বা বন্ধু সঙ্গে যেত। বধূর অভিষেক ক্রিয়ায় 'মিত্রাভিষেক' অনুষ্ঠানে এর ডাক পড়ত। বর্তমানে এই অনুষ্ঠানটি উঠে গেছে, এর জায়গায় বিয়ের সময় বরের সঙ্গে যায় ছোট বর বেশে একটি ছেলে। মিতবর হয়ে যায় 'নিতবর' রূপে। এর অন্য নাম 'কোলবর'।

মেয়ের আশীর্বাদ কনে পছন্দ হয়ে গেলে বরপক্ষের গুরুস্থানীয় ব্যক্তি পুরোহিতকে সঙ্গে নিয়ে কনের বাড়িতে গিয়ে স্বর্ণালঙ্কার দিয়ে কনেকে আশীর্বাদ করে বিয়ে কথা পাকা করে আসার অনুষ্ঠান।

য

যোড় বিজোড় বিয়ে সেকালে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলীন কায়স্থগণ আদি পুরুষ হতে তাঁরা কত পুরুষ তার হিসেব রাখতেন। ছেলেমেয়েদের বিয়ের সময় যোড়ে যোড়ে যেমন ২৪শে ২৪, ২৪শে ২৬ বা ২৪শে ২৮ পর্যায়ে বিয়ে দিতেন। আবার বিজোড়ে বিজোড়ে ২৫শে ২৫, ২৫শে ২৭ বা ২৫শে ২৯শে বিয়ে দেন। কিন্তু কখনওই ২৪শে ২৫শে অর্থাৎ যোড় বিজোড়ে বিয়ে দিতেন না। বিয়ে দিলে কুল রক্ষা হত না।

যোক্তবন্ধন বর কনের কাপড়ের শেষ প্রান্তে গিঁট বাঁধা।

যৌতুক বিয়ের সময় বর বা কনেকে দেওয়া দ্রব্যাদি। বর-বধূ যখন একসঙ্গে বসে তখনকার সংজ্ঞা হল 'যুতক'। দু' বাড়ির কাছ থেকে এই সময় যে উপহার পায় তা যৌতক বা যৌতুক নামে পরিচিত হয়।

র

রক্ষাসূত্র বিবাহে অমঙ্গল না হওয়ার জন্য হাতে যে সুতো বাঁধা হয়।

রাক্ষস বিবাহ যুদ্ধে পরাজিত করে বা বলপূর্বক পিতার কাছ থেকে কন্যাকে হরণ করে বিবাহ।

রাজযোটক বিয়েতে বর-কনের শ্রেষ্ঠ মিল। বরপক্ষ কনেপক্ষ— দুই পক্ষের মত হলে জ্যোতিষ শাস্ত্রের লিখিত রাজজোড়ার মিল দেখে বিয়ে দেওয়ার রীতিকে রাজযোটক বলে।

রীত বিবাহে বংশের প্রথা

রুপোর জাঁতি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বর যখন বিয়ে করতে যায় তখন তাঁদের রুপোর জাঁতি হাতে নিয়ে যেতে হয়।

রূপহলুদ বিবাহে গায়ে হলুদের হলুদ, এই হলুদকে রূপপ্রদায়ক রূপে দেখা হয় বলে এমন নাম।

রেক্তা বিয়ের মঙ্গল গীত।

রেজিস্ট্রি আইনসম্মত উপায়ে পতি ও পত্নীর বিবাহ-সম্বন্ধ।

ল

লাজহোম 'লাজ' শব্দের অর্থ খই। ধান থেকে খই করে হোম করা হয় বলে এর নাম লাজ হোম বা খই পোড়ানো হোম বলে। এই হোম শুধু মাত্র বিবাহ সংস্কারে কনের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়। পারস্কর গৃহ্যসূত্রে (৬ষ্ঠ কন্তিকা) এর অনুষ্ঠান বিধির কথা লেখা রয়েছে।

এই হোমে বধূর ভাই ঘি মিশ্রিত শমীপত্রযুক্ত কিছু খই একখানা কুলোতে চার ভাগ করে রাখবে। এক ভাগ 'ভগ' নামে দেবতার জন্য। অবশিষ্ট তিন ভাগের মধ্যে প্রত্যেক ভাগকে আবার তিন ভাগ করতে হয়। এই ছোট নয় ভাগের তিন ভাগ অর্যমার জন্য ও ছয় ভাগ অগ্নির জন্য। মোট দশটি আজ্যাহুতি। অগ্নির সম্মুখে অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে পূর্বমুখী হয়ে বধূ দাঁড়াবে, তার পেছনে দাঁড়াবে বর। কনের কোমর ঘিরে কনের সামনে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে। বরের হাতের উপর বধূর হাত থাকবে। তার পর বধূ মন্ত্রের সঙ্গে লাজাহুতি দেবে। বধূ তিন বার অর্যমার উদ্দেশে তিনটি ও অগ্নির উদ্দেশে ছ'টি মোট ন'টি লাজাহুতি দেওয়ার পর কুলোর বাকি খই বধূর হাতে দিলে বধূর ডান হাতের নীচে বরের ডান হাত এবং বাঁ হাতের নীচে বাঁ হাত রেখে আহুতি দেয়। কোথাও কুলোর অগ্রভাগ দিয়ে আহুতি দেওয়া হয়। পশুপতি মতে বর মন্ত্রগুলি পড়বে, কিন্তু হরিহর পদ্ধতিতে মন্ত্র কনেই পড়বে।

লাজাঞ্জলি মন্ত্র লাজাঞ্জলির মন্ত্র পড়ে কনে অঞ্জলির খই হোমাগ্নিতে ঢেলে দেবে। এই মন্ত্রগুলি হল যথাক্রমে:

১. ওঁ অর্য্যমণং দেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষত।

স নো অর্যমা দেবঃ প্রেতো মুঞ্চতু মা পতেঃ স্বাহা॥

ইদমর্য্যম্নে, ইদং ন মম।

এই কন্যা অগ্নিরূপ অর্যমা দেবকে অর্চনা করলেন। এই অর্যমা দেব আমাকে [এই কন্যাকে] যেমন আজ পিতৃকুল হতে বিচ্ছিন্ন করলেন, তিনি যেন আমাকে পতিকুল হতে কখনও বিচ্যুত না করেন। এই ঘি অর্যমাকে দিচ্ছি, তা আমার জন্য উদ্দিষ্ট নয়।

২. ওঁ ইয়ং নার্য্যুপব্রূতে লাজানাবপন্তিকা।

আয়ুষ্মানস্তু মে পতিবেন্ধতাং জ্ঞাতয়ো মম স্বাহা॥

ইদমগ্নয়ে, ইদং ন মম।

আমি [এই কন্যা] প্রজ্বলিত অগ্নিতে এই যে লাজ নিক্ষেপ করছি, এর উদ্দেশ্য আমার পতি আয়ুষ্মান হোন, এবং আমার জ্ঞাতিকুল সুখসমৃদ্ধ হোক। এই লাজা অগ্নির উদ্দেশে দিচ্ছি, আমার উদ্দেশে নয়।

৩. ওঁ ইমাল্লাজানাবপাম্যগ্নৌ সমৃদ্ধিকরণং তব।

মম তুভ্যং চ সাংবননং তদগ্নিরনুমন্যতামিয় ওঁ স্বাহা।

ইদমগ্নয়ে, ইদং ন মম।

হে স্বামি, আপনার সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই লাজাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করছি; আপনার এবং আমার উভয়ের মধ্যে যে প্রেম, অগ্নিদেব তার অনুমোদন করুন।

লগ্নদগ্ধ জ্যোতিঃসার সংগ্রহ গ্রন্থে দিনের বেলায় বিবাহ হলে সেই লগ্নকে দগ্ধলগ্ন বলা হয়েছে। এই দিবালগ্নে বিবাহ হলে কন্যা স্বামীঘাতিনী হয়, তাই দিনের বেলায় বিবাহ নিষিদ্ধ।

লগ্নপত্র বিবাহের কথা পাকা হয়ে গেলে বিয়ের লগ্ন তারিখ ইত্যাদি দেখে একটি কাগজে লাল কালিতে যে পত্র লেখা হয়।

লৌকিকতা বিবাহে লৌকিকতাস্বরূপ যে উপহার দেওয়া হয়।

শ

শয্যাতুলুনি বিয়ের পরদিন সকালে বাসরশয্যা তোলার জন্য কনেপক্ষের মেয়েদের দাবি মতো টাকা আদায়ের লৌকিক অনুষ্ঠান।

শয্যা তোলা বিয়ের পরদিন সকালে বাসরশয্যা তোলার স্ত্রী-আচার বিশেষ।

শাম ভাঙ্গা চব্বিশ পরগনায় বিবাহ অনুষ্ঠানে ঢেঁকির কাজে শ্যামচণ্ডীর উদ্বোধনরূপ স্ত্রী-আচার।

শিলারোহণ বিবাহে লাজ হোমের অগ্নির উত্তরে একখানা শিল এবং তার উপরে একখানা নোড়া রাখা হয়। হোমের পর বর তাঁর ডান পা দিয়ে বধূর ডান পা'খানি ঠেলে দিলে বধূ শিলের উপর আরোহণ করবে এবং তখন বর মন্ত্র উচ্চারণ করবে।

শুভদৃষ্টি ছাঁদনাতলায় সাতবার বরকে প্রদক্ষিণ করে এবং স্ত্রী আচারের পর শুভ মুহূর্তে কনের সঙ্গে বরের যে দৃষ্টিবিনিময় হয়।

শুভরাত্রি বিয়ের তৃতীয় রাত ফুলশয্যার রাতকে শুভরাত্রি বলা হয়।

শ্রী বিবাহ অনুষ্ঠানে অধিবাস ক্রিয়া সম্পাদন কালে আতপচাল ও কলাই ডাল বেটে 'শ্রী' নামক যে স্বস্তিকাকার মাঙ্গলিক বস্তু তৈরি করা হয়। আঞ্চলিক ভাষায় 'শ্রী' শব্দটি 'ছিরি' হয়েছে।

শ্রীখণ্ডী আলপনা দেওয়া বিয়ের পিঁড়ি।

ষ

ষোলো টাকায় বিবাহ সেকালে কুলীন সন্তান বিবাহকালে কন্যার পিতার কাছ থেকে কৌলীন্যমর্যাদা স্বরূপ মাত্র ষোলো টাকা দাবি করতে পারতেন, এটাই নিয়ম ছিল।

স

সংস্কারাঙ্গ হোম বিবাহ সংস্কারের অঙ্গস্বরূপ যে হোম করা হয়। এই হোমের সাধারণ নাম কুশণ্ডিকা বা কুশকণ্ডিকা।

সঘর বিয়ের সম্বন্ধ করার মতো উপযুক্ত বংশ।

সন্তানসন্ধি কন্যাদান করার সন্ধি বা চুক্তি।

সপ্তপদী বিয়েতে বর-বধূতে সপ্ত মন্ত্রে যে সপ্ত মণ্ডলিকায় সাত পা গমন করে।

সপ্তপদীগমন বিবাহ-অগ্নির উত্তরে পিঁটুলি দিয়ে একটি ছোট গোলাকৃতি মণ্ডল আঁকা হয়। তার পূর্বে আর একটি, তার পূর্বে আরও একটি— এই ভাবে মোট সাতটি গোলাকৃতি মণ্ডল আঁকা থাকে।

বধূ পশ্চিমের শেষ মণ্ডলে দাঁড়াবে, বর তার পিছনে দাঁড়াবে। বধূর ডান পা সব সময় আগে থাকবে, বাঁ পা পিছনে থাকবে। বর তার ডান পা দিয়ে বধূর ডান পা প্রথম মণ্ডলের উপর ঠেলে দেবে, এই ভাবে সপ্তপদ বা সাতবার পা এগিয়ে যাবে। প্রতি পদেই একটি মন্ত্র বলতে হবে। সপ্তপদী গমনের মন্ত্রের অর্থ হল:

১. হে ইহকাল ও পরকালের মিত্র, তোমাকে অন্নলাভের জন্য বিষ্ণু এক পদ চালিত করুন।
২. সখে, তোমাকে বল লাভের জন্য বিষ্ণু দুই পা চালিত করুন।

৩. সখে, তোমাকে নিদিলাভের জন্য বিষ্ণু তিন পা চালিত করুন।

৪. সখে, তোমাকে সুখোৎপত্তির জন্য বিষ্ণু চার পা চালিত করুন।

৫. সখে, তোমাকে পশুলাভের নিমিত্ত বিষ্ণু পাঁচ পা চালিত করুন।

৬. সখে, তোমাকে অনুকূল ঋতু লাভের নিমিত্ত বিষ্ণু ছয় পা চালিত করুন।

৭. সখে, সপ্তপদ গমনের কার্যদ্বারা সংস্কৃতা হও, সেই আমার অনুবর্তিনী হও।

সপ্তমপদ বিবাহে সপ্তপদী গমনের শেষ পদ গমন, এই সপ্তমপদ গমনের পরই নারীর স্বগোত্র অর্থাৎ পিতৃগোত্র নিবৃত্তি হয়।

সর্বোষধি স্নান বিবাহে গায়ে হলুদ দিয়ে স্নান করানোকে প্রাচীন কালে 'সর্বোষধি স্নান' বলা হত। মঙ্গলকাব্যের কবি জয়ানন্দ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন:

'বিষ্ণু তৈল হরিদ্রা আমলকি উদ্বর্তনে।
সর্বোষধি স্নান করি বসে দিব্যাসনে॥'

সমকক্ষ ঘর 'পাত্র বা পাত্রীর পিতা অথবা অভিভাবকেরা ঘটকের নিকট গিয়া সংবাদ লইতেন যে, তাঁহাদের সমকক্ষ কৌলীন্যমর্যাদাসম্পন্ন ব্রাহ্মণ কোথায় আছেন। যিনি সংবাদ লইতে যাইতেন, অগ্রে তিনি নিজের বংশ-পরিচয় ঘটকের নিকটে বর্ণনা করিতেন। সেই বর্ণনা শুনিয়া তবে ঘটকমহাশয় তাঁহাকে বলিতেন যে, কোন গ্রামে তাঁহার সমকক্ষ ব্রাহ্মণ আছেন। একালে যাঁহারা ঘটকালি করেন, তাঁহারা পাত্র বা পাত্রীর সন্ধান বলিয়া দেন, সেকালের ঘটকেরা পাত্র-পাত্রীর সংবাদ বড় রাখিতেন না, তাঁহারা বলিয়া দিতেন— 'অমুক স্থানে আপনার সমকক্ষ তিন-চারি ঘর ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদের কাহারও বিবাহযোগ্য পুত্রকন্যা আছে কিনা, গিয়া সংবাদ লইতে পারেন।' ঘটকেরা এই সকল সংবাদ বিনা পারিশ্রমিকে সরবরাহ করিতেন না, কিঞ্চিৎ দর্শনী লইতেন। তাঁহারা পাথেয় এবং পারিশ্রমিক পাইলে স্বয়ং গিয়া পাত্র-পাত্রীর সংবাদ লইয়া আসিতেন।'— এই কথা শুনিয়েছেন যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'স্মৃতিতে সেকাল'-এ।

সমকন্যা বিয়ের সম্পূর্ণ যোগ্য কন্যা।

সমীক্ষণ শুভদৃষ্টি।

সম্প্রদদে মহর্ষি ব্যাস-এর মতে, নাম ও গোত্র উচ্চারণপূর্বক শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে পরিতুষ্ট চিত্তে 'তোমাকে আমি সম্প্রদান করছি' বলে যে দান করা হয়।

সহাজল বিয়ের জলভরা অনুষ্ঠান। বিয়ের দিন ভোরবেলা থেকে বেলা বারোটার মধ্যে বর ও কনের বাড়ির পাঁচ অথবা সাত জন সধবা এয়োস্ত্রী মিলে প্রথমে শঙ্খ ও উলুধ্বনি সহকারে কোনও দেবস্থানে যান। তাঁদের হাতে থাকে পান-সুপারি, সন্দেশ,

তেল-হলুদ, একটি গাড়ু ও একটি মঙ্গলঘট বা কলসি। একজন কলসি নিয়ে পুকুর থেকে জল তুলে পথে জল ঢালতে ঢালতে কাছের কোনও দেবমন্দিরে গিয়ে ওই সব জিনিস রেখে ওই মন্দিরের একজন সধবা ব্রাহ্মণীকে আলতা ও সিঁদুর পরিয়ে দিলে, ওই মহিলা ঘাটের দু' পাশে তিন বার করে ছয় বার জল ঢেলে মঙ্গলঘট বা কলসির মধ্যে আরও তিন বার জল ঢেলে দেন। এয়োরা সেখানে ঘট বা কলসিকে বরণ করে ওই ব্রাহ্মণীকে পান-সুপারি সন্দেশ প্রভৃতি দেন। তার পর তাঁরা ওই ঘট বা কলসি নিয়ে শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি করতে করতে পাঁচ বাড়ি যান। বাড়ির সধবারা জল দিলে তাঁরা পান-সুপারি, হলুদ, সন্দেশ প্রভৃতি দিয়ে বিয়েবাড়িতে ফিরে যান। এর পর বরের বাড়িতে বর ও কনের বাড়িতে কনে যখন কলাতলায় স্নান করে তখন ওই এয়োগণ তাদের মাথায় 'সহা জল' ঢেলে দেন। এর পর এয়োরা ওই কলাগাছের গায়ে জড়ানো চরকা-কাটা সুতো খুলে নিয়ে কনের বাম হাতে তিন পাক ও বরের ডান হাতে তিন পাক জড়িয়ে দেন।

স্বয়ংবর বিবাহ এই বিবাহের কথা কোনও শাস্ত্রে লেখা নেই, তবে গান্ধর্ব বিয়েরই একটি রূপ এটি। এই বিবাহ বিশেষত ক্ষত্রিয় রাজবংশে প্রচলিত ছিল।

সাতপাক বিবাহ বাসরে বর শোলার টোপর মাথায় দিয়ে দাঁড়ালে, সুসজ্জিতা সালঙ্কৃতা কন্যাকে পিঁড়িতে বসিয়ে চার জন লোক তুলে এনে বরের চারিদিকে সাত বার প্রদক্ষিণ করান। প্রত্যেক প্রদক্ষিণের সঙ্গে সঙ্গে কনে বরকে ফুল দিয়ে বরণ করে করজোড়ে প্রণাম করে, সেই সময় এয়োরা উলু ও শঙ্খধ্বনি করেন।

সিঁদুর সিন্দুর। বিয়ের আচারে আনুষ্ঠানিক ভাবে সিঁদুর পরানো অনুষ্ঠানকেই মুখ্য বলে ধরা হয়। বাংলাদেশে সিঁথির সিঁদুর এয়োতির লক্ষণ। বিয়ের রাতে বা বাসি বিয়ের অনুষ্ঠানে বর কনের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেয়। বৈদিক বা সনাতন হিন্দু বিবাহ-আচারে রীতিটি অন্তর্ভুক্ত নয়, এটি লৌকিক আচার হলেও বর্তমানে অবশ্যপালনীয় অনুষ্ঠান বলে পরিচিত।

লাল রং নবোদিত সূর্যের প্রতীক। সূর্যোপাসক কোনও আদিম জাতির মধ্যে বিবাহ আচারে সূর্যের প্রতীককে স্বামী নববধূর ললাটে সূর্যের তেজ ধারণ করিয়ে শুভকার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন বলে অনেকে বিশ্বাস করেন।

ছোটনাগপুরের অধিবাসী ওরাওঁ বীরহোড় প্রভৃতি উপজাতির মধ্যে কনের সিঁথিতে সিঁদুর দানই বিয়ের মুখ্য আচার। এই অনুষ্ঠানের নাম 'ইসুং সিন্দ্রি'। এই 'সিন্দ্রি' শব্দটি থেকেই সিন্দুর শব্দটি অনার্য ভাষা থেকে এসেছে বলে মনে করা হয়। ওরাওঁ বিয়েতে বর কনেকে সিঁদুর দান করলে বিবাহ অর্ধেক হল বলে ধরা হয়। এর

পর কনের বউদি কনের তর্জনীটি ধরে তাতে সিঁদুর লাগিয়ে বরের কপালে দিতে বললে, কন্যা এটি করলেই সম্পূর্ণ-বিবাহ হল। এদের রীতি দু'-জন দু'-জনকেই সিঁদুর দান করবে অর্থাৎ সূর্যের তেজ দুজনেই গ্রহণ করবে।

সিঁদুর দান বিবাহে বধূর সীমন্তে সিঁদুর দেওয়ার প্রথা প্রাচীন। সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা নারীর সৌভাগ্যের বা সধবা অবস্থার পাকা প্রমাণ বলে ধরা হয়। বৈদিক শাস্ত্রে এর ব্যবস্থা নেই। সামবেদীয় পদ্ধতিকার ভট্টদেব [একাদশ শতক] এবং যজুর্বেদীয় পদ্ধতিকার পশুপতি পণ্ডিত [দ্বাদশ শতক] দুই বাঙালি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই তাঁদের পদ্ধতি পুস্তকে পৌরাণিক কোনও শাস্ত্রে এর ব্যবস্থা খুঁজে না পেয়ে 'শিষ্টসমাচারাৎ' ভদ্রসমাজে প্রচলিত প্রথা অনুসারে বর কর্তৃক বধূর সীমন্তে সিঁদুর দানের উপদেশ দিয়েছেন।

অনেকে মনে করেন, অনার্য ভারতে অসভ্য জাতির কন্যাহরণ কালে যুদ্ধবিগ্রহে রক্তপাত ঘটত, যার জয় হত সেই হরণকারী যুবক নিজের আঙ্গুল কেটে রক্ত বের করে সেই অপহৃতা যুবতীর ললাটে রক্তের ফোঁটা দিয়ে তার উপর নিজের স্বত্ব বা অধিকার স্থাপন করার প্রমাণ দিত। সেই রক্ত ফোঁটাই পরবর্তীকালে সিঁদুর ফোঁটা হয়ে প্রাচীন বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

রামকৃষ্ণের 'শিবায়ন' কাব্যে বিয়েতে সিঁদুর পরানো প্রসঙ্গে লেখা রয়েছে:

'শঙ্কর আপন হাতে সিন্দূর দিলেন সিঁথে
পরশিল কর কর্ণ শোভা।
আচ্ছাদন দিল শিরে দেখি তথা কন্যাবরে
মোহিত হইল দেবসভা।'

কন্যাসম্প্রদান কালে বরের হাতে কনের মাথায় সিঁদুর দান করানোর প্রথাও খুব প্রাচীন। ঘনরামের রচনায় প্রসঙ্গ-কথা রয়েছে এ ভাবে:

'সাঙ্গ হল সম্প্রদান লজ্জা ত্যাজি দূর।
সেন দিল সীমন্তিনীর সিঁথায় সিন্দুর।।'

বিয়েতে যাঁদের কুশণ্ডিকা থাকে তাদের কুশণ্ডিকার পর সিঁদুর দান হয়। বাসি বিয়ের সময়ও অনেকে সিঁদুর দান করে থাকেন।

সিঁদুরকে 'বশীকরণ'-এর উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয় বলে অনেকে মনে করেন।

সিঁদুরদান মন্ত্র সামবেদীয় ভবদেব ভট্টের পদ্ধতিতে রয়েছে:

'ওঁ সিন্ধোরুচ্ছাসে পতয়ন্তমুক্ষণম্।
হিরণ্যপাবাঃ পশুমপ্সুপুত্রগৃভ্নতে'

এই বেদমন্ত্রের [সাম ১/৫/৬৪, অথর্ব ১৮/৩/১৮] টীকায় ঋক ও যজুর্বেদিগণের অধিবাসে সিঁদুর দানের মন্ত্রে বলেছেন:

'ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো। বাতপ্রমিয়ঃ
পতয়ন্তি যহ্বাঃ
ঘৃতস্যধারা অরুষো ন বাজী।
কাষ্ঠাভিন্দনূর্ম্মিভিঃ পিন্বমানঃ ॥
ঋগ্‌বেদ ৪/৫৮/৭

ঋষি বামদেব, দেবতা-অগ্নি, সূর্য, আপঃ, গাবঃ অথবা ঘৃত।

'সিন্ধো'র উল্লেখকে সিঁন্দুর করা হয়েছে। মন্ত্রের অনুবাদ পড়লে বোঝা যায় এই মন্ত্রের সঙ্গে সিঁদুর দানের কোনও সম্পর্ক নেই। মন্ত্রটিতে ঋত্বিক জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতধারা ঢেলে হোম করেছেন। মন্ত্রের অর্থ হল— 'বেগবতী নদী যেমন উচ্চভূমি থেকে নিম্নভূমিতে নেমে আসার সময় প্রবল তরঙ্গভঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার বেগ যেমন বায়ুর বেগকে অতিক্রম করে অথবা লোহিতবর্ণ বেগবান অশ্ব যেমন ছোটার সময় নিজের বেগে কাঠের বেড়া ভেদ করে ছোটে, তেমনই মহাবেগে ঘৃতধারা জ্বলন্ত অগ্নির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে'। 'সিন্ধোরিব' অর্থাৎ নদীর মতো।

স্ত্রী-আচার বিয়ের সময় বর কনেকে নিয়ে সধবা নারীদের লোকাচার অনুষ্ঠান।

স্ত্রীধন বিবাহে কনের বাড়ি থেকে তার আত্মীয়স্বজন ভালবেসে যে উপহার প্রদান করেন। এগুলি বধূর একান্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি, এর উপর শ্বশুরবাড়ির কোনও অধিকার থাকে না। বধূ ইচ্ছেমত স্ত্রীধন ব্যবহার করতে পারে।

সূর্যপ্রণাম বিয়ের পরদিন ভোরবেলায় বর স্ত্রীকে নিয়ে সূর্য দর্শন করালে, বধূ সূর্যকে যে প্রণাম নিবেদন করে।

সেজতুলুনি বিয়ের পরদিন সকালে বাসর তোলার জন্য কনেপক্ষের মেয়েদের অর্থ আদায়ের লৌকিক অনুষ্ঠান।

সোহাগ কলস বিয়ের আগের রাতে জল ভরে আনা কলস।

সোহাগ জল বর বা কনেকে স্নান করাবার জন্য এয়োরা বাজনা-সহ নদী বা পুকুরে জল ভরতে যায়। এই জলকে অনেক জায়গায় সোহাগজল বলে। সোহাগ সৌভাগ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সোনা-রূপা প্রভৃতি ধাতুর অংশ জুড়তে সোহাগা নামে যে ক্ষার ব্যবহার করা হয়, বিবাহে বর-কনের মিলনে সাহায্যকারী জল বলে এই নামকরণ বলে অনেকে মনে করেন। কেউ কেউ 'সোহাগ' শব্দে আদর বা ভালবাসা বুঝিয়েছেন। এই জলে স্নান করালে বর-কনের সোহাগ বৃদ্ধি পাবে বলে এই নাম।

সোহাগ প্রদীপ বিয়ের বরণডালায় রাখা প্রদীপ।

সোহাগ ফোঁটা বিয়ে করতে যাওয়ার সময় বরের কপালে সোহাগার খই দিয়ে ফোঁটা দেওয়া হয়। বর-কনের মিলনকে পাকা করার মানসে সোহাগার খই দিয়ে ফোঁটা দেওয়ার রীতি প্রচলিত হয়েছিল বলে মনে হয়।

সোহাগ বাতি সোহাগ-আদর, বিবাহে বশীকরণের উদ্দেশে স্ত্রী-আচারে যে বাতি বা প্রদীপ ব্যবহার করা হয়।

বর-কনেকে নিয়ে যে রাতে বাসর জাগা হয়, সেই ঘরে সারা রাত একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হয়। স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রথম সোহাগ করা উপলক্ষে এই বাতি জ্বালানো হয় বলে এই নাম।

সৌভাগ্যতিলক সৌভাগ্য ও আরোগ্য কামনা করে গোরচনা, গোমূত্র, শুকনো গোবর, দই ও চন্দন মিশ্রিত করে বর-কনের ললাটে তিলক দান।

সৌদায়িক শ্বশুরবাড়িতে ভালবেসে লোকে বরবধূকে যে উপহার দেয়, এগুলি বর-বধূ উভয়ের সম্পত্তি।

হ

হস্তগ্রহণ লাজ হোমের পর বর পশ্চিম মুখ করে পূর্বমুখী কনের ডান হাত নিজের ডান হাতের উপর গ্রহণ করে ঋগ্‌বেদীয় মন্ত্রে (১০/৮৫/৩৬) যা বলবেন তার অনুবাদগত অর্থ:

[বর বলছেন] 'হে নারী, আমাদের উভয়ের সৌভাগ্যের উদ্দেশ্যে আমি তোমার হস্তগ্রহণ করছি, তুমি আমার সঙ্গে অন্তিম বয়স পর্যন্ত সর্বসৌভাগ্য ভোগ করো। আর তুমি আমার গৃহের স্বামিনী হবে। এ কারণে, ভগ, অর্যমা, সবিতা এবং পুষা দেব তোমাকে আমার হস্তে প্রদান করলেন।'

পারস্কর গৃহ্যসূত্র (৬ষ্ঠ কণ্ডিকা)-র মন্ত্রে বলা হয়—

'হে বধূ, আমি যেমন প্রাণস্বরূপ, তুমি বাণীস্বরূপ; আমি সামবেদ স্বরূপ, তুমি ঋগ্‌বেদ স্বরূপ: আমি দৌঃ (স্বর্গ) স্বরূপ, তুমি পৃথিবী স্বরূপ; এসো, আমরা উভয়ে মিলে বিবাহ করি, উভয়ের রেতঃ ধারণ করি, উভয়ে মিলে সন্তান উৎপাদন করি, বহু সংখ্যক পুত্র প্রাপ্ত হই এবং তারা দীর্ঘায়ু হোক। আমরা উভয়ের প্রীতিকর, রুচিকর এবং মনোহভিমত হয়ে শত শরৎ ঋতু যেন দেখতে পাই: শত শরৎ ঋতু ধরে যেন বেঁচে থাকি ও শত শরৎ ঋতুর বর্ণনা যেন শুনতে পাই।'

হস্তলেপ 'দশকর্ম্মপদ্ধতি'-তে লেখা রয়েছে—

'ততো দাতা বধূবরয়োর্হস্তলেপং
দধ্না দত্ত্বা বরহস্তোপরি বধূহস্তং স্থাপয়িত্বা
গায়ত্র্যা কুশগ্রন্থিং বধ্নীয়াৎ অত্রাচারাদন্যদপি
যৌতকত্বেন সুবর্ণরজততাম্রাদিকং কন্যাপিতা
যথাসম্ভবং দদাতি অন্যেহপি বান্ধবাদয়ো
যথাসম্ভবং যৌতকং প্রযচ্ছন্তি, ততো গায়ত্র্যা
লগ্নগ্রন্থিং বদ্ধা পুনর্গায়ত্র্যা কুশগ্রন্থিং মোচয়েৎ।'

তার পর, দাতা দধি দিয়ে বধূ-বরের হস্তলেপ [হাতের উপর মাখিয়ে] দিয়ে বরের হাতের উপর কন্যার হাত রেখে 'কুশ' দিয়ে গায়ত্রী মন্ত্র পড়তে পড়তে গ্রন্থি বাঁধা শুরু করেন। এই সময় আচারবশত কন্যাদাতা যথাশক্তি সোনা, রুপো এবং তামা প্রভৃতি যৌতুক দেন এবং অন্যান্য বন্ধুবান্ধবেরাও যথাসম্ভব যৌতুক প্রদান করেন। গায়ত্রী মন্ত্রের মধ্যেই লগ্নগ্রন্থি বেধে দেন।

হস্তাদক দান বাগদান অনুষ্ঠানের পর কন্যার পিতা ওই বাগদানকে অনুমোদন করে যে প্রতিজ্ঞা-বাক্যটি উচ্চারণ করেন তা হল:

'সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং দুহিতা গোত্রগামিনী।
হস্তোদকমিদং গৃহ্ন দাতব্যা হি বিধানতঃ।।
দশকর্ম্ম কৌমুদী

আমি তিনসত্য করে প্রতিজ্ঞা করছি যে [আমার কন্যাকে যথাবিধি দান করব] আমার কন্যা গোত্রান্তরিতা হয়ে তোমার গোত্র প্রাপ্ত হবে এই প্রতিজ্ঞার চিহ্নস্বরূপ এই হস্তোদক গ্রহণ করো।

এই প্রতিজ্ঞা বাক্য উচ্চারণের পর শালগ্রাম শিলা ও মঙ্গলঘটের সামনে তামার পাত্রে তিল, যব, ফুল, কুশ, হরীতকীর সঙ্গে এক গণ্ডুষ জল ভাবী বরের হাতে ঢেলে কন্যাদানের প্রতিজ্ঞা করেন। বিয়ের বেশ কিছু আগে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হত, কিন্তু বর্তমানে বিয়ের দিন বিয়ের আসরে বসার ঠিক আগে নিয়মরক্ষা প্রথায় এটি সারা হয়।

হরিদ্রা হলুদ। বিয়ের আচারে হরিদ্রার ব্যবহার ব্যাপক ভাবে বাংলাদেশে প্রচলিত। 'গায়ে হলুদ' আলাদা একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। বিয়ের দশ দিন গায়ে হলুদ দিয়ে বর কনে দুজনকেই স্নান করানোর প্রথা রয়েছে।

হরিদ্রামঙ্গল বিয়েতে হলুদ দিয়ে বর-কনের অঙ্গসংস্কার।

হলুদ কোটা বিবাহে বর ও কনেকে গায়ে হলুদ দিয়ে স্নান করাবার জন্য গোটা হলুদ গুঁড়ো করার স্ত্রী আচার। হলুদের মধ্যে পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা ও পরিচ্ছন্নতা কল্পনা করা হয়। হলুদের ভেষজগুণকে কান্তিবর্ধক বা রূষা প্রদারক রূপে দেখা হয়। সে কারণে বিয়ের হলুদকে 'রূষা হলুদ' বলা হয়।

হাতবাঁধা বিয়েতে বর ও কনের হাত যে মালায় বন্ধন করা হয়।

হৃদয়ের মন্ত্র বর ও কনের আলাদা দুটি হৃদয়কে বিবাহমন্ত্রে এক করে দেওয়ার শপথবাক্য পাঠ করানো হয়, এর নামই হৃদয়ের মন্ত্র বা বিবাহের মন্ত্র। এই শপথ বাক্যে বলা হয়:

'ওঁ যদেতৎ [যদেদৎ] হৃদয়ং তব
তদস্তু [তদস্তু] হৃদয়ং মম।'

হৃদয়ের শপথ বিবাহ মন্ত্রে বর ও কনের আলাদা হৃদয়কে এক করার শপথ মন্ত্রে উচ্চরিত হয়:

'ওঁ যদেদৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।

তোমার যে হৃদয়, তা আমার হোক। আমার এই যে হৃদয়, তা তোমার হোক। আমাদের উভয়ের হৃদয় এক হোক।

হৃদয়ালভন বর বধূর ডান কাঁধের উপর দিয়ে ডান হাত নিয়ে তার হৃদয় নিম্নে স্পর্শ করে যে মন্ত্রটি পাঠ করে তার অর্থ, 'হে বধূ, আমার শাস্ত্রবিহিত নিয়মাদিতে তোমার হৃদয় স্থাপিত করেছি, তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুগামী হোক। তুমি এক মনে আমার কথা পালন করবে। প্রজাপতি তোমাকে আমার প্রতি নিয়োজিত করুন।

রবীন্দ্রনাথের লেখা বিয়ের গান-কবিতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম বিয়ের কবিতা বা পদ্য নয়, লিখেছিলেন দুটি গান, সে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে বা ১২৮৮ বঙ্গাব্দে। এ হল, রাজনারায়ণ বসুর মেয়ে লীলাবতীর বিয়ে উপলক্ষে লেখা। রবীন্দ্রনাথের নিজের বিয়ের সময়েও বিয়ের পদ্যর অস্তিত্ব ছিল, তাঁর বিয়েতেও কবিতা লেখা হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম যে গান দুটি রচনা করেছিলেন তার প্রথম লাইন 'দুটি হৃদয়ের নদী একত্র মিলিল যদি' আর 'মহাগুরু দুটি ছাত্র এসেছে তোমার'। দ্বিতীয় গানটিকে পরিবর্তন করে কবি 'আজি এ সন্তান দুটি মিলেছে তোমার' করেছিলেন। গান দুটি লিখে রবীন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসুর জ্যেষ্ঠপুত্র যোগীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে লেখেন—'দুটি বিবাহের গান রচনা করিয়া পাঠাই, পছন্দ হইলে গ্রহণ করিবেন।'

রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম এই বিবাহসঙ্গীতের সঙ্গে অন্য আর একটি ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে। লীলাবতীর বিয়েতে এই গান দুটি গাইতে হবে বলে কবি নিজেই গায়কদের তালিম দেন, গায়কদের মধ্যে ছিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বামীজির প্রিয় গানের মধ্যে 'দুটি হৃদয়ের নদী' গানটি ছিল, তাই এই গানটি পরে 'সঙ্গীত কল্পতরু'-তে ছাপা হয়।

প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ বিবাহসঙ্গীতই বেশি রচনা করেছেন যেমন:

* বিহারীলাল গুপ্তের কন্যা স্নেহলতার বিয়েতে [১৮৮৯ খ্রি.] কবি লেখেন—'সুখে থাকো আর সুখী করো সবে।'

* দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা নলিনীর বিয়েতে [১৮৯৬ খ্রি.] 'উজ্জ্বল করো হে আজি।'

* সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিয়ের কিছু দিন আগে লিখেছেন দুটি বিয়ের গান—'যে তরণীখানি ভাসালে দুজন' ও 'দুজনে যেথায় মিলিছ সেথায়'।

যে কবিতাটি বিয়ের পদ্যের প্রথম পাতায় ছেপে তার পর নিজেদের কবিতা ছাপতেন, কবিগুরুর সেই জনপ্রিয় কবিতাটি হল:

'দুইটি হৃদয়ে একটি আসন
পাতিয়া বোসো হে হৃদয়নাথ।
কল্যাণ করে মঙ্গলডোরে
বাঁধিয়া রাখো হে দোঁহার হাত।।'

* ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিয়েতে কবি যে কবিতাটি লিখেছেন, সেটি বহু-পঠিত 'চিত্রা'র 'উৎসব' কবিতা। বলেন্দ্রর বিয়েতে কবি উপহার দিয়েছিলেন 'নদী' কবিতাটি। ১৩০২ সনের ২২ মাঘ এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় থেকে বিবাহে কবিতা-সহ গ্রন্থ উপহার দেওয়ার প্রচলন হয়।

গান-কবিতার পর কবি লিখলেন আশীর্বাণী। সুরেন্দ্রনাথের কন্যা জয়শ্রীর বিয়েতে কবি লিখেছেন:

'তোমাদের বিয়ে হল ফাগুনের চৌঠা,
অক্ষয় হয়ে থাক সিঁদুরের কৌটা
সাত চড়ে তবু যেন কথা মুখে না ফোটে
নাসিকার ডগা ছেড়ে ঘোমটাও না ওঠে,
শাশুড়ী না বলে যেন কি বেহায়া বৌটা।'...

* লীলাদেবীর বিয়েতে লেখা হয়েছিল:

'আত্মভোলা দুইটি প্রাণে
মিলিবে একাকার
সেই মিলনে বিকাশ হবে
নূতন সংসার।'...

* দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের কন্যা ইন্দিরার বিয়েতে কবিগুরু লিখলেন:

'সেদিন ঊষার নববীণা ঝংকারে
মেঘে মেঘে ঝরে সোনার সুরের কণা।
ধেয়ে চলেছিল কৈশোর পরপারে
পাখি দুটি উন্মনা।
দখিন বাতাসে উধাও ওড়ার বেগে
অজানার মায়া রক্তে উঠিল জেগে
স্বপ্নের ছায়া ঢাকা
সুরভবনের মিলনমন্ত্র লেগে
কবে দুজনের পাখায় ঠেকিল পাখা।'...

* কবি অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল ডেনমার্কের কন্যা হিয়রডিস সিগর-এর। কবিগুরু তাঁর নাম দেন হৈমন্তী। তাঁদের বিয়েতে লিখলেন—

'উত্তরে দুয়াররুদ্ধ হিমানীর কারাদুর্গ তলে
প্রাণের উৎসবলক্ষ্মী বন্দী ছিল তন্দ্রার শৃংখলে।'...

এ ছাড়া কবির কলম থেকে পাওয়া গেল—

'বিস্ময়ে ভরিল মন এ কী এ প্রেমের ইন্দ্রজাল,
কোথা করে অন্তর্ধান মুহূর্তে দুস্তর অন্তরাল—
দক্ষিণ পবন সখা উৎকণ্ঠিত বসন্ত কেমনে
হৈমন্তীর কণ্ঠ হতে বরমাল্য নিল শুভক্ষণে।'

* লালগোলার রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়ের বিয়েতে কবি একটি দূরবিন উপহার দেন, সঙ্গে দিয়েছিলেন এই কবিতাটি:

'তোমাদের যে মিলন হবে বিশ্বের হল জানাজানি,
তারাগুলি করচে কেবল হাসাহাসি কানাকানি।
রাত্রি যখন গভীর হবে, বাসরঘরের বাতায়নে
মারবে ওরা উঁকি-ঝুঁকি এইটে ওদের আছে মনে।
তোমরা যদি শোধ নিতে চাও, এনেছি এই
যন্ত্রখানি,
ওরা কেন লুকিয়ে রবে অন্ধকারের পর্দা টানি?
তোমরা কোণে দাঁড়িয়ে দেখ আলোকসভায় মিলন
রাতি'
দ্যুলোকেতে ভূলোকেতে হোক না আড়ি
পাতাপাতি!'

* কুচবিহারের রাজকন্যা ইলাদেবীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল ত্রিপুরার রাজকুমার রমেন্দ্রকিশোর দেববর্মার। কবি তাঁদের বিয়েতে নিজের কাব্যগ্রন্থে একটি আশীর্বাণী লিখে উপহার দেন:

'তোমরা যুগল প্রেমে রচিতেছ যে আশ্রয়খানি
আমি কবি তার পরে দিনু মোর আশীর্বাদ আনি।
মিলন সুন্দর হোক, সংসারের বাধা হোক দূর,
জীবনযাত্রার পথ হোক শুভ, হোক অবন্ধুর।।'

সেকালে বিয়ের পদ্যে রবীন্দ্রনাথের একখানি আশীর্বাণী ছাপতে চাইত সকলে, কবি কাউকে বিমুখ করতেন না। বৃদ্ধ বয়সে কবির মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, মন আর ফরমায়েশি কবিতা লিখতে সায় দিত না, সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা পুষ্পমালার বিয়ে হয় অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে, তাঁদের বিয়েতে আশীর্বাণী পাঠাবার সময় কবি লিখলেন, 'চারু, আর তো পারা যায় না। ক্রমাগত ফরমাশ আসবে নানা দিক থেকে। বিষয়টা এক, কলমটাও এক, অথচ বাণীকে করতে হয় বিচিত্র। তোমাদের অনুরোধ এড়াবার জো নেই— অতএব',

'যুগলযাত্রী করিছ যাত্রা,
নূতন তরণীখানি।
নবজীবনের অভয় বার্তা
বাতাস দিতেছে আনি।
দোঁহার পাথেয় দোঁহার সঙ্গ
অফুরান হয়ে রবে।
সুখের দুখের যত তরঙ্গ
খেলার মতন হবে।'

মন না মানলেও কবিকে লিখতে হয়েছে অসংখ্য কবিতা। বিয়ের গান-কবিতা-আশীর্বাণী সব মিলিয়ে সংখ্যা কত তা আলাদা করে গবেষকগণ দেখেননি, তবে রবীন্দ্রনাথের লেখা বিয়ের কবিতাই পাওয়া যাচ্ছে চব্বিশ-পঁচিশটির মতো। বহু কবিতা ছাপা হয়েছে, অনেক লেখা ছাপা হয়নি, আজও পারিবারিক অ্যালবামে সযত্ন রাখা আছে। এ বিষয়ে আলাদা করে গবেষণা হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

ব্রাহ্মসঙ্গীতে বাগ্‌দান 'ব্রাহ্মসঙ্গীত' গ্রন্থের নবম অধ্যায়-এ 'বিবাহ' প্রসঙ্গে [সঙ্গীত সংখ্যা ১৫০৩] 'বিবাহের বাগ্‌দান' শিরোনামে এই গানটি ছাপা রয়েছে:

'শুভ-পরিণয়ে তুমি মিলাবে দু জনে এই ত সূচনা তার হ'ল শুভক্ষণে! অন্তরে প্রকাশ তব, প্রাণে জাগে প্রেম নব, করুণা আসিছে নামি দুটি জীবনে। এ শুভ-মুহূর্ত্তে আজি, শুভ-বিবাহের আদর্শ জাগাও তুমি প্রাণে দু'জনের; শুভ-মিলনের ক্ষণ এলে যেন দুই জন, আনন্দে মিলিত হয়, মধুর মিলনে।' [সাহানা, ঝাঁপতাল]

ব্রাহ্মসঙ্গীতে বিবাহের উদ্বোধন 'ব্রাহ্মসঙ্গীত' গ্রন্থে 'বিবাহের উদ্বোধন' শিরোনামে ১৫০৪ সংখ্যক সঙ্গীত হতে ১৫০৮, মোট ৫টি গান ছাপা হয়েছে, সেগুলি হল:

[১]

আজি এ শুভদিনে, সব বান্ধবে,
ডাকি হে প্রাণ খুলে সে দেব-দেবে।
আশার কুসুম আজি দেখ হে ফুটিল,
প্রণয়ে প্রণয়-ধারা আসিয়া মিশিল।
লই হে আজি বরি প্রণয়ী দুজনে,
শুভ পরিণয়-পাশে বাঁধি হে যতনে;
যাচি সবে মিলি প্রসাদ তাঁহারি,
বিরচে প্রেম-লীলা করুণা যাঁহারি।
[ঝিঁঝিট, ঠুংরি]

[২]

এস নাথ, সভার মাঝে, সবার হৃদয় ভরে আজ
তোমার আলো উঠুক জ্বলে নিভিয়ে আঁধার, রাজার রাজ!
তোমার বীণা নবীন সুরে, বাজুক দোঁহার হৃদয়-পুরে,
মধুর রসে ভরুক চিত্ত, পরাও প্রেমের মোহন সাজ!
[ইমন-বেহাগ, ঝাঁপতাল]

[৩]

আজ মনে আনন্দ অপার।
আনন্দে আনন্দময়ে ডাক একবার।
আজি ভাই ভগ্নী মিলি, ডাকি সবে প্রাণ খুলি,
মনের হরষে পূজি চরণ তাঁহার।
পবিত্র প্রীতি-বন্ধনে, বাঁধিয়ে আজ দুজনে,
কর হে করুণানিধি করুণা বিস্তার।
[বারোঁয়া, ঠুংরি]

[৪]

প্রেমের মন্দিরে তাঁর আরতি বাজে,
মিলন মধুর রাগে জীবন মাঝে।
নীরব গানে গানে, পুলক প্রাণে প্রাণে,
চলেছে তাঁরি পানে, অরূপ সাজে।
প্রেম-তৃষিত সুন্দর অরুণ-আলো
হৃদয় নিভৃত দীপে জ্বালোরে জ্বালো।

পুণ্য-মধুর-ভাতি পূর্ণ মধুর রাতি,
মধুর স্বপনে মাতি মধুর রাজে।

[৫]

নিখিলের আনন্দ-গান এই প্রেমেরই যুগল বন্দনায়,
জীবনের আকুল স্রোতে অকূল প্রেমের কূল নাহি পায়।
যে বিপুল প্রেমের বাণী নিখিল প্রাণের পুলক মাঝে,
এ প্রাণের যুগল ধারায় সেই প্রেমেরই পরশ বাজে।
সে প্রেমের ঝরণা ঝরে এই প্রেমেরই রসের ধারায়,
নিখিলের আনন্দ-গান এই প্রেমেরই যুগল বন্দনায়।
আকাশের দিকে দিকে প্রেমের আলোর প্রদীপ জ্বলে,
সে প্রেমের উৎস জাগে এই জীবনের স্বপন-তলে।
সে প্রেমের ছন্দ উঠে প্রাণে প্রাণে আঘাত লেগে,
সে প্রেমের তরঙ্গেতে যায় ভেসে যায় ব্যাকুল বেগে।
না জানি কোন্ প্রেমিকের প্রেম জাগেরে এমন লীলায়!
নিখিলের আনন্দ-গান এই প্রেমেরই যুগল বন্দনায়।'

ব্রাহ্ম সঙ্গীতে বিবাহের আরাধনা ব্রাহ্মসঙ্গীত গ্রন্থে 'বিবাহের আরাধনা' শিরোনামে ১৫০৯ সংখ্যা থেকে ১৫১১ মোট তিনটি গান ছাপা হয়েছে, তার মধ্যে একটি:

[১]

ও হে জগত-কারণ, এ কি নিয়ম তব!
এ কি মহোৎসব! এ কি মিলন নব!
গ্রহ ডাকিয়া গ্রহে মিলন মাগে,
    অণু অণুরে ডাকে চির অনুরাগে,
হৃদয় হৃদয়ে ডাকে প্রেম-সোহাগে,
    অখিল নিখিল-ভরা এ কি আহ্বান রব।
যে নিয়মে জীবগণ সুখদুখ-অন্ধ,
    প্রেম-পারিজাতে প্রভু এ কি মকরন্দ!
দুইটি অন্তর তাই দুরান্তর হতে,
    করিছে শপথ আজ মিলি এক সাথে,
প্রেম হইবে রথী জীবনের রথে,
    তুচ্ছ দৈন্য, অতি তুচ্ছ বিভব।
[বেহাগ খাম্বাজ, যৎ]

তোমরা কে হে
লভিছ অমর সুখ এই মরদেহে
নয়নে নয়নে হয়
কিবা প্রাণ বিনিময়
কি মধুর লীলা-ছলা সাধের সন্দেহে

কবি অক্ষয়কুমার বড়াল

[সুরেশচন্দ্র সমাজপতির বিয়েতে লেখা]

এস মুকুটমণি, দেশমুখ্য
রাজার দুহিতা
এস সাধ্বী। স্বয়ম্বরা এস বঙ্গে
রাজশ্রী ইন্দিরা।
এস লাবণ্যের লতা, মনস্বিনী
গৌরবে গম্ভীরা
এসে গো জয়শ্রী, এস ভূপ-জিতেন্দ্রের
প্রেমজিতা।
কেশবের আশীর্বাদ উদ্ভাসিতে
অয়ি শুচিস্মিতা
ভবিষ্যৎ যাত্রাপথ, ব্রহ্মপুত্রে তাই পুণ্যনীরা
মিলিল নর্মদাধারা, ধ্যানে ধরি
দেখিল ধ্যানীরা
দেবতার এ ইঙ্গিত বঙ্গে
মারাঠায় কুটুম্বিতা।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

[কুচবিহার রাজের সঙ্গে মহারাষ্ট্রের রাজদুহিতার বিয়েতে লেখা]

বাদল ঘেরা আকাশখান্
মাদল বাঁশী ঝুমুর গান—
ধাওড়া থেকে আস্‌ছে কানেরে—
হোহো— আস্‌ছে কানেরে

বসেছিলাম নিঝুম ঠায়,
কুঞ্জে ঘেরা বারান্দায়
মন মশ্‌গুল ঝুমুর গানেরে
হো হো— ঝুমুর গানেরে।
হঠাৎ পেলাম চিঠির খাম
উপরে তার আমার নাম
খুলেই দেখি— হুর্‌রে-বাহবা
হোহো হুর্‌রে— বাহবা।
বন্ধু কবি রমেশ দাস
পরছে গলায় বিয়ের ফাঁস,
এই বোশেখেই— আল্লা হো তোবা

কবি সুনির্মল বসু

বিয়ের পদ্য লিখতে সহজ
বিয়েটা কিন্তু গদ্য
প্রজাপতির কি নির্বন্ধ
হতেই হয় বদ্ধ।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সাদর সম্ভাষণমেতৎ

প্রিয় চারুবাবু, এই মাত্র তোমার পত্রে কল্যাণীয়া পুষ্পমালার শুভবিবাহের খবর পেয়ে আনন্দিত হলেম। আমার অন্তরের শুভকামনা এই যে বর-বধূ দুই জনে সারা জীবন সুখের কুঞ্জে জোড় পাখির মতো মধুর জীবনযাপন করুক, সংসারের কোনও দুঃখ যেন তাদের আনন্দের ছন্দ ভঙ্গ না করে। যে দিন ছবিতে লিখতুম সেদিন এবং সেই সামর্থ্যও আমার চলে গেছে, কাজেই যথার্থ নিঃসম্বলের মতো শূন্য হাত; কিন্তু বহু আশাপূর্ণ আশীর্বাদ করলেম তোমার কন্যা এবং জামাতাকে।

কিমধিকমিতি।

তোমারি
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা পুষ্পমালার বিয়েতে লেখা চিঠি]

কল্যাণীয়া শ্রীমতী লীলা,

সুচরিতাসু,

সংসারে আজ যিনি তোমার পিতার স্থান নিলেন, তিনি আমার কিশোরদিনের সুহৃদ। সেই সম্বন্ধে তোমাদের প্রতি আমার আশীর্বাদের ভাষাটি যদিচ ছোট, কিন্তু সে একেবারে অন্তরের।

বয়স অনেক হলো, তাই ছেলেবেলার বন্ধু যাঁরা ছিলেন, তাঁদের অনেকেই আজ লোকান্তরিত। এখনও যে কয়জন অবশিষ্ট আছেন তোমার পূজনীয় শ্বশুর মহাশয় তাঁদের একজন।

একদিন বাগ্‌দেবীর মন্দির লক্ষ্য করে আমরা তীর্থযাত্রা করেছিলাম। পথ ফুরলো না, কিন্তু পথ চলার শক্তি এলো ফুরিয়ে, আয়ুর শেষটাও দু চোখে যেন স্পষ্ট দেখতে পাই। হয়তো তুমি ভাববে এ কথা আজকের দিনে কেন। কেন, তোমার শ্বশুরমশায়কে জিজ্ঞাসা কোরো, আমার হয়ে তিনিই এ প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

একটা কথা বলি। সংসার-যাত্রা-পথে সুখ আছে, দুঃখ আছে, আনন্দ আছে, নিরানন্দও আছে, কত আশা-আকঙ্ক্ষা মাঝখানে চূর্ণ চূর্ণ হয়ে পথের ধুলোয় ছড়িয়ে পড়ে। তবু, এত গিয়েও যা বাকি থাকে তা সকল দুঃখের বড়। তাই ত এই ধুলো-মাটি পাপ-পুণ্য আধি-ব্যাধির সংসারই আপন মাধুর্যে মানুষকে মুগ্ধ করে রাখে। আমার আশীর্বাদ রইল মা, তোমাদের সুদীর্ঘ জীবনে, আমার এই পুরনো কথাটাকেই যেন প্রতিদিন সত্য বলে উপলব্ধি করতে পারো।

ইতি—

১২ই চৈত্র ১৩৪২

তোমাদের একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র কনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিয়েতে লেখা চিঠি]

[কথাসাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র প্রেমোৎপলের বিয়েতে প্রথম এবং অপর পুত্র কনকের বিয়েতে দ্বিতীয় কবিতা লেখা]

(১)

বিবাহ মঙ্গল

'জীবন-দুয়ারে তব দাঁড়ায়েছে নারী—
আজ বধূ, কাল জায়া, পরে পথশেষে

হাতে হাত রাখি পুনঃ অমৃত-উদ্দেশে
বাহিরিবে একসাথে; সীমান্তে তাহারি
সিন্দূর দানিবে যবে যত্নে অপসারি'
মুখাবগুণ্ঠন,— কুমারীর কালো কেশে
অকস্মাৎ সেই দীপ্তি হেরি' মোহাবেশে
চেয়ে রবে আঁখি তব বিস্ময়ে বিস্ফারি'।
সহজ সুলভ সে যে— সেক্ষণ-বিস্ময়!
তব ভাগ্যে, জীবনের নিত্য-নিশিমুখে
এমনি সীমন্ত রচি, যাদুমন্ত্রময়,
যেন তব চক্ষে ধরে যৌবন অক্ষয়
আজিকার নববধূ,— আত্মহারা সুখে
অমর দম্পতী প্রেম জরা করে জয়।'

(২)

কনক-লীলা

আকাশের কোণে একি হেরি আজ আলিপনা
রঙ্গিলা—
পূর্বাচলের ধূসর-শিখরে উষার কনকলীলা।
দিবসের দাহ উতরিয়া যেন স্নিগ্ধ সন্ধ্যাকাশে
কনক এমনি লীলায়িত হয়ে জ্যোৎস্নার মত হাসে।

মোহিতলাল মজুমদার

নিমন্ত্রণ বাড়ির ছাঁদা

সেকালের অন্দরমহলে তো পুরুষদেরই দিনের বেলায় প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, সুতরাং একালে বসে সেকালের অন্দরমহলে ঢোকা বেশ কঠিন ব্যাপার হবে। সেকালের মানুষের হাত ধরে অবশ্য একটা চেষ্টা করা যেতে পারে। সেকালে মেয়েরা নাকি অন্দরমহলে গৃহবন্দি হয়ে ছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসগারের স্নেহভাজন যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৭-১৯৬০) জানিয়েছেন— "আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি, অন্তঃপুরমধ্যেও বধূদিগকে প্রায় সর্ব্বক্ষণ অবগুণ্ঠনবতী হইয়া থাকিতে হইত। পরিবারভুক্ত বয়োবৃদ্ধ স্ত্রীলোক ব্যতীত বাহিরের যে-কোনও প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধাকে দেখিলে যুবতী ও বালিকা বধূদিগকে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিতে হইত। পরিবারভুক্ত বয়োবৃদ্ধ আত্মীয়গণের সহিত কথা কহা তো দূরের কথা, তাঁহারা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেই বধূদিগকে ঘোমটা দিতে হইত। দিবাভাগে স্বামীর সহিত কথা কহা অত্যন্ত নির্ল্লজ্জতা বলিয়া বিবেচিত হইত।"[১]

ছাড় ছিল গঙ্গাস্নান আর তীর্থস্থানে। যোগেনবাবুর কথায়— "পূর্ব্বে কলিকাতার সাধারণ হিন্দু ভদ্র গৃহস্থের বাটীতেও অবরোধ সম্বন্ধে কঠোরতা ছিল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, গঙ্গাস্নানের সময় গঙ্গার ঘাটে বা কালীঘাট প্রভৃতি তীর্থে অবরোধ-প্রথার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। গঙ্গার ঘাটে শত শত পুরুষের দৃষ্টির মধ্যে অবগাহন এবং অতি সূক্ষ্ম সিক্তবস্ত্রসহ জল হইতে উঠিয়া ঘাটের উপর বস্ত্র পরিবর্তন করিতে কোনও মহিলা কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। ঘোড়ার গাড়ীর দ্বার বন্ধ করিয়া যে-সকল ভদ্র মহিলা কালীঘাটে দেবীদর্শন করিতে যাইতেন, তাঁহারা গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া মন্দিরের সঙ্কীর্ণ পথে, পুরুষের ভীড়ের মধ্য দিয়া গমন করিতে এবং বাজারে দোকানদারগণের সহিত দরদস্তুর করিয়া খেলনা ও অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না।"

অবরোধ সম্বন্ধে যুগপৎ অমন রক্ষণশীল ও উদার ব্যবস্থা দেখে কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাঙ্গালীর মেয়ে' নামক ব্যঙ্গ কবিতায় লিখেছিলেন:

'কুটুম বাড়ী যেতে হলেই গাড়ী মুদে যাওয়া
দেশ শুদ্ধ লোকের মাঝে গঙ্গার ঘাটে নাওয়া।'[২]

হিন্দুর ঘরে কেন এই অবরোধ প্রথা— এ প্রসঙ্গে রসরাজ অমৃতলাল বসু একটা কৈফিয়ত দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন—

"হিন্দুর ত অবরোধ প্রথা নেই, চোর ডাকাতের ভয়ে যেমন সোনা-জহরত সিন্দুকে বন্ধ করে রাখতে হয়, শিলাবিগ্রাহাদি দেব-মূর্ত্তিকে যেমন ইতরের স্পর্শের অন্তরালে মন্দির মধ্যে রাখতে হয়, সহরের মধ্যে তোমাদেরও তেমন-ই অন্তঃপুর মধ্যে রক্ষা করি, নইলে পল্লীগ্রামে বা তীর্থস্থানে তোমাদের কোথায় যেতে বাধা মা? কিন্তু নারি! ভালবাসাই তোমার সর্ব্বস্ব, যাকে ভালবাস, তার জন্য প্রাণ অনায়াসে দিতে পার, কিন্তু প্রতিদানও তুমি চাও সুদ সমেত। কুব্জার ন্যায় ঈর্ষা-দাসী ঐ ভালবাসার পাছু পাছু ঘুরতে থাকে আর ফিস্ ফিস্ করে। মা'র মতন ছেলেকে কে অমন ভালবাসে, কিন্তু বিয়ে দিয়ে আনার পর সেই ছেলে যদি বৌয়ের ঘরে একটু বেশী বসে, তাকে লুকিয়ে সাবানটা এসেন্সটা কিনে এনে দেয়, অমনই মা মনে করেন, ছেলে আমার পর হয়ে গেল। এ দিকে আবার স্বামী যদি বাড়ীর ভিতর ঢুকে বলেন,— 'মা, আমার খাবার হয়েছে, এখন দেবে কি?' অমনি বৌমার অভিমান,— 'আমি পরের মেয়ে দু'দিন এইছি বই ত নয়, মা-ই ওঁর সর্ব্বস্ব!'

স্নেহ-ভালবাসার তীব্র আতিশয্যে ঈর্ষার জন্ম, দেহ বুদ্ধি মানব-মনের একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। নারী-চরিত্রের এই বিচিত্রতা সত্ত্বেও কুটুম্ব-কুটুম্বিনী পরিবৃত একান্নবর্তী সংসারে সহ্যসংযমে আমাদের দিন এক রকম চলে যাচ্ছিল।"

এই 'এক রকম চলে' যাওয়া দিনের সব বিবাহ অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ বিষয়ের কথা আজ আমরা শুনব। সেকালে বিয়ের অনুষ্ঠানে মেয়েদের নিমন্ত্রণ মেয়েরাই করতেন। উনিশ শতকের গোড়াতে 'মেয়েদের নিমন্ত্রণ করতে ছোট মেয়েরা যেত। তারপর কাজের দিন বাড়ী বাড়ী পালকী গিয়ে তাদের নিয়ে আসতো, দিয়ে আসতো।'[৪] পরে অবশ্য 'বাড়ীর গিন্নি, বড় বড় বৌ ঝি, এরাই নিমন্ত্রণ করতে বেরোয়। তারপর নেমন্তন্নেরা আপনার গাড়ী পালকি করে আনে, যজ্ঞি বাড়ী থেকে যাবার আসবার ভাড়া দিয়ে দেয়।' এতে 'এক হিসেবে সুবিধা বটে, যে যার সুবিধা মত সময়ে আসে আর চলে যায়— পালকি ধরে টানাটানি করতে হয় না। কিন্তু এ দিকে তেমনি কর্ম্মকর্ত্তার গাড়ী পালকি নগদ টাকা দিতে হয়। ভাড়া দিতে দিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়।'[৫]

মেয়েরা যে নিমন্ত্রণ করতে যেতেন, তার একটা সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন শরৎকুমারী চৌধুরানী—

"মা-ঠাকরুণরা কোথায় গো, নিমন্ত্রণ করতে এসেছি', শুনিয়া সকলেই আগ্রহভরে উঠানের দিকে চাহিলাম। দাসীদের কলরব থামিয়া গেল। দেখিলাম— একটি দাসীর কোলে অলঙ্কারে ও জরির পোষাকে সজ্জিত একটি দুই তিন বৎসরের বালক। একটি বালিকার বয়স অনুমান তের চৌদ্দ, সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার ঝলমল করিতেছে। একটি অবগুণ্ঠনবতী বধূ ঝম্ ঝম্ করিতে করিতে দাসীর পশ্চাতে আসিতেছে।

একজন দাসী— কোথা থেকে আস্‌ছ গা?—

দাসী— ওগো, ভবানীপুরের দাসেদের বাড়ী থেকে আসছি, বড় বাবুর মেজ মেয়ের বিয়ে।

দিদি— ওহো! আমার মেজ দেওরপোর মেয়ের বে। এস এস, এই ঘরে এস।

একজন কয়েকখানি আসন আনিয়া তাহাদের বসিতে দিল।...

দাসী— এই ২৯শে বিয়ে, ২৭শে গায়ে হলুদ। মা-ঠাকরুণ আপনাদের সবাইকে যেতে বলে দিয়েছেন। আপনাদের কাজ, কদিনই সেখানে গিয়ে থাকতে হবে, মা-ঠাকরুণ বিস্তর বিস্তর করে বলে দিয়েছেন। মা-ঠাকরুণের জ্বর হয়েছে, তাই তিনি আসতে পারলে না, আপনারা অতি অবিশ্যি করে যাবেন।

দিদি— হ্যাঁ, যাবে বই কি, বৌ ঝি সব যাবে।...

দাসী— ...যাই মা, এই প্রথম তোমার বাড়ী এসেচি, এখনো চার পাঁচ বাড়ী যেতে হবে। আপনারা তাহলে কাল সকালে এখান থেকে গাড়ী করে যাবেন। পেন্নাম হই, আসি।

দিদি— ওরে, জল খাবার দে, জল খাবার দে।

বালিকা— আমরা ভাত খেয়েই আসছি, আর ঘুরতে হবে, আমরা খেতে পারব না।

দিদি— তা কি হয়, তা হবে না, একটু মিষ্টিমুখ কর। দে, এইখানেই খাবার দে।

তিনটি পাত্রে মিষ্টান্ন আসিল, দাসীকেও বাহিরে দালানে দেওয়া হইল।

বধূ— (বালিকার প্রতি মৃদুস্বরে) এত কি হবে, এক পাত্র হতে আমরা একটু একটু তুলে নিয়ে খাই।

দিদি— তা হবে না, ভাল করে খাও।

বালিকা— আমরা খেতে পারব না।

দিদি— কেন লো, বড় মানুষের স্ত্রী বলে কি এত গুমর।

বালিকা ও বধূ কিছু খাইল— ছেলেও ছাড়িও না, রসগোল্লা হাতে করিয়া প্রাণপণে চাপিয়া ধরিয়া মুখে পুরিল। রস গড়াইয়া হাতে ও জরির পোষাকে পড়িল, ঝি 'হাঁ

হাঁ, পোষাক গেল' করিয়া কাড়াকাড়ি করিতে লাগিল, ছেলে কাঁদিয়া উঠিল, কাঁদিতে কাঁদিতে কাশি উঠিল, কাশিতে কাশিতে দুধ তুলিয়া পোষাক ভাসাইয়া দিল। ঝি তখন বকিতে বকিতে পোষাক খুলিয়া দিল। ছেলের মা ছেলেকে এক চড় বসাইয়া দিল। ভেলভেটের ইজের কারচোপের কাজ-করা কোট, জরির টুপি খুলিয়া যথাসাধ্য পরিষ্কার ও শিশুর কচি নধর দেহখানি অনাবৃত করিয়া সকলে প্রস্থান করিল। ঝিয়ের খাবার দালানেই পড়িয়া রহিল।[৬]

বিয়েবাড়িতে মেয়েরা এসে উপস্থিত হয়েছে, পরিচিত-অপরিচিত সকলে এক জায়গায়। তখন একটা সমস্যা ছিল, 'সব মেয়েতে মেয়েতে প্রথম আলাপে 'তুমি' বলবার জো নেই— আমার চেয়ে বয়সে যে পাঁচগুণ বড়, সেও আমাকে 'আপনি' বলে কথা কইবে— না হ'লে অসভ্য বলে নিন্দা হয়।'[৭]

'কতক্ষণ পরে একজন এসে সকলকে বলল— পাত হয়েছে, আপনারা উঠে আসুন।' এই 'উঠে আসুন' বলার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মেয়েরা খেতে যেতে পারতেন না— তাদের আর একটা কাজ ছিল— 'তার পরে সব কাপড় ছাড়তে আরম্ভ করলে। জরির কাপড়, বেনারসী কাপড় সব ছেড়ে সুতোর কাপড় প'রে খেতে যেতে হয়। আমি কাপড় ছাড়ি নি বলে আমার ভারি একটা নাম বেরিয়ে গিয়েছিল— কেউ ভেবেছিল খ্রীস্টান, কেউ ভেবেছিল ব্রহ্মজ্ঞানী, সকলেরই চোখ আমার দিকে, আমি তো ভাল বিপদেই প'ড়ে গিয়েছিলেম।'[৮]

কথাগুলি বলেছেন শরৎকুমারী চৌধুরানী। খাবার খেতে সকলে বসেছেন, তখনকার মেনু একটু শুনলে ভাল লাগবে—

'তখন ছিল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মোটা লুচি, ভাজি দু' একখানা থাকলে-ও থাকতে পারত, বাঁধাকপি বা বিলিতী কুমড়ার তরকারী। বাঁধাকপি তখন আজকালকার মত সুলভ ছিল না, আর তরকারীতে লবণ দেবার প্রথা-ই ছিল না, ভোক্তাকে পাত্রপার্শ্বস্থিত লবণ মেখে নিতে হত; ক্রমে বুটের ডাল ও একটা চাটনী-ও প্রবেশলাভ করেছিল। সঙ্গে কচুরী, সিঙ্গাড়া, নিমকী, পাঁপরভাজা, মিষ্টান্নের জন্য দু'খানি সরা, একখানিতে খাজা, গজা, মতিচুর, জিলাপী, পেরাগী, পানতুয়া প্রভৃতি; আর একখানিতে আতা, মনোরঞ্জন, ক্ষীরপুলি, বাদামতক্তি, ছাপা প্রভৃতি সন্দেশ, বরফি, পেঁড়া, গুজিয়া, গোলাপজাম প্রভৃতি ক্ষীরের জিনিষ।'[৯]

স্বামী বিবেকানন্দের ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত-ও সেকালের ভোজের মেনু শুনিয়েছেন, তিনি লিখেছেন—

'লুচি ছক্কা এই ছিল তখন প্রধান আহার, মিষ্টান্ন অনেক প্রকার হইত, যথা খাজা,

গজা, কচুরী, নিমকি, পানতুয়া, মতিচুর, কাঁচাগোল্লা। পরে নিমন্ত্রণ বাটীতে পাতেতে একখানি সরা করে এই সব মিষ্টান্ন পৃথক ভাবে দেওয়া হইত। কেহ কেহ বা মিঠাই ও সন্দেশের থালা আলাদা করিত।'[১০]

সেকালে একটা নিয়ম ছিল, নিমন্ত্রণ খেতে এসে খাওয়াদাওয়া করে আবার বাড়ির জন্য ছাঁদা বেঁধে নিয়ে যেত। ছাঁদাতে যা দেওয়া হত তারও একটা নিয়ম ছিল, যেমন—

'সেকালে যে ছাঁদা বাঁধা হইত তাহাতে সাধারণত লুচি ও সন্দেশই থাকিত। একটা ছাঁদা অর্থাৎ একজনের ভোজনোপযোগী ছাঁদাতে বারখানা হইতে কুড়িখানা পর্য্যন্ত লুচি ও আটটা হইতে ষোলটা পর্য্যন্ত সন্দেশ থাকিত। নিমন্ত্রণ কর্তা ধনবান হইলে কুড়িখানা লুচি ও ষোলটা সন্দেশ এবং দরিদ্র হইলে বারখানা লুচি ও আটটা সন্দেশ প্রত্যেক ছাঁদাতেই দেওয়া হইত।'[১১]

ছাঁদা দেখে গৃহকর্তার মন বোঝা যেত, এ কথা আমার নয়, বলেছেন যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়—

'সেকালে ভোজের কথা বলিলে ছাঁদা বাঁধার কথা বলিতে হয়। নিমন্ত্রণ কর্তা কৃপণ স্বভাব কি উদার স্বভাব, তাহা তাঁহার বাড়ীর ছাঁদা দেখিয়াই লোকে অনুমান করিতে পারিত। যতই উদর পূর্ত্তি করিয়া ভোজন করা হউক না কেন, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা ছাঁদা না বাঁধিলে নিমন্ত্রণ রক্ষাই মঞ্জুর হইত না।'[১২]

ও দিকে তো বিয়েবাড়ির ভোজ শুরু হয়ে গেছে, সঙ্গে খুরি তোলা। সে এক অভুতপূর্ব দৃশ্য, অন্দরমহলের সেই ভোজের এবং ছাঁদার খুরি তোলার ছবিটা ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত একজনের মুখ থেকেই শোনা যাক—

'যা হোক, খেতে গেলুম। দেখলুম লুচি-তোলা পদ্ধতি একটু কমেছে। দু-তিন বৎসর আগে [১৮৭৮ নাগাদ] দেখেছিলাম যে, আমাদের কায়স্থদের ঘরে, এবং ব্রাহ্মণদের ঘরেও এমন মেয়ে নেই, যে [খাবার] তোলে না— তবে কেউ বেশী, কেউ কম। দু-বৎসর আগেকার একটা [খাবার] তোলার গল্প বলি শোন। একজন বেশ বড় ঘরের গিন্নী বৌ তিন-চারটি ছেলে মেয়ে নিয়ে এসেছিল। তারা সকলেই আমার সুমুখে খেতে বসেছিল। তার পর গিন্নী সকল ছেলেদের ও নিজের সন্দেশের খুরিগুলি উঠিয়ে রাখলে— বড় বড় ছেলেরা খুরি তোলার মর্ম্ম বেশ বোঝে, তারা কিছু বললে না। সব ছোট, একটি দু-বৎসরের মেয়ে, সে কোন মতেই তার খুরিটি দেবে না— কান্না আরম্ভ করলে— খাবার জায়গায় ত ভারি হ্যাঙ্গাম বেধে গেল— তার মাও [খুরি] উঠিয়ে নেবে— মেয়েটিও দেবে না, খানিক পরে মা কোন মতে কান্না থামাতে না পেরে দিলে— দিয়েও কিন্তু মায়ের ভারি খুঁৎ খুঁৎ ক'চ্ছে। কেবল

বলছে— 'এমন দেখি নি, অত খেতে পারবে না, কেবল নষ্ট করবে।' খানিক বাদে মা সেই মেয়েটিকে বললে, 'দেখ্ দেখ্, কেমন একটা চিল উড়ছে।' যেমন সে চেয়ে দেখেছে, অমনি সে কতকগুলি খাবার তার খুরি থেকে উঠিয়ে অন্য খুরির মধ্যে রেখে দিলে, মেয়েটা একটু বুঝি সেয়ানা রকমের ছিল, সে চোখ নামিয়ে একবার খাবারের দিকে চাইলে, একবার মায়ের মুখের দিকে চাইলে, চেয়ে চেয়ে, 'আমার ছানাবড়া কই' বলে চীৎকার করে উঠল— তখন তার মা ছানাবড়াটি দিলে, আর বিরক্ত হয়ে কত কি বিড়-বিড় করে বকতে লাগল।'[১৩]

এই লেখিকাই 'একাল ও এ-কালের মেয়ে' প্রসঙ্গে এই ছাঁদা বাঁধা প্রথাকে 'কুপ্রথা' বলে মন্তব্য করেছেন। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দেও এই প্রথা রয়েছে, তবে সংখ্যায় অনেক কমে গিয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন—

"সকলেই জানেন যে, বাঙ্গালী মেয়ের 'যজ্ঞি' কি এক বিষম ব্যাপার। ৫০ জনকে নিমন্ত্রণ করিলে ২০০ শত জনের উপযোগী খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করাইতে হয়। অনেক সময়ে লুচি সন্দেশ বাঁধিবার বাহুল্যতায় এত অধিক পরিমাণে খাদ্য মজুত রাখিয়াও নিমন্ত্রণকারিণীকে অপ্রতিভ হইতে হয়। এই কুপ্রথা একালে মেয়েরা অতিশয় ঘৃণা করেন। আজকাল যে এই প্রথা একেবারে উঠিয়া গিয়াছে, তাহা নহে। তবে ধনীদের কথা দূরে থাকুক, অধিকাংশ গৃহস্থ মহিলাও সেকালের মত আহার স্থলে উপবেশন করিয়াই সরা কয়খানি এবং পাতের লুচি কয়খানি তুলিয়া পশ্চাতে রক্ষা করেন না। এই বাঁধিয়া লইয় যাওয়া যে অতিশয় কুপ্রথা এবং অসুবিধাজনক, সে বিষয়ে সন্দেহ কি?— ইহাতে পরস্পরকেই কষ্ট পাইতে হয়। আজ তোমার ছেলের ভাতে আমি এক পালকি খাদ্য দ্রব্য বোঝাই করিয়া লইয়া আসিলাম— কাল আমার মেয়ের বিয়েতে তোমাকে তাহার সুদ সমেত বুঝাইয়া দিতে হইল। তবুও প্রত্যেকেই বাঁধিয়া লইতে ছাড়েন না, এবং প্রত্যেক নিমন্ত্রণকারিণীও অসন্তুষ্ট হইতে ছাড়েন না। এই লজ্জাকর প্রথা এ-কালের মেয়ের রুচি অনুসারে বহুল পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। নিতান্ত দারিদ্রাবস্থা না হইলে আর সরা তুলিতে কোন মহিলারই হস্ত অগ্রসর হয় না।"[১৪]

নানান ভাবে ছাঁদা বাঁধার দ্রব্য সংগ্রহ করা হত, হারিয়ে গেছে সেই সব আর্ট, তবুও যেটুকুর সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে তা কিন্তু কম চমকপ্রদ নয়, এক লেখিকার দেখা ছাঁদা সংগ্রহের একটি ঘটনা—

'নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই ভোজে যাইবার সময় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। ঐ সকল অপোগণ্ড শিশু ও বালক বালিকা খাইতে যাইত না, ছাঁদা আনিতে যাইত। তাহারা অভিভাবকের নিকট একখানা আসনে

বসিয়া থাকিত, তাহাদের সম্মুখস্থ কদলীপত্রে যথানিয়মিত লুচি ও সন্দেশ দেওয়া হইত, কিন্তু সে সকল ভোজ্য দ্রব্য তাহারা স্পর্শ করিত না, তাহাদের অভিভাবক স্বয়ং ভোজন করিতে করিতে আপনার পাত হইতে একখানা লুচি বা একখানা সন্দেশ তাহাদের হাতে তুলিয়া দিতেন, তাহারা ইহাই খাইত। ভোজন শেষ হইলে বালক বালিকাদের সম্মুখস্থ খাদ্য একখানা গামছায় বা একখানা উড়ানিতে বাঁধা হইত, কখনও বা বালকদের কোঁচায় বা বালিকাদের আঁচলে বাঁধা হইত। অনেকে পানীয় জলের মৃৎপাত্র পূর্ণ করিয়া দধিও লইতেন। অনেককে নিজের পাতের ভুক্তাবশিষ্ট লুচি সন্দেশও ছাঁদার সঙ্গে বাঁধিয়া লইতে দেখিয়াছি।'[১৫]

উনিশ শতকের শেষ দিকে ছাঁদা বাঁধা নেওয়া বিষয়টি প্রচণ্ড নিন্দার বিষয় হয়ে যায়। কিন্তু আগে এমনটি ছিল না, একটা সময় ছিল যখন 'ছাঁদা নিমন্ত্রণের একটি অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত। কেহ ভোজে নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজনের পর ছাঁদা না লইলে গৃহস্বামী ক্ষুণ্ণ হইতেন এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে ছাঁদা লইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেন।' এমনই অনুরোধের একটি ঘটনার কথা লিখে জানিয়েছেন যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়—

'জমিদারবাবু' স্বয়ং দেউড়িতে বসিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের অভ্যর্থনা করিতেন এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ ভোজনের পরে যখন জমিদার বাটি হইতে বাহির হইতেন, তখন জমিদারবাবু দেখিতেন যে সকলে ছাঁদা লইয়াছেন কিনা এবং প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিতেন যে, ভোজনে তাঁহাদের পরিতৃপ্তি হইয়াছে কিনা? একবার তিনি এইরূপ একটি ভোজের সময় দেউড়িতে বসিয়া আছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন একটি সুবেশ ধনী ভদ্র যুবক ভোজনান্তে রিক্ত হস্তে বাহিরে যাইতেছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র বাবু নিকটে ডাকিয়া তাঁহার পরিচয় গ্রহণ পূর্ব্বক বলিলেন— 'তুমি আমার বাড়ীতে আসিয়া না খাইয়াই চলিয়া যাইতেছ কেন?'

যুবক সবিনয়ে বলিলেন, 'আমি না খাইয়া যাই নাই, বেশ পরিতোষ সহকারে ভোজন করিয়াছি।'

জমিদারবাবু বলিলেন, 'খাওয়া হইয়াছে তো ছাঁদা কই? তুমি কি ছাঁদা পাও নাই?'

যুবক বলিলেন, 'পেট ভরিয়া খাইয়াছি আবার ছাঁদা কেন?...'

জমিদারবাবু বলিলেন, 'ও বুঝিয়াছি... ছাঁদা হাতে করিয়া লইয়া যাইতে তোমার লজ্জা হয়, তা বেশ আমি ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি, তোমাকে লজ্জা পাইতে হইবে না।' এই বলিয়া একজন কর্মচারীকে বলিলেন, 'এই বাবুটির বাড়ীতে পাঁচজন লোক আছে, একটা হাঁড়িতে করিয়া পাঁচ জনের মত ছাঁদা এখানে লইয়া এস।' আদেশমাত্র

সকলকে দর্শন দিতেন, এটাই নাকি সেকালের রীতি ছিল। সেই শেষ দর্শনের ছবিটা একবার দেখে নেওয়া যাক—

'দেখতে দেখতে খাওয়া শেষ হয়ে এল— যখন একেবারে শেষ হয়ে গেছে, তখন খোদ বাড়ীর গিন্নী সকলকার মুখের কাছে এসে এসে 'আর কিছু চাই' জিজ্ঞাসা করিলেন— সকলেই বললে যে, 'না'। যার বাড়ী নিমন্ত্রণে গেছি— এই তাঁকে ভাল করে দেখতে পেলুম, এই তাঁর গলার স্বর শুনতে পেলুম। নিমন্ত্রিতদের ঐ বাঁধা আদর আছে— পালকি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া, খাবার সময় ডেকে নিয়ে যাওয়া— আর খাবার শেষে গিন্নীর দর্শন দেওয়া— এই চূড়ান্ত আদর— এর ত্রুটি হবার জো নেই। সকল বাড়ীতে যে এই রকমই, তা ঠিক নয়— এক এক বাড়ীতে বেশ খোঁজ-খবর নেয়— তারা নিমন্ত্রিতদের দেখে বেশ আমোদ পায় বলে বুঝা যায়, কিন্তু এক এক বাড়ীর ভাব দেখে মনে হয় যেন তাঁরা নিমন্ত্রণ করে নিমন্ত্রিতদের চরিতার্থ করেছেন।'[১৯]

বড়লোকের বাড়ির বউ-ঝিরা এসেছেন, সাধারণের থেকে তারা যে আলাদা এটা বোঝাতে হবে তো, তাই 'বড় মানুষের মেয়েরা রূপার গেলাস, রূপার পানের ডিপে নিয়ে আসতেন— সকলের মাঝখানে নিজের গেলাসে জল খাওয়া হত, পান খাওয়া হত।'

খাওয়া শেষ, এ বার বাড়ি ফেরার পালা। যিনি নিমন্ত্রণ করেছেন তিনি বাড়ি ফেরার পালকির ব্যবস্থা করবেন— করেছেনও, কিন্তু সকলে তো এক সঙ্গে বাড়ি যেতে চাইছে— যাবে কী করে? মেয়ে-বউদের পালকি ধরার বর্ণনাটা শুনুন—

'মনে কর, নিমন্ত্রণকারী দুই শত ঘর নিমন্ত্রণ করেছে, অথচ চারখানি বই পালকি নেই— তখন একখানি পালকির জন্যে কত বাড়ির মেয়ে যে হাঁ করে থাকবে তা ভেবেই দেখো না। তাদের সকলেরই বাড়ি যাওয়ার বিশেষ দরকার— আর কে বল দেখি রাত ১০/১১টা অবধি সেই ভিড়ের মধ্যে থাকতে চায়? সুতরাং সকলেই আগে পালকি পেতে ইচ্ছা করে। কিন্তু চুপ করে বসে থাকলে পালকি পাওয়ার জো নেই— যার সকলের চেয়ে জোর বেশি, সে-ই পালকি পেতে পারে। মেয়েরা সকলেই গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়ালো— ঠেলাঠেলি, চেঁচাচেঁচি, যেই একটি পালকি আসছে, অমনি একজন বলছে, 'ওগো আমি আগে যাই, আমার কচি ছেলে ঘরে রয়েছে।' আর একজন বলছে, 'ভাই, আমাকে যেতে দাও— আমার এই ছেলেটির জ্বর হয়েছে।' একজন বললে, 'আমার নূতন জামাই আসবে, আমার এখনি না গেলে চলবে না।' এই রকম সকলেই একটা-না-একটা বলছে, তার পর 'জোর যার মুলুক তার' একজন চ'ড়ে বসলো— পালকি চ'লে গেল।'২০

ঠিক তার পরের অবস্থাটা নিশ্চয়ই একালে বসে উপলব্ধি করা যাবে না, এক দিকে পালকির জন্য অপেক্ষা, মনে রাগ, সবটাই বেরিয়ে পড়ল মহিলামহলের আলোচনায়। আমরা ফিরে যাই সেই সময়ের সেই মুহূর্তে—

'আবার নিস্তব্ধ হ'ল— এ ওর সঙ্গে গল্প আরম্ভ করলে, কেউ হয়ত বললে, 'ও মা, এত ঘর খেতে বলেছে, পালকি বেশী রাখতে পারে না— এ ত খাওয়ানো নয়, কেবল মেয়েদের জব্দ করা— আমার মেয়ের বিয়ের সময় ন-খানা পালকি ছিল, চারখানা গাড়ী ছিল— আমি বরং বলেছিলুম— বলি অতয় কাজ কি— কর্ত্তা বললেন; না, সে কি হয়— ভদ্র মেয়েছেলে আসবে, তাদের কি কষ্ট দেওয়া যায়!' এই রকম শুধু সেই গিন্নী কেন, সকল গিন্নীই নিমন্ত্রণকারীর নিন্দা এবং তার পরেই নিজেদের সুখ্যাতি করতে লাগলেন।'

একই ভাবে পালকি আসছে, পালকি চলে যাচ্ছে— কাড়াকাড়ি করেও সব সময় পালকি পাওয়া যাচ্ছে না এর মধ্যে—

'নিমন্ত্রণকারীর আত্মীয়কুটুম্বর মেয়েদের যাবার সময় বাড়ীর ভিতর থেকে গিন্নী হুকুম করে পাঠালেন, 'বাগবাজারে ক্ষীরোর শ্বশুরবাড়ীর জন্যে একখানা পালকি করে দিতে বল।' কর্ত্তা অমনি একখানা পালকি ধরে রেখে চেঁচাতে লাগলেন— 'ও রে রামা, বাগবাজারের সোয়ারী ডেকে দে।' ঝম্ ঝম্ ক'রে বাগবাজারের সোয়ারী এলেন— পিছনে দাসীর মাথায় একটি বেশ বড়সড় রকম পুঁটুলি— কারণ, অবিশ্যি, মেয়ের শ্বশুড়বাড়ী বলে বাড়ীর গিন্নী তাকে একটু বেশী যত্ন করে খাইয়েছেন— জোর ক'রে দুটো সন্দেশ বেশী দিয়েছেন এবং মেয়ের সেজ জা আসে নি ব'লে তার জন্যে এক ভাগ খাবারও দেওয়া হয়েছে। তাঁরা বিনা কষ্টে পালকি উঠে চ'লে গেলেন— বাকি মেয়েরা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।'

আবার পালকি এল, 'একজন ঐ রকম ঠেলাঠেলি করে গিয়ে ত পালকিটি ধরেছে, ধরে সবে দরজা খুলেছে আর একটা ধুম্‌সো গিন্নী এসে তাকে এক ঠেলা দিয়ে তার নিজের নাতনীকে বসিয়ে দিলে— বৃষ্টিতে উঠানে বিলক্ষণ পিছল ছিল— সেই বৌটি ত ঝপাস ক'রে আর একজনের গায়ের উপরে পড়ে গেল ও দু-জনে জড়াজড়ি ক'রে কাদার উপর পড়ল। তারা ত এই রকম পড়ুক, যে নাতনীকে পালকিতে বসিয়েছে, সে ত দিব্যি আরামে পালকিটি চড়ে চলে গেল। পালকি নিয়ে টানাটানি যে কি বিষম ব্যাপার, তা আর কি বলবো।

বাড়ীতে শাশুড়ী যদি বৌয়ের গলার স্বরটি শুনতে পান ত রেগে বাড়ী মাথায় করেন, কিন্তু পালকিতে উঠবার সময় যদি সেই বৌয়ের গলা শোনেন— তাতে

বৌয়ের কিছুমাত্র লজ্জার ত্রুটি দেখেন না, তাতে তাঁর রাগ হয় না— বরং বৌকে পালকি ধরবার জন্য চেঁচাচেঁচি করতে উত্তেজনা করা হয়।'

এই হল কাজের বাড়ির পালকির অবস্থা! অনেকে অবশ্য নিজেদের পালকিতেই অনুষ্ঠানে যেতেন। নিজেদের পালকি হলে কি হবে, সেই পালকিও অন্যদের দখলে চলে যেত। অনুষ্ঠানে গিয়ে একজনের নিজের পালকির অবস্থার বর্ণনায় বলেছেন— 'আমার একটি আলাদা পালকি ছিল, সেই পালকি ধ'রে মহা টানাটানি প'ড়ে গেল— হয়ত দু-একজন বৌ ছুটোছুটি করে গিয়ে তার মধ্যে ব'সে পালকি তুলতে বলছে, 'আ মোলো বেয়ারাগুলো, পালকি উঠা না!' বেহারা তাহাদের এত বোঝাচ্ছে যে, সে পালকিটা কর্ম্মবাড়ীর রোজের পালকি নয়— তা তারা কি শোনে? চারটে বেয়ারা ও আমার দাসী তাদের বুঝিয়ে উঠতে পারে না— আমি দেখলুম মহা বিপদ্, অত ভিড়ের মধ্যে প্রাণ যায়, পালকি উঠবার জো নাই— সে একজন দখল করে বসেছে। আবার তাদের উঠিয়ে দিয়ে পালকি চড়তে আমার ভারি মায়া করতে লাগলো, কোন মতে পারলুম না। সেখানে থেকে চলে এসে আবার খানিকক্ষণ ভিড় কমবার অপেক্ষা করতে লাগলুম— তার পর আমার দাসী এসে আমায় ডেকে নিয়ে যায়।'

বাইরের মানুষ বলে ম্যানেজ করা গেল, কিন্তু নেমন্তন্ন বাড়ির গৃহিণী যদি চেয়ে বসেন তা হলে? না করার কোনও উপায় নেই, সেই দৃশ্যটা ছিল এমন—

"যদিও আমার একটি আলাদা পালকি ছিল, কিন্তু তবুও আমি শীঘ্র বাড়ী আসতে পাইনি। কেন না, আমি যেমন বাড়ী আসবার জন্যে গিন্নীকে বলে আসতে যাচ্ছি, অমনি গিন্নী আমার একটি আলাদা পালকি আছে শুনেই তাঁর একটি কুটুম্বকে সেই পালকিতে দিয়ে আমাকে দেরি করাতে লাগলেন। যখন আমি বললুম যে, আমি তবে এখন বাড়ী চললুম, তিনি বললেন, 'এখনি যাবে কেন, একটু ব'সো না ভাই!' আমি বললুম, 'না, আর বসবো না, বাড়ী যাই।' আমি দুর্ভাগ্যক্রমে বললুম যে, আমার বাড়ী থেকে পালকি এসেছে। শুনেই তিনি বলেন, 'ভাই, আমার এই বোনের কষ্ট হচ্ছে, ঘরে কচি ছেলে ফেলে এসেছেন, তোমার পালকি এঁকে রেখে আসুক। তার পর তোমায় রেখে আসবে।' আমি পালকি ছেড়ে দিলেম। এই রকম আরও দু-একজনকে সেই পালকিতে ক'রে পাঠিয়ে দিয়ে তবে আমাকে বাড়ী আসতে দেন। কাজেই আমার রাত হয়ে গেল।'

বাড়ি ফেরার সময় সেই ছাঁদার কথা স্বাভাবিক ভাবেই আসে। তার উপর যদি বাড়ির গিন্নি পালকির উপকার পায়। একজন ছাঁদা দেবেন, অন্য জন নেবেন না, সেই ঘটনাটি ছিল এমন—

'তার পর যখন বাড়ী আসবো, গিন্নী বললেন, 'তুমি সরা পাও নি?' আমি বললুম, 'হাঁ, পেয়েছি বৈকি।' তিনি বললেন, 'কৈ, তোমার সরা কৈ?' আমি যে সরা পেয়েও বেঁধে নিয়ে যাচ্ছি নে, এটা তাহার ভারি আশ্চর্য্য মনে হল— তিনি বিশ্বাসই করলেন না যে আমি সরা পেয়েছিলুম। আমি কিনা তাঁর বোনের জন্য পালকি ছেড়ে দিয়ে ভারি উপকার করেছিলুম, তাই তিনি আমার সঙ্গে আরও বিশেষ আত্মীয়তা করে বললেন যে, 'আর একটা সরা দিই, নিয়ে যাও।' আমি ত বিস্তর করে তাঁকে বোঝালুম যে খেয়ে যাচ্ছি, আবার বেঁধে নিয়ে যাওয়ার আবশ্যক দেখছি নে। তিনি কিছুতেই তা শুনলেন না।"[২১]

ছাঁদা দেওয়ার অন্য নাম ছিল 'ভালবাসা'। কলকাতার উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে, মানুষের মনের উন্নয়ন হয়েছে— সেই সূত্রে ভালবাসার ছাঁদা একদিন নিন্দার স্থান নিল, আস্তে আস্তে হারিয়ে গেল ছাঁদা— স্থান পেল ইতিহাসে, কিন্তু লেখা হল না সেই ইতিহাস।

তথ্যসূত্র

১. স্মৃতিতে সেকাল/আমাদের লোক আমাদের কথা, পৃ. ১৮৭ ঐতিহাসিক পত্রিকার বিশেষ অংশের পুনর্মুদ্রণ জানুয়ারি ২০০১
২. তদেব পৃ. ১৮৭
৩. অমৃতলাল বসুর স্মৃতি ও আত্মস্মৃতি পৃ. ১২০
৪. শরৎকুমারী চৌধুরানীর রচনাবলী পৃ. ২৬
৫. তদেব প. ২৬
৬. শুভবিবাহ। শরৎকুমারী চৌধুরানীর রচনাবলী পৃ. ২৩-২৪
৭. কলিকাতার স্ত্রী সমাজ, ঐ পৃ. ৯৮
৮. তদেব পৃ. ৯৮
৯. অমৃতলাল বসুর স্মৃতি ও আত্মস্মৃতি পৃ. ১৬৮
১০. কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা পৃ. ১২
১১. স্মৃতিতে সেকাল/আমাদের লোক আমাদের কথা, যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় পৃ. ১১৫
১২. তদেব পৃ. ১১২
১৩. শরৎকুমারী চৌধুরানীর রচনাবলী পৃ. ৯৮-৯৯
১৪. তদেব
১৫. তদেব পৃ. ১১৫
১৬. স্মৃতিতে সেকাল/আমাদের লোক আমাদের কথা পৃ. ১০৮
১৭. শরৎকুমারী চৌধুরানীর রচনাবলী পৃ. ৯৯-১০০

১৮. স্মৃতিতে সেকাল পৃ. ১০৯
১৯. শরৎকুমারী চৌধুরানীর রচনাবলী পৃ. ১০০
২০. তদেব পৃ. ৯৯
২১. তদেব পৃ. ১০০

শালি

রসিকতার মৌচাকে শালিরা ছিল বলেই 'শালি'— এই শব্দ দুটি চিনির চেয়েও মিষ্টি। সত্যি সত্যিই মধুর মতো। রস ছাড়া রসগোল্লা যেমন ভাবা যায় না, তেমনই রসিক শালি ছাড়া জামাইবাবু— ভাবাই যায় না।

শালীদের কথা যে শোনে মন দিয়া
সর্ব বিষয়ে সুখী হয় শ্বশুর বাড়ি গিয়া ।।
অবিশ্বাসী মন নিয়ে যে শালী কথা শোনে।
সর্ব কাজে 'শাল'-ই পাবে যেতে হবে বনে ।।

এহেন শালি সম্পর্কে 'বিশ্বকোষ'—এর মতো (২০ ভাগ, পৃ. ৩৩১) বইতে নগেন্দ্রনাথ বসু ১৩১৬ সনে মাত্র এইটুকু শব্দ ব্যবহার করছেন— 'শালি—(দেশজ) শ্যালিকা শব্দের অপভ্রংশ পত্নীর ভগিনী।' ১৩১৯ সনে সতীশচন্দ্র ঘটক শালি-বন্দনায় লিখেছেন—

'শালী কি মধুর নাম,
শালীহীন জন অতি অভাজন,
বিধিও তাহারে বাম
শালীর চাহনি শালীর হাসিতে
সুখনীরে প্রাণ থাকে গো ভাসিতে,
শালীর সোহাগ বেদনা নাশিতে
যেন গো সুদিং—বাম;
ভক্তিভরেতে এহেন শালীর
খুরেতে শত প্রণাম ।।'

একান্নবর্তী সংসার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে— ছোট পরিবার সুখী পরিবারে পরিণত হয়েছে। একে একে হারিয়ে যাচ্ছে একান্নবর্তী বৃহৎ সংসারের সুন্দর সুন্দর সম্পর্কগুলো। এমনি করেই হারিয়ে যেতে বসেছে 'শালি' সম্পর্ক।

বিংশ শতাব্দী শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা সুন্দর সামাজিক সম্পর্কে ইতি টানতে হবে— এটাই দুঃখের।

কেমন করে শালিকা

নামকরণের পিছনে একটি কারণ থাকে। আমরা ইতিহাস-সচেতন নই বলে, সেই ইতিহাস অধিকাংশই হারিয়ে গেছে। পরে যার যেমন খুশি গল্প তৈরি করেছে। আবার মনগড়া গুল দিয়েছে, গুল আর গল্প মিলে তৈরি হয়েছে 'গুল্প'। শালিকা নামকরণের পিছনেও এমন একটি 'গুল্প' আছে—

পৃথিবীতে সৃষ্টির দায়িত্ব পেয়েছিলেন প্রজাপতি ব্রহ্মা। গাছপালা, নদী, পোকামাকড়, পশুপাখি সৃষ্টির পর সবার শেষে সৃষ্টি করলেন মানুষ। তখনও মানুষ সমাজবদ্ধ হয়নি, সমাজের নিয়ম তৈরি হয়নি, জঙ্গলে বসবাস করে। তাই এক দিন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর মিটিং করলেন। বিষ্ণু বললেন, মানুষের জন্ম হল, মানুষের জন্য সামাজিক নিয়ম চালু করতে হবে। সুতরাং এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করুন। মহেশ্বর বললেন, একটা কিছু চালু করতে হলে প্রথমে কিছু ভুলভ্রান্তি থাকে। সুতরাং গবেষণার বিষয়বস্তু প্রথমেই মানুষের উপর প্রয়োগ করা ঠিক নয়— পশুপাখির উপরেই দেখা উচিত। অনেক আলোচনার পর ঠিক হয়, পশুপাখির উপরেই তা প্রথম প্রয়োগ করে দেখা হবে।

পাখিদের উপর প্রথম 'বোধ' প্রয়োগ করা হল। একটি পাখি চঞ্চল হয়ে উঠল, তার ঠোঁটটি এমন উসখুস করছে কেন? ঠোঁটটি দিয়ে কাঠ ঠোকরাতে শুরু করল, টুনটুনি পাখি পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ঠোঁটটি দিয়ে সেলাই করা শুরু করল— যেমনটি দরজিরা করে। বাবুই পাখি তৈরি করল অসাধারণ সুন্দর কল্পলোকের ঘর। এমন ঘর দেখে আনন্দে গেয়ে উঠল দোয়েল পাখি।

'বোধ' পেয়ে পাখিরা বেশ ভাল কাজ করছে, এর মধ্যে দেবতারা অনেক পাখিকে নিজেদের বাহন করে নিলেন, বিশেষ করে কার্তিক নিলেন ময়ূর, লক্ষ্মী নিল প্যাঁচা, সরস্বতী নিল হাঁস। অনেক দেবতা আবার পাখি পছন্দ করলেন না, তাঁরা নিলেন পশু। মা দুর্গা নিলেন সিংহ, শিব নিলেন ষাঁড় ইত্যাদি।

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর স্বর্গে ক্লোজ ডোর মিটিং করছেন, স্বর্গোদ্যানে পশুপাখিরা মহানন্দে গল্প করছে, খেলা করছে। এক জায়গায় পাখিদের সভা, ভারী ভারী বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। আলোচনা তো হবেই— লক্ষ্মী-নারায়ণের অনেক গোপন কথা শোনে প্যাঁচা। গণেশ-কার্তিকের অনেক কথা শোনে ময়ূর। আর এই সব কথার চর্চা

হচ্ছে এই উদ্যানে। হঠাৎ এক পাখি, প্যাঁচার সামনে এলে বলল— মানুষের জন্য সমাজ-নীতি তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা মানুষের কাছ থেকে প্রণাম পাবেন। মানুষের কাছ থেকে প্রণাম পেতে আমাদেরও খুব ইচ্ছে। একটু ব্যবস্থা করে দেবেন! আর এক পাখি বলল, কেন মানুষ পাখিদের প্রণাম করবে কেন? প্যাঁচা গম্ভীর মুখে বলল, মানুষ যখন দেবতাদের পুজো করে প্রণাম করবে— তখন দেবতার বাহন হিসেবে আমরা তো প্রণাম পাব-ই। ওই পাখি প্যাঁচাকে লাইন করল, প্যাঁচা তাকে বলল, ঠিক আছে, মায়ের মুড বুঝে তোমার আপিল মায়ের কাছে নিবেদন করব।

এক দিন নিরিবিলিতে মা লক্ষ্মীকে পেয়ে প্যাঁচা চোখ পিটপিট করে গোমরা মুখে বলল— মা, নারায়ণ ঠাকুর তো মানুষের সমাজের রীতি-নিয়ম তৈরি করছে, আমরা তো তোমাদের সঙ্গেই মানুষের প্রণাম পাব— এই পাখিরা মানুষের কাছ থেকে প্রণাম পেতে চাইছে, তুমি যদি ঠাকুরকে বলে মানুষ যেন ওদের একটু প্রণাম করে তার ব্যবস্থা করে দাও তো ভাল হয়। মা শান্ত শীতল কণ্ঠে শুধু বললেন দেখি! এক দিন মা নারায়ণের পায়ে হাত বোলাতে বোলাতে মুড বুঝে ওই পাখিদের প্রণাম পাওয়ার বিষয়টি তুলল। নারায়ণ বললেন, আমরা তো সমাজ-নীতির সুফল-কুফল প্রথম পাখিদের উপরই পরীক্ষা করতে চলেছি, ঠিক আছে বিবাহ-বন্ধন বিষয়টি এদের উপরেই প্রয়োগ করা হবে।

এই পাখিদের পরিবারে বোনে বোনে ভীষণ ভাব। অনেক বোন এই সঙ্গেই থাকে। এক দিন এক বোনের বিয়ে হয়ে গেল। পিঠোপিঠি বোনের মন ভীষণ খারাপ। দিদির বিয়ে হতেই অন্য বোন প্রথম প্রথম একা একা মনমরা অবস্থায় থাকত। কোনও কিছুর বিষয়ে কথা উঠলেই খিচিরমিচির করে উঠত। প্রণাম পাওয়ার জায়গায় ফল হল উলটো। প্যাঁচা মারফত আবার আবেদন গেল নারায়ণের কাছে। নারায়ণ বললেন, ঠিক আছে। লক্ষ্মী নারায়ণকে বললেন— দিদির বিয়ে হয়েছে, ছোট বোনের মন রাখতে কিছু করলে না? নারায়ণ হেসে বললেন, করে দিয়েছি। দিদির জন্য রাখা জামাইবাবুর ভালবাসা দুই ভাগ করে, চল্লিশ শতাংশে দিদির জন্য এবং ষাট শতাংশ বোনের জন্য অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো পাচার করে দিয়েছি। বোনে বোনে মিল দেখে মানুষ মিল শিখবে, এ জন্য মানুষ এই জোড়া পাখিকে দেখলে প্রণাম করবে— এ ব্যবস্থাও করে দিয়েছি। আর দিদির বোনেদের নাম এই পাখিদের নামেই করে দিয়েছি। লক্ষ্মী বলল এই পাখিদের নামটিই তো বলোনি। নারায়ণ বললেন ও হ্যাঁ, শালিক। এই পাখির নামেই বিবাহিত দিদির বোনেদের ডাকা হবে শালিকা বলে।

এর পর থেকেই শালিকা বা শালি নামে জামাইবাবুরা কেমন উতলা হয়ে পড়ল। গিন্নিরা বুঝতেই পারল না, নারায়ণের চক্রান্তে কেমন করে তার ভালবাসায় বোনেরাও বিরাট এক ভাগ বসিয়েছে। এখানে চুপি চুপি বলে রাখি, এক জামাইবাবু তার শালিকে একটা বিরাট অঞ্চল কিনে দিয়েছিলেন এবং শালির জন্য ওই জায়গাটির নামও করে দিয়ে ছিলেন শালিকা বা শালিখা। জায়গাটি কিন্তু আজও হাওড়ায়, ওই নামেই রয়েছে। সেই ১৯১২ সনে সতীশচন্দ্র ঘটক দু' অক্ষরের এই মধুময় শব্দ 'শালী' নামটি স্মরণ করেই লিখেছিলেন—

শালী কি মধুর নাম,
শুনিলেই প্রাণ করে আন্‌চান,
কপালেতে ছুটে ঘাম।
দুটি অক্ষরে আ মরি কি ভাব!
পুলকে ও ভয়ে মাখামাখি ভাব,
শালী সঙ্গ যাহার অভাব,
ব্যর্থ বিবাহ তার।
তীব্র-মধুর এ নামটি হায়
না জানি রচনা কার।

শাল-ই শালি

সে বহু যুগ আগের কথা। বিশাল বনভূমিতে বিরাট বিরাট গাছ। এই বনভূমির মালিক গাছ কাটিয়ে, চেরাই করা কাঠকে সুন্দর কাজ করে ঘর সাজালেন। শালি বাড়িতে এসে এই অসাধারণ সুন্দর আসবাবপত্র দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। বললেন, সুন্দর কাঠ, নাম কী? জামাইবাবু মজা করে বললেন। শাল-ই, শালি বললেন, 'শালি'? সে কখনও হয়— এই জামাইবাবুর চেষ্টাতেই এই কাঠ শাল-ই নামেই পরিচিত হল। অনেক অবশ্য শাল কাঠ বলেন। এ বিষয়ে অন্য একটি মত আছে, শুনবেন—

পৃথিবীতে জন্মে যে শালী নিন্দা করে।
শাল-বীজ হয়ে সে বনভূমিতে পড়ে।।
'শাল-ই' শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে, শাল বৃক্ষের জন্ম।
কলহ নয়, মন-শোভায় শালি হল শ্রেষ্ঠ।।

শীতের শাল—ই শালির নামে

শীত পড়লে যেমন শালের কথা মনে পড়ে, তেমনই শ্বশুরবাড়ির কথা উঠলেই শালির কথা মনে হয়। একটা সময় ছিল, যখন বিয়েতে প্রণামীর শাড়িটাড়ি দেওয়া হলেও— শালিদের দেওয়া হত শীতের চাদর, যা এই শালিদের নামেই, শাল-ই, নামকরণ হয়েছে। শাল-ই নামটির কথা কিন্তু আমরা কখনও এমন ভাবে ভাবিনি—

'শাল-ই' মিষ্টি শীতের সময় সর্বলোকে কয়।
গুড় মিষ্টি, চিনি মিষ্টি তার মতো কিন্তু নয়॥
উষ্ণ-মধুর শালির জন্য শীতবস্ত্রের নাম।
'শাল-ই' করা হয়েছে অমর করতে নাম॥
সব শাল-ই শালের মতো জামাইবাবুর কাছে।
তবু বলি এমন মিষ্টি কি আর পৃথিবীতে আছে?

শালির সম্মানে শালি ধান

আজকের অনেকেই হয়তো শালি ধানের নামই শোনেনি, কিন্তু একদিন সুন্দরী শালির সম্মানে বাংলার বিখ্যাত ধানের নাম করা হয়েছিল শালি ধান। এই শালি ধান তো এখন প্রবাদ বাক্যে স্থান পেয়েছে—

শালি ধানের চিড়ে আর উড়কি ধানের খৈ।
খুঁজলে আজ অমন জিনিস পাবেন আপনি কৈ?
শালির মতো সুন্দর বলে সকলের হয়েছিল হুঁশ।
শালি-ধান নাম করেছিল এ দেশেরই মানুষ॥
শালি ধান নামটি এখন প্রবাদ বাক্যের কথা।
নামটি শুনলেই প্রাচীন লোকের মনে ওঠে ব্যথা।

সাল-ই শালিদের জন্য

অব্দ গণনা শুরু হয়েছে কবে থেকে তা কেউ সঠিক করে বলতে পারেন না, শোনা যায় মহারাজা যুধিষ্ঠির যে দিন সিংহাসনে বসেন সে দিন থেকে 'যুধিষ্ঠিরাব্দ' গণনা শুরু হয়। তার পর অনেক অব্দ হয়েছে— বুদ্ধাব্দ, কল্যাব্দ, বঙ্গাব্দ, খ্রিস্টাব্দ ইত্যাদি। এইগুলি সবই অব্দ। আমরা বলি বাংলা কত সাল? এই সাল কথাটিই 'সাল-ই'দের নাম থেকে হয়েছে, করেছেন অবশ্য মহারাজা শালীবাহন—

রাজা হয়ে শালি ছাড়া থাকতে পারেননি যিনি।
ইতিহাসে 'শালীবাহন' নাম পেয়েছেন তিনি।।
এই রাজা শালীদের জন্য করলেন একটি অব্দ।
শক 'সাল-ই' শালিদের জন্য করা সেই অব্দ।।

সেকালের বাসরঘর

'মন্ত্রপাঠ সহযোগে হল বিয়েটা সাঙ্গ।/বাসরঘরের আসরেতে চলবে রসের রঙ্গ।' এই রঙ্গরসের প্রাধানা হলেন শালি। সেকালে সকল বরের চোখেই বাসরঘর 'বিবাহের রণক্ষেত্র' ছিল। এই রণক্ষেত্রে অবশ্য শালিরাই জয়ী হত, জামাইবাবুকে ঠকতে হত পদে পদে। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে ৩০ নভেম্বর 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় 'বশদ দোজবর' পাত্র বাসরঘরে তাঁর অভিজ্ঞতায় লিখেছেন 'ভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যক্রমে আমাকে সে দিবস বিবাহ করিতে হইয়াছে। স্ত্রী-আচার সময়ে কানমলা, নাকমলা, ধাক্কা, চড় ও মুষ্ঠ্যাঘাত সহ্য করিয়া বাসরঘরে প্রবেশ করিলাম। তথায় দেখি, চতুর্দিকে কেবল স্ত্রীলোকের হাট।... সুন্দরীগণ আমাকে প্রথমে মহাসমাদর করিয়া ক্রমশ হাত চালাইতে লাগিলেন। আমার তখন আরবীয় উপন্যাসে নাপিতের ভ্রাতার মন্ত্রীর বাটীর স্ত্রীলোকদিগের সহিত আমোদের কথা স্মরণ হইল। আমাকে দাড়ি গোঁফ কামাইতে হইল না বটে, কিন্তু চড় চাপড় ও কান্নুটিতে সেগুলি যায় যায় বোধ হইল। কিঞ্চিৎ পরে এই যুদ্ধ থামিল।'

এই যুদ্ধক্ষেত্রে শালীরা কী ভাবে আক্রমণ রচনা করত সে সম্পর্কে মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন— 'প্রথমে শালীরা আসিয়া কনেকে হুকুম করিবে বরের কান ধরিয়া উঠ-বোস করা। আর সেই সময় একটা গালের কথা বলিয়া— উঠ... ইত্যাদি। সেই সাত বার তো কান মলা হল। বর বাবাজি বুঝিলেন কি ঝকমারী করছি। কান মলা খেতে খেতে প্রাণ গেল।'

জামাইবাবুদের কান ধরতে পারার অধিকার পেয়েছিল নাপিত আর শালি। আজকের দিনে এ ব্যবহারের কথা কল্পনাও করা যায় না, তবে সেকালের মানুষের চোখে কিন্তু এই কান ধরাটা অশোভন ছিল না। তাই সতীশচন্দ্র ঘটক শালিমাহাত্ম্যে লিখলেন—

'শালী কি মধুর নাম,
দেহ-নৌকার শালী কর্ণ-ধার
জীবন-সেতুর থাম,

ভগিনী-পতির যুগল কর্ণ
ঝাঁকি দিয়া তিনি করেন স্বর্ণ,
তাঁহার পরশ-পরশে বর্ণ
হয় রাঙ্গা অনুরাগে,
কেন যেন তবু না ঝরে নয়ন
ব্যথা যদি বড় লাগে।'

সেকালের শালিদের রসিকতার কথা শ্রদ্ধেয় অমৃতলাল বসুর 'আত্মস্মৃতি' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে একালের পাঠককে বিষয়টি বোঝাতে চাইছি—

'বাসরের শালী-শালাজের রসিকতাটা যে বদরসিকতায় ও সময় সময় উৎপাতেও গড়িয়ে গেছল, সে কথা সত্য, এখন বেশ শুধরে গেছে। আর একটা উৎপাত ছিল, নতুন জামাইয়ের শ্বশুরবাড়ি আসার, প্রথমে বোধ হয় যা ছিল, পরিহাসচ্ছলে জামাইয়ের ভোজ্যে চার-শিল্পকলার প্রদর্শন, সেইটা বীভৎস ও সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জামাইয়ের পিঁড়ের তলার চার কোণে চারটি সুপারি দেওয়া, জামাই বাবাজি যেমন পিঁড়েতে পা-টি দিয়েছেন অমনি আছাড় খেয়ে চিৎপাত হয়ে পড়েছেন, তখন চুন-হলুদের ব্যবস্থা; শ্বেতপাথরের গেলাস তুলে জামাই মিছরির জল খাবেন, মুখে দিয়ে দেখেন খড়-ভিজানো জল, তার পর কচুর কেশুর, পিটুলির সন্দেশ, বিলিতি কুমড়োর পেঁপে, আরও কত কী যে, তা কি মনে আছে! এক এক জন তুলো বা শোলা দিয়ে এমন ভাত তৈরি করতেন, যেমন জামাইবাবু গরাস মাখতে যাবেন, অমনি শালীর হাতের পাখার বাতাস, সঙ্গে সঙ্গে অন্নরাশি উড্ডীয়মান।'

বাসরঘরের ভাষা: একালের

বিয়ের রাতে বাসরঘর— মেয়েদের দখলে। ওটা যেন একটা দুর্গ, সকালবেলা এই দুর্গ থেকে বরকে বেরুতে দেওয়া হবে না, যতক্ষণ বর বিছানা তোলার টাকা না দেয়। বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর, বিছানা তোলা পর্যন্ত যে সব শব্দ ব্যবহার করা হয় তা একটু অন্য রকম। আমরা সাধারণত এই ভাষাতত্ত্বের দিকে নজর দিই না বলে জানতেও পারি না বাসরঘরের ভাষা কেমন? এই ভাষা সংকলন করার কথা কেউ ভাবেনি, একটু উদাহরণ দেওয়া যাকে। বাসরঘরে দুটি প্রধান পক্ষ, এক বরপক্ষ, বরপক্ষে বরের সঙ্গে বরের দুই-একজন বন্ধু এবং এক-আধজন নিকট আত্মীয় থাকেন। কনের দিকে শালিরা প্রধান, বউদি স্থানীয় গুরুজনেরাও এই দিন শালির মতো সম্পর্ক পেতে আগ্রহী হন। অনেকেই বলেন, আজকের জন্য আমরা গুরুজন নই।

যাদের বাড়িতে বাসর জাগা আছে সেখানে প্রথমেই শালি মহলে কথা ওঠে কে কে 'গ্যারেজে' (বাসরঘর) থাকবে। একজন বলল, বরের বন্ধু যদি 'ক্যান্ডরামি' (অসভ্যতামী) করে তা হলে কিন্তু 'DPL' (ডাইরেক্ট পাছায় লাথি) করে 'গ্যারেজ' থেকে বার করে দেব। আর এক জন বলল, দ্যাখ প্রথমেই 'জন্ডিস' (কাজ খারাপ করে দেওয়া) করে দিস না। যারা রাতে থাকবে তার মধ্যে একটা 'GM' (গুডম্যান=বোকা) ওকেই 'মুরগী' (পেছনে লাগা) করব।

বাসরের দ্বিতীয় পর্ব বিছানা তোলার পর্ব। কয়েক জন শালি একটা বিরাট অঙ্কের টাকা দাবি করল। অন্য এক জন না জানার ভান করে বলল— 'কেস্টা কী?' (ব্যাপারটা কী?) তোরা সব 'ক্যাবলাকান্ত' (বোকা) হয়ে বসে আছিস কেন। এক জন বলল— ওরা তো 'ঝুলনযাত্রা' (ঝোলাঝুলি করা) শুরু করেছে। 'বধ করা' (রাজি করানো) যাচ্ছে না।

বরের বন্ধু বলল— 'কোকাকোলা শালি' (যার কথায় ঝাঁজ আছে) গেল কোথায়? আমাদের যা দেওয়ার বলে দিয়েছি, এখন পকেট 'গড়ের মাঠ' (পকেট খালি)। 'গেজেট শালি' (সবজান্তা) 'ঝাঁকি দর্শন' (হঠাৎ দেখা দিয়ে) দিয়ে কোথায় গেল? বর এখনও 'চিন্তাঘরে' (বাথরুমে) 'সামনের পেছনের' (প্রস্রাব পায়খানা) কোনও কাজই করতে যেতে পারেনি, আর কত 'টাইট দেবেন' (জব্দ করা)।

এক শালি এসে এসে বলে গেল, কী হল জামাই যে 'গুপিকান্ত' (নির্বোধ) হয়ে বসে আছে, বন্ধুরা 'চেকনাই'র (ফিটফাট) বেলায় আছে, কাজের বেলায় 'KP' (কেটে পড়া)।

শালিরা কিছুতেই নামবে না, বাড়ির কর্তারা ঘন ঘন তাগাদা দিচ্ছে মিটিয়ে নেওয়ার জন্য, তখন বরের বন্ধু বলল, ঠিক আছে 'লোডশেডিং'-এর (মুখ কালো করে বসে থাক) দরকার নেই— তোমাদের কথাও থাক, আমাদের কথাও থাক— মাঝামাঝি করে দিলাম। এক শালি কিছু বলতে যাচ্ছিল, অন্য জন বলল, 'চেপে যা' (কথাবন্ধ করা) যা দিচ্ছে নিয়ে নে, বলে একবার 'টেরিয়ে' (আড়চোখে) দেখে নিল দিদিকে। বৌদি এসে বলল, 'ব্রেককষা' (টাকা দিয়ে দরকষাকষি ও ইয়ারকি বন্ধ করা) হয়েছে?

আসলের চেয়ে সুদ দামি

সন ১৩১৯, ইংরেজি ১৯১২। শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র ঘটক 'শালী-মাহাত্ম্য নামে একটি কবিতা রচনা করেন এবং তাঁর 'রঙ্গ ও ব্যঙ্গ' গ্রন্থে (পৃ. ২৩২-২৩৪) পাঁচটি স্তবকে তা প্রকাশ করেন। কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকে শালিকে চিনির চেয়ে মিষ্টি আর গিনির

চেয়ে দামি বলে মন্তব্য করেছেন। শুধু তাই নয়, মহাজনের কাছে আসলের চেয়ে সুদের কদর যেমন বেশি, তেমনই জামাইদের কাছে গিন্নির চেয়ে শালির দর বেশি বলে মন্তব্য করেছেন—

শালী কি মধুর নাম,
চিনির চেয়ে তার অধিক সুতার
গিনি চেয়ে বেশি দাম।
নামে পরাজিত চিনি আর গিনি
হয় যদি, তবে ভেবে দেখ তিনি
নিজে কি জিনিষ; গৃহিনীরে জিনি
তাঁহারি অধিক মান,
যথা, মহাজন কাছে আসলের চেয়ে
সুদেরি অধিক টান।'

'লা' বড়, না 'লি' বড়

কুটুম্বিতায় 'লা' বড় বা 'লি' বড় তা নিয়ে বিতর্ক চলছে দীর্ঘকাল। সব যুগেই 'লি'র দিকে পাল্লাভারী কিন্তু 'লা'-এ দের ভাব এমন, যেন 'লি'-নয় 'লা'-ই বড়। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন 'লা' মানে শালা আর 'লি' মানে শালি। শালাদের তো উনিশ শতকে 'আ'-কার ছেঁটে 'শাল' করে ফেলা হয়েছিল। রসরাজ অমৃতলাল বসু 'স্মৃতি ও আত্মস্মৃতি'তে (পৃ. ১৩০) সেই কথা-ই আমাদের শুনিয়েছেন— 'সেকালে 'শালা' স্থলে 'শাল' শব্দ ব্যবহৃত হত, যথা— পাকশাল, ঢেঁকিশাল, ঘোড়াশাল, হাতিশাল, এখনও কোনও কোনও 'শালা' বোনের বাস্তুতে এসে বাঁশগাড়ি করে ভগ্নীপতির 'শাল' হয়ে দাঁড়ান।'

না, শালীর 'লি' বাদ দিতে কেউ বলেন, বরং উল্টোটা হয়েছে, এক কবি সেই ১৯১২ সালে 'শালীমাহাত্ম্য' লিখতে গিয়ে শৈশব থেকে শালি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে লিখেছেন—

'শালী কি মধুর নাম,
সেই সুখ শালী, যে পেয়েছে শালী,—
মর্ত্তে গোলক ধাম।
আদরে যতনে ক্রীড়া-পরিহাসে,
শাসনে পীড়নে ব্যঙ্গ-বিলাসে,

কৌতুক-ভরা বিদ্রুপ-হাসে
শালীসম কেহ নাই,
জনমে জনমে শৈশব হতে
শালী যেন খালি পাই।'

হুতোমের চোখে শালি

উনিশ শতকের শুধু বাবু কালচার নয়, সমাজের খুঁটিনাটি বিষয়েও সতর্ক দৃষ্টি রেখে কলম ধরেছিলেন 'হুতোম প্যাঁচা'। শালিদের অত্যাচারে জামাইবাবুরা কেমন নাজেহাল হতেন তার একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন 'কলিকাতা বারোইয়ারি পূজা' নকশায়—

'শেষে জামাইবাবুকে জলযোগ করবার জন্য বাড়ির ভেতর দিয়ে যাওয়া হল। পূর্ব্বে জলযোগের যোগাড় করা হয়েছে— পীঁড়ের নীচে চার দিকে চারটি সুপুরি দেওয়া হয়েছিলো; জামাই বাবু যেমন পীঁড়েয় পা দিয়ে বসতে যাবেন অমনি পীঁড়ে গড়িয়ে গ্যালো; জামাই বাবু ধপ্ করে পড়ে গ্যালেন— শালী শেলোজ মহলে হাসির গর্‌রা পড়লো (জলযোগের সকল জিনিষগুলিই ঠাট্টাপোরা) মাটির কালো জাম, ময়দা ও চালের গুঁড়ির সন্দেস, কারে আক ও বিচালির জলের চিনির পানা, জলের গেলাসে ঢাকুনি দেওয়া আরসুলো মাকোসা, পানের বাটায় ছুঁচো ও ইঁদুর পোরা। জামাইবাবু অতিকষ্টে ঠাট্টার যন্ত্রণা সহ্য করে বাইরে এলেন।'

বিদ্যাসাগরের শালি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বেশি বয়সে বলেছিলেন— 'আজকাল বিবাহে আর তেমন আমোদ নাই। বরকেও তেমন সঙ্কট পরীক্ষায় আজকাল আর পড়িতে হয় না।' শালিদের দুর্গে অর্থাৎ বাসরঘরে বিদ্যাসাগরকেও কঠিন পরীক্ষায় পড়তে হয়েছিল, সেই পরীক্ষায় অবশ্য পাশ করে গিয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। মজার সেই শালিকাহিনিটি তিনি বলেছেন এই ভাবে—

'আমার বিবাহের সময়ে বাসরঘরে পা দিতে না দিতেই আমাকে বলিল, 'তোমার কনে খুঁজিয়া বাহির কর।' কনে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে শুনিয়া মহা মুস্কিলে পড়িলাম। গৃহে প্রবেশ করিতে না করিতে আমার উপর কনে খুঁজিয়া লইবার হুকুম হইল; আমি দেখিলাম সেই মেয়ের দঙ্গলের ভিতর থেকে সেই অপরিচিতা অর্ধাঙ্গিনীকে খুঁজিয়া বাহির করা আমার কর্ম নয়— আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে আমারই বয়সের বেশ একটি টুকটুকে ফরসা মেয়েকে ধরিয়া বলিলাম। 'এই আমার

কনে।' যেমন ধরা অমনি এক মহা গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। কে কার ঘাড়ে পড়ে, কে কোথায় দিয়ে পালাইবে, তার পথ পায় না। আমি যাকে ধরেছি, তাকে খুবই ধরিছি, তার আর পালাইবার পথ নাই। আমি তার হাত ধরিয়া বলিলাম, 'তুমিই আমার কনে, তোমাকে হলেই আমার ঘর চলবে। আমি আর অন্য কনে চাই না।' সে মেয়েটি বাপরে মারে বলে চিৎকার করিতে লাগিল। গিন্নীবান্নী গোছের দুই এক জন নিকটে আসিয়া বলিল, 'ও তোমার কনে নয়, ওকে ছেড়ে দাও'। আমি বলিলাম, 'ছাড়িব কেন? খুঁজে নিতে বলেছে, আমি খুঁজিয়া এইটিকেই বাহির করিয়াছি। এইটি হলেই আমার বেশ মনের মতো হবে।' তারপর মেয়েটি হাতে পায়ে ধরিয়া বলিল, 'আচ্ছা আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি তোমার কনে বার করে দিচ্ছি।' তখন আপনারাই কনে আনিয়া হাজির করিল।'

সুবর্ণগোলকে শালি

সুবর্ণগোলক হাতে পেয়ে চাকর বাবু হয়ে গেল আর বাবু কালীকান্ত চাকর হয়ে গেল। শ্বশুরবাড়িতে এসে জামাই চাকরের মতো ব্যবহার শুরু করল, শালিরা ভাবল জামাইবাবু তাদের সঙ্গে মজার রসিকতা করছে— 'এদিকে দাসীয় কালীকান্তকে অন্তঃ পুরে ডাকিয়া আনিল, ঘরের ভিতর স্থান হইয়াছে, কিন্তু কালীকান্ত উঠানে দাঁড়াইল বলিল, 'আমাকে ঘরের ভিতরে কেন? আমাকে এইখানে হাতে দুটো ছোলা গুড় দাও, খেয়ে একটু জল খাই। শুনিয়া শালীরা বলিল, 'বোসজা মশাই যে এবার অনেক রকম রসিকতা শিখে এয়েছে দেখতে পাই।' বঙ্কিমচন্দ্র শালীদের এই ছোট্ট মন্তব্যের মধ্যেই বুঝিয়েছেন বিজয়ী শালিদের হারাতে জামাইবাবু যদি নতুন রসিকতা শিখেও এসে থাকে তা হলেও তা শালিদের দু' আঙুলের চুটকির সমান।

রসরাজের চোখে শালি

রসরাজ অমৃতলাল বসু তাঁর নাতনি কনকলতার বিয়েতে দীর্ঘ কবিতায় একস্থানে লিখেছেন—

'একে বৃদ্ধ তায় কানা,
বাসরে প্রবেশ মানা,
পলাশ লোচনা তন্বী কিশোরীর কুঞ্জ।
নবীন অতিথি বরে,
সোহাগের সমাদরে,

করে নেবে আপনার আপনার আজি সখি কুঞ্জ।।
বঙ্গের বাসর ঘর,
দেয় মাত্র অবসর,
কৌতুক-কৌতুক দিতে শ্যালিকা-শালাজে।।
আজি সে গাহিবে গান, হানিবে কটাক্ষ-বাণ,
প্রভাত ঘোমটা টেনে পালাবে সলাজে।।'

বাসর ঘরে শালিদের রসিকতা একটু মোটা দাগের হত বলে রসরাজ মন্তব্য করেছিলেন— 'বাসরের শালি শালাজের রসিকতাটা যে বদরসিকতায় সময়ে সময়ে উৎপাতেও গড়িয়ে গেছল, সে কথা সত্য, এখন সেটা শুধরে গেছে।'

কবিগুরুর চোখে শালি

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শালি-জামাইবাবুকে কেন্দ্র করে চিরকুমার সভা নামে একটি গোটা নাটকই লিখে ফেলেছিলেন। নাটকটি 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' নামেও প্রকাশিত হয়েছিল, এই রচনায় (বিশ্বভারতী রচনাবলী ৪র্থ, পৃ. ২১৯) প্রথম পরিচ্ছদেই লেখা হয়েছিল— 'জামাতা অক্ষয় কুমার পুরো নব্য। শালীগুলিকে তিনি পাস করাইয়া নবসমাজের খোলাখুলি মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে ইচ্ছুক। সেক্রেটারিয়েটে তিনি বড়ো রকমের কাজ, গরমের সময় তাঁহাকে সিমলা পহাড়ে আপিস করিতে হয়... বিধবা শাশুড়ী তাঁহাকেই অনাথা পরিবারের অভিভাবক বলিয়া জ্ঞান করেন। শীতের কয়মাস শাশুড়ীর পীড়াপীড়িতে তিনি কলিকাতায় তাঁহার ধনী শ্বশুর-গৃহেই যাপন করেন। এই কয়মাস তাঁহার শালী সমিতিতে উৎসব পড়িয়া যায়।'

অক্ষয়-জামাই, পুরবালা-অক্ষয়ের স্ত্রী, জগত্তারিণী— অক্ষয়ের শাশুড়ি, শৈলবালা-অক্ষয়ের বড় শালি (বিধবা), নীরবালা-অক্ষয়ের মেজ শালি, নৃপবালা-অক্ষয়ের ছোট শালি, 'শ্যালী সমিতি'র উপাখ্যান চিরকুমারসভা অনেকেই পড়েছেন, এখানে ওই বই থেকে ওই ছটি চরিত্রের বিশেষ বিশেষ কথা উদ্ধার করে দেওয়া হল, আশা করি মনোযোগী পাঠক এর মধ্য থেকেই শালি-জামাইবাবু রসিকতার রসাস্বাদন করতে পারবেন।

পুরবালা। তোমার নিজের বোন হলে দেখতুম কেমন চুপ করে বসে থাকতে। এত দিনে এক-একটির তিনটি চারটি করে পাত্র জুটিয়ে আনতে। ওরা আমার বোন কিনা—

অক্ষয়। মানব-চরিত্রের কিছুই তোমার কাছে লুকোনো নেই। নিজের বোনে এবং স্ত্রীর বোনে যে কত প্রভেদ তা এই কাঁচা বয়সেই বুঝে নিয়েছ। তা ভাই, শ্বশুরের কোনও কন্যাটিকেই পরের হাতে সমর্পণ করতে কিছুতেই মন সরে না— এ বিষয়ে আমার ঔদার্যের অভাব আছে তা স্বীকার করতে হবে।...

...পুরবালা। তবে যাও।

অক্ষয়। না, না রাগারাগি না। আচ্ছা, যা বল তাই শুনব। খাতায় নাম লিখিয়ে তোমার ঠাট্টানিবারণী সভার সভ্য হব। তোমার সামনে কোনো রকমের বেয়াদবি করব না। তা, কী কথা হচ্ছিল। শ্যালীদের বিবাহ। উত্তম প্রস্তাব।

পুরবালা। দেখো, এখন বাবা নেই। মা তোমারই মুখ চেয়ে আছেন। তোমারই কথা শুনে এখনো তিনি বেশি বয়স পর্যন্ত মেয়েদের লেখাপড়া শেখাচ্ছেন। এখন যদি সৎপাত্র না জুটিয়ে দিতে পার তা হলে কী অন্যায় হবে ভেবে দেখো দেখি।

অক্ষয়। আমি তো তোমাকে বলেইছি তোমরা কোনো ভাবনা কোরো না। আমার শ্যালীপতিরা গোকুলে বাড়ছেন।...

...শৈলবালা। মুখুজ্যেমশায়, এই বার তোমার ছোটো দুটি শ্যালীকে রক্ষা করো।

অক্ষয়। যদি অরক্ষণীয়া হয়ে থাকেন তো আমি, ব্যাপারটা কী।...

জগত্তারিণী। বাবা অক্ষয়।

অক্ষয়। কী মা।

জগত্তারিণী। তোমার কথা শুনে আর তো মেয়েদের রাখতে পারি নে।

শৈলবাসা। মেয়েদের রাখতে পার না বলেই কি মেয়েদের ফেলে দেবে মা।

জগত্তারিণী। ঐ তো! তোদের কথা শুনলে গায়ে জ্বর আসে। বাবা অক্ষয়, শৈল বিধবা মেয়ে, ওকে এত পড়িয়ে, পাস করিয়ে, কী হবে বলো দেখি। ওর এত বিদ্যের দরকার কী।

অক্ষয়। মা, শাস্ত্রে লিখেছে, মেয়েমানুষের একটা-না-একটা কিছু উৎপাত থাকা চাই— হয় স্বামী, নয় বিদ্যে, নয় হিস্টিরিয়া। দেখো-না, লক্ষ্মীর আছেন বিষ্ণু, তাঁর আর বিদ্যের দরকার হয়নি, তাই স্বামীটিকে এবং পেঁচাটিকে নিয়েই আছেন; আর সরস্বতীর স্বামী নেই, কাজেই তাঁকে বিদ্যে নিয়ে থাকতে হয়।...

...নীরবালা। আজ আমাদের বরের অনারে পড়ার ছুটি দিতে হবে মুখুজ্যেমশায়।

নৃপবালা। আঃ, কী বর বর করছিস। দেখো তো ভাই মেজদিদি। তোমাদের কটি সহোদরাকে এই একটি অক্ষয় বর দিয়ে রেখেছেন, তবু তৃপ্তি নেই?

নীরবালা। সেই জন্যেই তো লোভ বেড়ে গেছে।...

নীরবালা। কাছে তার রই, তবুও
ব্যথা যে রয় পরানে।

অক্ষয়। নীরু, এটা তো আগন্তুকদের লক্ষ্য করে তৈরি হয়নি। কাছের মানুসটি কে বলো তো?

নীরবালা। যে পথিক পথের ভুলে
এল মোর প্রাণের কূলে
পাছে তার ভুল ভেঙে যায়
চলে যায় কোন্ উজানে,
আঁখি মোর ঘুম না জানে।

অক্ষয়। এ তো আমার সঙ্গে মিলছে। কিন্তু ভাই, জেনেশুনেই পথ...

চাকর। দুটি বাবু এসেছে।

শৈলবালা। ঐ বুঝি তারা এল। দিদি আর মা ভাঁড়ারে ব্যস্ত আছেন, তাঁদের অবকাশ হবার পূর্বেই ওদের কোনোমতে বিদায় করে দিয়ো।

অক্ষয়। কী বকশিশ মিলবে।

শৈলবালা। আমরা তোমার সব শালীরা মিলে তোমাকে 'শালীবাহন রাজা' খেতাব দেবে।

অক্ষয়। শালীবাহন দি সেকেন্ড?

শৈলবালা। সেকেন্ড হতে যাব কেন। সে শালীবাহনের নাম ইতিহাস থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তুমি হবে শালীবাহন দি গ্রেট।

অক্ষয়। বল কী। আমার রাজ্যকাল থেকে জগতে নূতন সাল প্রচলিত হবে?

গান

তুমি আমায় করবে মস্ত লোক—
দেবে লিখে রাজার টিকে প্রসন্ন ওই চোখ।...

শৈলবালা। মুখুজ্যেমশায়।

অক্ষয়। (অত্যন্ত ত্রস্ত ভাবে) আবার মুখুজ্যেমশায়! এই বালখিল্য মুনিদের ধ্যানভঙ্গ ব্যাপারে মধ্যে আমি নেই।

শৈলবালা। ধ্যানভঙ্গ আমরা করব। কেবল মুনিকুমারগুলিকে এই বাড়িতে আনা চাই।

অক্ষয়। সভাসুদ্ধ এইখানে উৎপাটিত করে আনতে হবে? যত দুঃসাধ্য কাজ সব এই একটি মাত্র মুখুজ্যেমশায়কে দিয়ে?

শৈলবালা। (হাসিয়া) মহাবীর হবার ঐ তো মুশকিল। যখন গন্ধমাদনের প্রয়োজন হয়েছিল তখন নীল নীল অঙ্গদকে তো কেউ পোঁছেও নি।

অক্ষয়। ওরে পোড়ারমুখী, ত্রেতাযুগের পোড়ামুখোকে ছাড়া আর কোনো উপমাও তোর মনে উদয় হল না? এত প্রেম!...

শৈলবালা। হ্যাঁ গো, এত প্রেম!

অক্ষয়।

গান

পোড়া মনে শুধু পোড়া মুখখানি জাগে রে।
এত আছে লোক, তবু পোড়া চোখে
আর কেহ নাহি লাগে রে।

আচ্ছা, তাই হবে। পঙ্গপাল কটাকে শিখার কাছে তাড়িয়ে নিয়ে আসব। তা হলে চট করে আমাকে একটা পান এনে দাও— তোমার স্বহস্তের রচনা।

শৈলবালা। কেন, দিদির হস্তের—

অক্ষয়। আরে দিদির হস্ত তো জোগাড় করেইছি, নইলে পাণিগ্রহণ কী জন্যে। এখন অন্য পদ্মহস্তগুলির প্রতি দৃষ্টি দেবার অবকাশ পাওয়া গেছে।

শৈলবালা। আচ্ছা গো মশায়। পদ্মহস্ত তোমার পানে একটি চুন মাখিয়ে দেবে যে, পোড়ারমুখ আবার পুড়বে।

অক্ষয়।

গান

যারে মরণদশায় ধরে
সে যে শতবার করে মরে।
পোড়া পতঙ্গ যত পোড়ে তত
আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।...

পুরবালা। চললুম।

অক্ষয়। আমাকে কার হাতে সমর্পণ করে গেলে?

পুরবালা। রসিকদাদার হাতে।

অক্ষয়। মেয়েমানুষ, হস্তান্তর করবার আইন কিছুই জান না। সেই জন্যেই তো বিরহাবস্থায় উপযুক্ত হাত নিজেই খুঁজে নিয়ে আত্মসমর্পণ করতে হয়।

পুরবালা। তোমাকে তো বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হবে না।

অক্ষয়। তা হবে না।—

গান

কার হাতে যে ধরা দেব প্রাণ
তাই ভাবতে বেলা অবসান।
ডান দিকেতে তাকাই যখন বাঁয়ের লাগি কাঁদে রে মন,
বাঁয়ের লাগি ফিরল তখন দক্ষিণেতে পড়ে টান।

আচ্ছা, আমার যেন সান্ত্বনার গুটি দুই-তিন সদুপায় আছে, কিন্তু তুমি—

বিরহযামিনী কেমন যাপিবে,
বিচ্ছেদতাপে যখন তাপিবে
এপাশ ওপাশ বিছানা মাপিবে,
মকরকেতনে কেবলি শাপিবে—

পুরবালা। রক্ষে করো, ও মিলটা ঐখানেই শেষ করো!

অক্ষয়। দুঃখের সময় আমি থামতে পারি নে— কাব্য আপনি বেরোতে থাকে। মিল ভালো না বাস অমিত্রাক্ষর আছে, তুমি যখন বিদেশে থাকবে আমি 'আর্তনাদ-বধ কাব্য' বলে একটা কাব্য লিখব। সখী, তার আরম্ভটা শোনো—

(সাড়ম্বরে) বাষ্পীয় শকটে চড়ি নারীচূড়ামণি
পুরবালা চলি যবে গেলা কাশীধামে
বিকালে, কহ হে দেবী অমৃতভাষিণী
কোন্ বরাঙ্গনে বরি বরমাল্যদানে
যাপিলা বিচ্ছেদমাস শ্যালীত্রয়ীশালী

শ্রীঅক্ষয়!...

অক্ষয়। (বামে নীরকে টানিয়া) এই একটি (দক্ষিণে নৃপকে টানিয়া আনিয়া) এই আর-একটি।

নীরবালা। আর কুড্ডুল বুঝি আজ আসছে?

অক্ষয়। আসছে কেন, এসেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। ঐ-যে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।...

নীরবালা। মুখুজ্যেমশায়, শিব যখন বিবাহসভায় গিয়েছিলেন তখন তাঁর শ্যালীরাও ঐ রকম ভুল করেছিলেন, কিন্তু উমার চোখে তো অন্য রকম ঠেকেছিল। তোমার ভাবনা কীসের, দিদি তোমাকে আধুনিক বলেই জানেন।

অক্ষয়। মূঢ়ে, শিবের যদি শ্যালী থাকত তা হলে কী তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করবার

জন্যে অনঙ্গদেবের দরকার হত। আমার সঙ্গে তাঁর তুলনা?...

নীরবালা। তা, আমরা থাকলেমই-বা, তুমি চিঠি লেখো-না; আমরা কি তোমার কলমের মুখ থেকে কথা কেড়ে নেব নাকি।

অক্ষয়। তোমরা কাছাকাছি থাকলে মনটা এইখানেই মারা যায়, দূরে যিনি আছেন সে পর্যন্ত আর পৌঁছয় না। না, ঠাট্টা নয়, পালাও।

অক্ষয় তবে কি বিরহবেদনা বলে জিনিসটা মহাকবি কালিদাসের সঙ্গে সহমরণে মরেছে।

পুরবালা। তার প্রমাণ তুমি। তোমারও তো স্বাস্থ্যের বিশেষ ব্যাঘাত হয়নি দেখছি।

অক্ষয়। হতে দিল কই। তোমার তিন ভগ্নী মিলে অহরহ আমার কৃশতা নিবারণ করে রেখেছিল— বিরহ যে কাকে বলে সেটা আর কোনো মতেই বুঝতে দিলে না।—

গান

বিরহে মরিব বলে ছিল মনে পণ,
কে তোরা বাহুতে বাঁধি করিলি বারণ।
ভেবেছিনু অশ্রুজলে ডুবিব অকুল-তলে,
কাহার সোনার তরী করিল তারণ।...

অক্ষয়। এসো এসো— উত্তমাধমমধ্যমা এই তিন শ্যালী না হলে আমার—

নীরবালা। উত্তমমধ্যম হয় না।...

জগত্তারিণী। বাবা অক্ষয়, দেখো তো, মেয়েদের নিয়ে আমি কী করি। নেপো বসে বসে কাঁদছে, নীর রেগে অস্থির, সে বলে সে কোনো মতেই বেরোবে না। ভদ্রলোকের ছেলেরা আজ এখনই আসবে, তাদের এখন কী বলে ফেরাব। তুমিই বাপু ওদের শিখিয়ে পড়িয়ে বিবি করে তুলেছে, এখন তুমিই ওদের সামলাও।

(প্রস্থান)

পুরবালা। সত্যি, আমি ওদের রকম দেখে অবাক হয়ে গেছি, ওরা কি মনে করেছে ওরা—

অক্ষয়। বোধ হয় আমাকে ছাড়া আর কাউকে ওরা পছন্দ করছে না; তোমারই সহোদরা কিনা, রুচিটা তোমারই মতো।

পুরবালা। ঠাট্টা রাখো, এখন ঠাট্টার সময় নয়। তুমি ওদের একটু বুঝিয়ে বলবে কিনা বলো। তুমি না বললে ওরা শুনবে না।

অক্ষয়। এত অনুগত! একেই বলে ভগ্নীপতিব্রতা শ্যালী।...

বনফুলের কবিতায় শালি

বনফুলের ব্যঙ্গকবিতায় শালিকে যে ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, তার সপক্ষে কবির তিনটি কবিতা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করে তা নীচে দেওয়া হল—

হেতু

যে শালীটি মোর গৃহিনীর পিঠোপিঠি
তন্বী তরুণী হাবভাবে ঠারে ঠোরে
অচিরাৎ যিনি হইবেন এমএবিটি।
তাঁরও চিঠি আজও পেয়েছি কপাল জোরে
অথচ আমার মন কেন খিটিমিটি
কে কহিয়া দেবে মোরে!

•

দরদ

যাহারে বেসেছি ভালো, বাসিব রে কিংবা
আম, আতা, আনারস, কুল, কচু নিম বা
সায়গল, উমাশলী, ডগলাস্, ময়না
হিটলার হরিজন গারবো বা গয়না...
শাঁসালো শ্বশুর, শালী, প্রেয়সীর ওষ্ঠ,
সাঁতারু, বিমানবীর, নাইডু বা গোষ্ঠ,
খাদি বা টুইল মুগা, আদ্ধি, গরদ গো
সকলেরই তরে মোর গভীর দরদ গো;
কান ধরে উঠ-বোস করাই নিয়ত
উদ্ধার যদি থাকে বাতলায়ে দিও তো।

নাকি

আজকাল ঘরে ঘরে যত বিড়ালের নাকে
লাথি মারিতেছে নাকি ইন্দুর,
সধবারা করিতেছে অনাহারে একাদশী
বিধবারা পরিতেছে সিন্দূর।
গণেশটি উলটায়ে নীল বর্তিকা জ্বালি
যত মাড়োয়ারী নাকি কবিতা লিখিছে খালি,
স্ত্রী ভগিনীকে নাকি বলা চলিবে না শালী,
বিস্তৃতি ঘটিতেছে বিন্দুর।

কবি আনন্দ বাগচীর চোখে শালি

অধ্যাপক কবি অনন্দ বাগচী 'রোমাঞ্চ' পত্রিকার সম্পাদক রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়ের বিয়েতে একটি মজার কবিতা উপহার দিয়েছিলেন। এই কবিতায় কবি শালিদের ওল-তেঁতুলের সঙ্গে তুলনা করেছেন, ওই কবিতার অংশবিশেষ—

'নোটিশ পেলাম চোদ্দ আষাঢ় বিবাহ সমাসন্ন,
বরযাত্রীর লিস্টিতে এই বাঁকুড়াবাসীও গণ্য।
দাদা আমার যাবেন কিসে শকট কিংবা পাল্কী,
ভরসা শুধু দাদার ফিগার নয়ক, মোটেই Bulky
'রোমাঞ্চ' কর Row চাটুজ্জে গোয়েন্দাদের সর্দার
অনায়াসেই পেরিয়ে যাবেন বাসর ঘরের বর্ডার।
ওল-তেঁতুলে শালাশালীর থাকতে পারে চেকপোষ্ট,
দাদার কাছে কিছুটি না, প্রতিদিনের চা টোস্ট।'

শালি নিয়ে শব্দ কোষ

শালি-জামাইবাবুরা কথা বলতে গিয়ে যে সব শব্দ ব্যবহার করেছেন, করেন তা একটু আলাদা। এই শব্দগুলিকেই সংকলন করেননি। যদিও এই সব শব্দের মধ্যে আদি-রসাত্মক শব্দের প্রয়োগ বেশি। চাঁদে গেলে মানুষ হালকা হয়ে যায়— জামাইবাবুর কাছে শালি এলেও জামাইবাবুর মন হালকা হয়ে যায়। অসুস্থ বৃদ্ধ মানুষকেও দেখেছি— শালির সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তার চোখমুখে একটা প্রশান্তির ভাব দেখা গেছে।

জামাইরা শালির সঙ্গে 'ইয়ারকি' করেন। 'ইয়ারকি'-শব্দটির মধ্যে 'ইয়ার' বা বন্ধু শব্দটি রয়েছে। সামাজিক ব্যবস্থার গোড়া থেকেই জামাইবাবু-শালি সম্পর্ক মধুর ও বন্ধু ভাবাপন্ন ছিল, এই কারণেই সম্ভবত যেন বন্ধুর মতো সব রকম শ্লীল ও অশ্লীল বাক্যালাপ করাকে সমাজ মেনে নিয়েছিল, জামাইবাবু-শালিদের শব্দ ভাণ্ডার থেকে শব্দ সংগ্রহ করা গেলে 'শালি-শব্দকোষ' নাম দেওয়া যেত। কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক—

বোনাস-শালি, মশলাদার-অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ করে কথা বলে যে, মধুমতি-শালি, মধুর বাক্য-রসাত্মক কথা। যন্তর— সুন্দরী শালি, রকেট— অত্যাধুনিকা শালি, রসালী-ঢলানী, স্তোত্রপাঠ-রসাত্মক কথা। হউরের ঝি-শালি, হাইহিল-— অহংকারী আধুনিকা শালি, শতনাম— অশ্লীল শব্দ যে সামনে বলে, জামাইবাবুর হাতা-শালি,

ক্ষীর-শালি, বাঘের মাসি-শালি, বগলি শালি— ছোটশালি, জামশা কেলেঙ্কারি— জামাইবাবু-শালি কেলেঙ্কারি, শালি চষা— যে শালি বাড়ি চষে বা ঘুরে বেড়ায়। ধামা-শালি— গর্ভবতী শালি, ফাউগিন্নি-শালি, বড়কুটুম এসেছে— শালি বাড়িতে এসেছে, বাসমতী চাল-শালি, BHMH— বড় হলে মাল হবে, সুন্দরী ছোট শালি প্রসঙ্গে বিভাবতী— যে ছোট শালি BIVA খায়, ত্রিকোণ পার্ক=স্বামী + স্ত্রী + শালি কলিংবেল-শালি, আগুন— যে শালির মেজাজ গরম, আংটি— যে শালির জামাইবাবুকে ঘিরে থাকে, আনারকলি-শালি, মিষ্টি আম-মিষ্টি শালি, আমসি— খিটখিটে শালি, ঔষধ-শালি, ঘর গরম— যে শালি হইচই করে মাতিয়ে রাখে, কেউটা— যে শালি ফোঁস করে ওঠে, খরচা-শালি, গিনি-শালি, ছোটগিন্নি-শালি, যন্তর-শালি, করুণা— যে শালি ছলছল করে কথা বলে, মিটার ডাউন-বিয়ে হয়ে গেছে যে শালির, ডবল-ডেকার— মোটা শালি, ডল-পুতুলের মতো চেহারা যে শালির, নকশা— যে শালি ছন্দে কথা বলে, নিমকি-রসিক নয় যে শালি, জিলিপি— যে শালির মনে প্যাঁচ, নূতন পাখি-পাড়াতুতো শালি, শ্রীদেবী-শালি, র-শালি, সুঁচ— যার কথা সুঁচের মতো বিঁধে, হলুদবাটা-শালি, লেটার বক্স-শালি, লজ্জাবতীগাছ— লাজুক শালি, হাড়িমুখ— যে শালির মুখ গোমড়া, বিএ ফেল— বিয়ে হয়েছে, কিন্তু ডিভোর্স, বিএ পাশ— বিয়ে হয়েছে, বিএ পরীক্ষার্থী— বিয়ে হবে, ধর্মের ষাঁড়— বেশি বয়স হয়েছে, তার বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা নেই যার, গরম গরমি-কামুক কথা, টাটকা মাছ-চনমনে শালি, উচ্ছে—তেতো কথা বলে যে শালি, চারা— ছোটশালি, চিমনি-যে শালির উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ছুটকি-ছোট শালি, কচিডাব— ছোট শালি, শাঁসডাব— ডাগর শালি, পলতে-শালি, পাটকরা— সেজেগুজে থাকে যে শালি, পিছলি— যে শালি পেছন পেছন ঘোরে, বন্‌ধ— যে শালি এলে সব কাজ বন্ধ করে রাখতে হয়, মাল-শালি, পাতিলেবু— যে শালি বেশি রসের কথা বলে, গন্ধলেবু— যে শালি সেজেগুজে থাকে, ন্যাটা মাছ— যে শালি সহজে কাছে আসে না, সাবু— যার মনটি সাদা এমন শালি, ম্যানেজার-শালি, হনুমানজি— যে শালি বাঁদরামি করে, ফারায়— যে শালি চিৎকার করে কথা বলে, খোকাবাবু— সরল সাদাসিদে শালি, শাকালু— নম্র, ভদ্র স্বভাব যে শালির, মিছরি-শালি, চামার শালি— সুন্দরী ভাল শালি।

প্রবাদে শালি

□ অবাক কলি বোঝা ভার,
শালি-লীলা চমৎকার ॥

- আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া,
  জামাইবাবুর শালি চাওয়া ॥

- শালি দেখে বাক্ সরে না।
  গুড় দিয়ে মুড়ি পেট ভরে না ॥

- জামাইবাবু দেখলে শালি,
  গলে যায় হেসে।
  আখ আর সরষে,
  না পিষলে রস কিসে ॥

- আমি করি শালি শালি।
  শ্বশুর বাড়ি শুধু খালি ॥

- ভাবখানা শালিরা সব, গিন্নি কিছু নয়।
  আসল কথা শালিরা নয়, গিন্নিই সব হয় ॥
  কথায় বলে, আমে দুধে এক হয়ে, বাকি পড়ে থাকে।
  আদাড়ের আঁটি বাদাতে যায়, বলব আমি কাকে ॥

- কখনো খেও না— ওলে আর ঘোলে।
  কখনো ভুলো না— শালির বোলে ॥

- কাছে থাকে যতক্ষণ— শালি ভাল ততক্ষণ।

- লেখার জন্য কালি— কুটুমের মধ্যে শালি।

- শালি আধা ঘরওয়ালি।

- গরু কালে বলে, দুধ নয়কো কালো।
  গিন্নি যতই রুক্ষ হোক শালি ভাল ॥

- মায়ের বোন, আমাদের মাসি
  আমরা সবাই ভালবাসি।
  বাবা তাকে দেন গালি
  লুকিয়ে শুনি, বলে শালি।

- আপন বোন ভাত পায় না, শালির তরে মোণ্ডা।

- আপন বোন ভাত না পায়।
  শালির তরে মোণ্ডা যোগায়॥

- বাপের বেটি মুড়কি পায় না
  শালির মোণ্ডা রোজ।

- আ ন পানে চায় না শালি।
  পরকে বলে টেবো গালি॥

- মা বাপ ডেওঢাকনা, শালা শালি নিয়ে ঘরকন্না।
  ঘরে আছে সিদ্ধেশ্বরী, তার কথা নে কর্ম্ম করি॥

- আমরা ডাকি মাসি বলি।
  বাবা, তাকেই ডাকে শালি॥

- মায়ের পুত নয়, শাশুড়ির জামাই।
  বোন নয়, শালির জন্য অফিস কামাই॥

- শালির কথায় মন ভেজে, চিঁড়ে ভেজে কই।
  চিঁড়ে যদি ভেজাতে চাও, আগে আনো দই॥

- মিষ্টি থাকলেই বসে মাছি।
  শালি বলে আমি আছি॥

রসিক মন হারিয়ে গেছে

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অধ্যাপককে প্রশ্ন করেছিলাম, আপনার শ্বশুর মশায়ের পাঁচটি কন্যা— আপনার স্ত্রী, চার শালি, কিন্তু আপনার তো এক মেয়ে। মেয়ের স্বামীর তো দুঃখ হবে শালি পাবে না বলে, এ বিষয়ে আপনার মত কী? উত্তরে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয় বলেছিলেন, এখনকার ছেলে-মেয়েদের মধ্যে আগের দিনের মতো রসবোধ কোথায়? আমাদের সেই রসিক মনের অপমৃত্যু তো হয়নি, তাই মাঝে মধ্যে ক্লাসে দু'-একটা কথা বলে ফেলি— রসবোধ নেই বলে কেউ বোঝেই না। এখনকার ছেলেমেয়েরা সকলেই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। মেয়ের মা-বাবা মনে করে নির্ঝঞ্ঝাট একলার ঘরে মেয়ে দেব। আবার ছেলের বাড়ি থেকেও প্রথমে দেখে অবিবাহিত ননদ আছে কি না— এই তো অবস্থা! আগের দিনে ছেলের বাড়ির মানুষ জানত মেয়ে শ্বশুরের, সে নিয়ে জামাইয়ের ভাবনা কী। সেকালেব

মানুষের মন এত আত্মকেন্দ্রিক ও বেরসিক ছিল না বলেই শালি-জামাইবাবুদের রসিকতার একটা মাধুর্য ছিল— যা আজ আর নেই। হওয়াও সম্ভব নয়। এরা একা থাকতে ভালবাসে— মা বাবাই এদের কাছে বোঝা, শালি তো অনেক দূরের কথা।

শালি শুনে কালী

অবিবাহিত এক কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারকে প্রশ্ন করেছিলাম, শালি নাকি চিনির চেয়ে মিষ্টি, আপনি কি এই মিষ্টি শালিসহ বিয়ে করতে চান? উত্তরে তিনি বলেন, না। আমার কাছে শালি মানে আমি কালী। কালীমায়ের মূর্তির সঙ্গে তখন নিজেকে এক মনে হয়। স্ত্রীকে পদতলে শুইয়ে, শালিদের গলায় ঝুলিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে জিভ কেটে আমি ভাবি এ কী দেখলাম! আমার চারটে হাত তো এদের জন্যই খোলা রাখতে হবে। বেশি শালি মানে বেশি খরচ। চার হাতের এক হাত শালিদের সিনেমা দেখার জন্য, অন্য হাত বেড়ানোর জন্য, আর এক হাত পূজা-পার্বনের কেনাকাটার জন্য এবং অন্য হাত শালিদের বিয়ের খরচের জন্য। শালিদের বিয়ের জন্য রাখা হাত অবশ্য খালি নয়। বাটি হাতে রাখতে হবে শালির বিয়েতে দু' হাতে খরচ করতে লোন করতে হবে। সেই জন্যই আমি বলি—

কাজ নেই মা নিয়ে শালি।
আমি নিজে হতে চাই না কালী।।

আসলে আগে শালিদের কাছ থেকে জামাইবাবুরা যে আনন্দ পেত, আমরা এখন আমাদের ক্লাসের বান্ধবীদের কাছ থেকেই তা পাই— তা হলে শালি কেন?

আজ 'নেই'-এর যুগ। শোলোক বলা ঠাকুমা নেই, নেই হাস্য পরিহাসপ্রিয় মিষ্টি শালির মিষ্টি কথা। রোবট-কম্পুটারের যুগে সবাই নাকি যান্ত্রিক হয়ে গেছে। মনের রস শুকিয়ে গেছে। এক রসিক মানুষের কথা শুনি। দুই বন্ধ নেপাল আর মৃদুল অনেক দিন পরে দেখা হতেই—

মৃদুল— কি রে, শরীর এত খারাপ কেন?

নেপাল— সুগার ধরা পড়েছে।

মৃদুল— সুগার ধরা পড়েছে? তোর ক'টা শালি?

নেপাল— ধুর, সুগারের সঙ্গে শালির সম্পর্ক কী?

মৃদুল— আছে, বল ক'টা।

নেপাল— না, আমার শালি নেই।

মৃদুল— তাই বল, আমি যা ভেবেছি তাই। দ্যাখ, আগের দিনে তোর আমার

বাপ-ঠাকুরদাদের ক'জনের সুগার ছিল বল তো। আগে সকলেরই অনেকগুলো করে শালি ছিল, শরীরের মিষ্টি শালিদের জন্য মুখমিষ্টিতে তা বেরিয়ে যেত, তাই ওঁদের সুগার হত না। এখন একটি সন্তান— শালি নেই, মিষ্টি শরীরের মধ্যেই থাকে, তাই ঘরে ঘরে সুগার।

কথা শেষ হওয়ার আগেই বাস এল, মৃদুল বাসে উঠে চলে গেল, নেপাল শুধু শুধু ভাবতে থাকল, যাদের সুগার তাদের সকলেরই কি শালি নেই!

হ্যাঁ, সংসারে শালির আকাল শুরু হয়েছে, এই লেখা ছাপার পর গবেষণা শুরু হবে, কবে থেকে এই আকালের শুরু। তবে এই মুহূর্তে বলা যায় 'হাম দো-হামারা এক' এই চিন্তা কর্তা-গিন্নিদের মাথায় যে দিন ঢুকে গেছে সে দিন থেকে এই আকাল। এক ছেলে বা এক মেয়ে, এখন পাবে কোথায়, ছয়-সাত শালিকে নিয়ে লেখা মজার পাঁচালি—

যার নেই ঘরে শালি,	করে হায় হায়।
এক শালি সব সময়,	ঘোরে পায় পায়।।
দুই শালি আছে যার,	আনন্দ অপার।
তিন মন রাখা,	কঠিন ব্যাপার।।
চার শালি থাকলে পরে,	সব মধুময়।
পাঁচ শালির আদর পেয়ে,	জামাই বাঁদর হয়।।
ছয় শালি আছে শুনলে,	বলে হাফ ডজন।
হেভিওয়েট ভাগ্য তোর,	বলে বন্ধুজন।।
হাফ ডজন একটা ফাউ,	সাত শালিতে বলে,
এমন শালি ভাগ্য হয়,	অনেক পুণ্যের ফলে।।

মোটামুটি সত্তর দশক থেকে শ্বশুরবাড়ি শালি-শূন্য হতে শুরু করেছে— এই দশকে 'তুতো' শালিতে এসে ঠেকেছে— অর্থাৎ খুড়তুতো, জ্যাঠাতুতো, পাড়াতুতো। একবিংশ শতাব্দী নাকি বিজ্ঞানের শতাব্দী, বিজ্ঞান তখন রাজত্ব করবে। বিজ্ঞানের কল্যাণে পাওয়া যাবে 'রোবট শালি', রঙ্গ-রসিকতার একটা ক্যাসেট রোবটকে দিয়ে হাস্য-রসিক রোবট শালি পেয়ে যাবে মানুষেরা। শালি নিয়ে সাতকাহন কথা তো হল শেষ বলি—

উড়কি ধানের মুড়কি আর শালি ধানের চিঁড়ে।
এই সব হারিয়ে গেছে বহু মানুষের ভিড়ে।।
শুধু মিষ্টি মধুর ইয়ার্কির কথা উঠলে পড়ে।

মধুর সম্পর্কের শালি নামটি সামনে এসে পড়ে ।।
রসের কথা নিয়ে একদিন সংসার ছিল ভরা।
মনের রস শুকিয়ে দিয়ে হয়ে গেছে খরা ।।
শালি এখন বোন হয়েছে, জামাই হয়েছে দাদা।
রঙিন মন হারিয়ে গিয়ে, এখন সব হয়েছে সাদা ।।
এখনকার মতো শালিকথা ফুরোল— নটে গাছটি মুড়োল।

সহায়ক গ্রন্থ

১. লৌকিক শব্দকোষ (১ম খণ্ড), কামিনীকুমার রায়

২. আঞ্চলিক ও কথ্য ভাষার অভিধান, ড. দীপক দে

৩. ছাত্রবোধ অভিধান অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষার সুবৃহৎ শব্দকোষ, আশুতোষ দেব সঙ্কলিত।

৪. যম দত্তের ডায়ারী ও অন্যান্য রচনা/যতীন্দ্রমোহন দত্ত, সংকলন ও সম্পাদনা কৃশানু ভট্টাচার্য ২০০৬

৫. স্মৃতিতে সেকাল/আমাদের লোক আমাদের কথা, যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক পত্রিকা ৭ বর্ষ ১/2 সংখ্যা। বইয়ের আকারে প্রকাশ মার্কসম্যান মিডিয়া সার্ভিসেস, জানুয়ারি ২০০১

৬. প্রাণকৃষ্ণ দত্ত/কলিকাতার ইতিবৃত্ত ও অন্যান্য রচনা, দেবাশিস বসু সম্পাদিত, পুস্তক বিপণি, ১৯৯১

৭. অমৃতলাল বসুর স্মৃতি ও আত্মস্মৃতি, সম্পাদনা ড. অরুণকুমার মিত্র, সাহিত্যলোক, ১৯৮২

৮. প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ, সুকুমারী ভট্টাচার্য, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬

৯. মনুসংহিতা, বঙ্গানুবাদ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৯

১০. কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও ...., মহেন্দ্রলাল দত্ত, দি মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, ১৯৮৩

১১. সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম ও ২য় খণ্ড, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ১৩৮৪

১২. প্রভাতরঞ্জনের ব্যাকরণ বিজ্ঞান ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড, প্রভাতরঞ্জন সরকার, আনন্দমার্গ প্রকাশন, ১৯৮৯

১৩. আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি

১৪. বিয়ের পদ্য (বিশেষ ক্রোড়পত্র), অতিথি পত্রিকা, ১৩৯৫

১৫. ছন্দোগ-দশবিধ সংস্কারবিধি

অলঙ্কার

অ

অঙ্গুলিমুদ্রা অঙ্গুলির আভরণ। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে [২১/১৬] এই অলংকারের উল্লেখ রয়েছে।

অঙ্গুলীয় অঙ্গুলিতে ধার্য আভরণ। একেই 'অঙ্গুলিমুদ্রা' বলে। অঙ্গুলিমুদ্রাতে অক্ষর খোদাই করা থাকত। এই অঙ্গুলিমুদ্রা নিয়ে রচিত হয়েছে বিখ্যাত 'মুদ্রারাক্ষস' নাটক। অঙ্গুলিমুদ্রা হস্তান্তরিত হওয়ার ফলেই চাণক্য-প্রতিদ্বন্দ্বী রাক্ষসের সমস্ত উদ্যম বিফলে গিয়েছিল। দুষ্মন্তর দেওয়া 'অঙ্গুলিমুদ্রা' হারিয়ে ফেলায় শকুন্তলাকে অশেষ দুঃখ পেতে হয়েছিল। শকুন্তলা [৬/৪/৮৪] নাটকটির মূল নায়ক 'অঙ্গুলিমুদ্রা'। জমিদারি দলিলপত্রে যে নামের মোহর অঙ্কিত হত তা অঙ্গুলিমুদ্রার রীতি থেকেই এসেছে। একে অঙ্গুরীয় বা 'আংটি'ও বলা হয়। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' [১৮৫৭] নামে একটি উপন্যাস আছে।

অঙ্গদ রামায়ণে [অযোধ্যাকাণ্ড ৩২/৭/৮/৫২] এই অলংকারকে 'প্রধান' এবং 'বিচিত্র' বিশেষণ দেওয়া হয়েছে। বাহুর উর্ধ্বাংশে ব্যবহৃত অলংকার। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে [২১/১৬] এর উল্লেখ রয়েছে।

অপেশ্রুক কর্ণের আভরণ। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে [২১/২৪] এর উল্লেখ দেখা যায়।

অর্ধমানবক দ্বাদশ লহরযুক্ত দু হাত পরিমিত মুক্তাহার। বৃহৎসংহিতায় এর উল্লেখ রয়েছে।

অনন্ত বাহুর উর্ধ্বাংশে ব্যবহৃত শক্ত বেড়ি জাতীয় অলংকার। প্রাচীন কেয়ূরের আধুনিক রূপ। 'স্ত্রীলোকের স্বর্ণময় করভূষণ' সর্পাকৃতি বলিয়া— শেষ নাগের অনুসূত্রে [হরিচরণ] ; 'বাহুর অলংকার তাগা' [জ্ঞানেন্দ্রমোহন]

অভিজাত গয়না সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাদের ব্যবহৃত অলংকার।

আ

আশীর্বাদ বিবাহের কথাবার্তা পাকা হয়ে গেলে বরপক্ষ থেকে কনেকে বা

কন্যাপক্ষের থেকে বরকে স্বর্ণালংকার দিয়ে আশীর্বাদ করার যে অনুষ্ঠান।

আবেধ্য ভরতের নাট্যশাস্ত্রে [২১/১২] দেহের আভরণকে যে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে তার মধ্যে একটি। কর্ণাভরণ, কুণ্ডল প্রভৃতি আবেধ্য অলঙ্কার।

আরোপ্য ভরতের নাট্যশাস্ত্রে [২১/১১] উল্লিখিত যে চার ভাগের আভরণের প্রসঙ্গ রয়েছে তার মধ্যে একটি। স্বর্ণসূত্র ও বিবিধ হার আরোপ্য।

আভরণ ভূষণ, অলংকার। এই আভরণ চার প্রকার। যেমন, কুণ্ডল প্রভৃতি আবেধ্য বা বেধ্য; অঙ্গদ, তাবিজ ইত্যাদি গহনা বন্ধনীয়; আরোপ্য: হার, নেকলেস ইত্যাদি; এবং ক্ষেপ্য/আক্ষেপ্য: নূপুর মল ইত্যাদি।

আবাপক কনুইয়ের নিম্নভাবে ধারণীয় অলংকার। অন্য নাম বলয়।

আড়াইপেঁচি কারুকার্যহীন নিরেট সোনার একটু মোটা তার [রডের মতো] আড়াই প্যাঁচ ঘুরিয়ে তৈরি হাতের অলঙ্কার।

আভ্যঙ্গ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যযুগীয় সূর্যমূর্তির অঙ্গে এই নামে কটিবন্ধের উল্লেখ রয়েছে।

আঁটাবিছা ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলে চন্দ্রহারের আঞ্চলিক নাম।

আমলেট উপর হাতের গয়না। শব্দটি ইংরেজি Armlet-এর বিকৃত উচ্চারণ। এর অর্থ 'বাহুর আভরণ বিশেষ অনন্ত।'

ই

ইন্দুচ্ছন্দ বৃহৎসংহিতায় 'মুক্তারচিতাভরণ্ সংজ্ঞার' [৩১] প্রকরণে 'ইন্দুচ্ছন্দ' নামে এক সহস্র আটটি লহরের হারকে দেবতার ভূষণ বলা হয়েছে। এই হারের লহরগুলি চার হাতের মতো হবে।

উ

উরঃসূত্রিকা কিঞ্চিৎ লম্বা কণ্ঠলগ্ন আভরণ, এই অলংকার মুক্তোর তৈরি। অমরকোষে [মনুষ্যবর্গ, ১০৪ কারিকা] এর উল্লেখ রয়েছে। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গীয় শব্দকোষে' এর অর্থ করেছেন— 'মুক্তাহার'।

উৎক্ষিপ্তিকা কর্ণের পৃষ্ঠ ভাগে ধারণীয় প্রাচীন যুগের অলংকার।

ঊ

ঊর্মিকা অঙ্গুলিতে ধার্য আভরণ। ঊর্মির অর্থাৎ তরঙ্গের তুল্য, এই অর্থে 'কন্' প্রত্যয় দ্বারা ঊর্মিকা শব্দটির সৃষ্টি। সুতরাং এই আংটি আকারে তরঙ্গ-চিহ্ন যুক্ত ছিল মনে

করা হয়। অমরকোষে [মনুষ্যবর্গ, ১০৭] এর উল্লেখ দেখা যায়। 'অঙ্গুরীয়ক' [হরিচরণ, জ্ঞানেন্দ্রমোহন]

এ

একাবলী যে হারে মুক্তো ব্যবহার করা হয় না, তেমন এক লহরের হারের নাম। বৃহৎসংহিতায় [৮০/৩২] এর উল্লেখ আছে। বিক্রমোর্বশী নাটকে [১ম অধ্যায়] উর্বশী যে একাবলী হার পরেছিল তাকে 'বৈজয়ন্তিকা' বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে। কেবল মুক্তা দিয়ে তৈরি এক 'নরি'/'লহর'-এর হার।

ও

ওড্ডিয়ানাম উত্তর প্রদেশে চন্দ্রহারের আঞ্চলিক নাম।

ক

কুলপিয়া শঙ্খ কুলপিয়ার অর্থ খিল দেওয়া শাঁখা। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে কুলপিয়া শঙ্খের উল্লেখ রয়েছে— 'পরি দিব্য পাটশাড়ি, কনক রচিত চুড়ি, দুই করে কুলপিয়া শঙ্খ।' 'কুলুপ' অর্থ কুঞ্জী বা তালা। ফারসি 'কুলুফ' শব্দজ।

কাটরি ওড়িশায় প্রচলিত বলয়। রুপো, পিতল, ব্রোঞ্জে তৈরি যে কোনও একটি ধাতুর অলংকার।

কাচা রুপো, পিতল, ব্রোঞ্জে তৈরি ওড়িশায় প্রচলিত বলয়।

কাটাবাজু হাতের গয়না।

কটিবন্ধ কোমর/নিতম্বদেশের অলংকার।

কাঞ্চীদাম স্ত্রী কটিতে ধারণীয় সারি সারি প্রলম্বিত ছোট ছোট ঘণ্টিযুক্ত অলংকার।

করধানি বিহারের দ্বারভাঙায় এই নামে পরিচিত কটিভূষণের এক পাশ থেকে শিকলে ঝোলানো অলংকার বিশেষ।

কমলপাশা উত্তর প্রদেশে চন্দ্রহারের আঞ্চলিক নাম।

কনে খোঁপার গয়না বহু গুছির বুনটে চ্যাপটা গড়নে যে বেণী মাথার পিছনে পাক ঘুরিয়ে এনে কাঁটা গুঁজে খোঁপা তৈরি করে তাকে সোনার বা রুপোর নানান আভরণে সজ্জিত করা হয়।

কাঞ্চী স্ত্রী কটিতে ধারণীয় আভরণ। এক লহরের [এক যষ্টি] কটিভূষণ।

কলাপ স্ত্রী কটিতে ধারণীয় আভরণ। পঞ্চবিংশতি অর্থাৎ পঁচিশ লহরের কটিভূষণ।

কিঙ্কিণী শরীরের মধ্যভাগে ব্যবহারযোগ্য অলংকার। কবিকঙ্কণ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে লিখেছেন: 'ত্রিবলী বলিত মাঝে, কনক কিঙ্কণী সাজে, উরুযুগ রম্ভার সমান।'

কেয়ূর বাহুর ঊর্ধ্বাংশে ব্যবহৃত অলংকার। কবি বাণভট্ট রাজা শূদ্রকের বাহুশিখর অর্থাৎ বাহুর ঊর্ধ্বভাগকে কেয়ূরের দ্বারা পরিশোভিত করিয়েছেন। সেই কেয়ূর দেখে লোকে তাকে সর্প বলে ভ্রম করত। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে [২১/১৭] এর উল্লেখ দেখা যায়। রামায়ণে [অযোধ্যাকাণ্ড ৩২/৭/৮/৫২] একে 'শুভ' বিশেষণ দেওয়া হয়েছে।

কটক কনুইয়ের নিম্নভাগে ধারণীয় অলংকার।

কঙ্কণ কনুইয়ের সব থেকে নিম্নভাগের গহনা, বলয়ের অধোদেশে কঙ্কণের অধিকার। এই কারণে কঙ্কণের 'করভূষণ' নামেও পরিচয় দেওয়া হয়। মধ্যযুগের সংস্কৃত সাহিত্যে কঙ্কণের উল্লেখ প্রচুর পাওয়া যায়। ভবভূতি 'উত্তরচরিত'-এ জানকীর হস্তে কমনীয় কঙ্কণের বর্ণনা করেছেন। আবার তিনিই 'মহাবীরচরিত'-এ সীতার পরিণয় সময়ে রামচন্দ্রকে কঙ্কণ মোচনের কারণে অন্তঃপুরে প্রেরণ করে সেকালের একটি স্ত্রী-আচারের উল্লেখ করেছেন। এর আকৃতি ও কারুকার্য অনেক রকমের হয়। এই ভূষণটি থেকে ওঠা কন্ কন্ ধ্বনির কারণে 'কঙ্কণ' নামকরণ হয়েছে।

কুণ্ডল কর্ণের আভরণ। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে [২১/১৫] এর উল্লেখ রয়েছে। অন্যত্র [২১/২০] এটিকে 'দেবতার ও পার্থিব রমণীদের আভরণ' বলে মন্তব্য করেছেন। রামায়ণে [অযোধ্যাকাণ্ড ৩২/৭/৮/৫২] এই অলংকারকে প্রধান ও 'বিচিত্র' বিশেষণ দেওয়া হয়েছে। কুণ্ডল কর্ণের নিম্নভাগে ব্যবহার হয়। 'শিশুপাল বধ' কাব্যে কৃষ্ণের কুণ্ডলে পদ্মরাগ মণির উল্লেখ রয়েছে।

কর্ণিকা নাট্যাচার্য ভরত [১২/২২] একে কর্ণের আভরণ বলেছেন। কর্ণিকা কর্ণের উপরিভাগে পরার অলংকার।

কর্ণবলয় কর্ণের আভরণ। ভরতের সময়ের [২১/২২]। কানের বালা।

কর্ণমুদ্রা ভরতের সময়ের [২১/২৪] কানের অলংকার।

কর্ণোৎপল কর্ণের অলংকার। ভরতের সময়ের [২১/২৪]।

কচধার্য মেঘদূতের টীকায় [উত্তরমেঘ, ১৩ টীকা] মল্লিনাথ 'রসাকর' নামে গ্রন্থ থেকে যে প্রমাণ উদ্ধার করেছেন সেখানে রমণীদের চার প্রকার ভূষণের উল্লেখ রয়েছে। তার মধ্যে কচধার্য একটি।

কর্ণান্দু কর্ণের পৃষ্ঠভাগে ধারণীয় অলঙ্কার।

কণ্ঠী অমরকোষে [মনুষ্যবর্গ, ১০৪ কারিকা] গ্রীবার এই আভরণকে 'গ্রৈবেয়ক' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

ক্ষেপ্য ভরতের নাট্যশাস্ত্রে [২১/১৩] দেহের আভরণকে যে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে তার মধ্যে একটি। নূপুর প্রভৃতি ক্ষেপ্য নামে পরিচিত।

খ

খণ্ডপত্র ভরতের [২১/১৯] সময়ের এই 'আভরণ দেবতা ও পার্থিব রমণীদের ব্যবহার্য বলে কথিত।

খড়্গপত্র ভরতের [২১/২০] সময়ের অলংকার।

খাড়ু, খাড়ুয়া হাতের অলংকার। এটি হাতে গলিয়ে পরতে হয়, এতে কবজা বা খিলের কোনও ব্যবস্থা নেই। এই অলংকার পায়েও পরে। পদাভরণ এই অলংকারটি ওড়িশায় খাড়ুয়ালু, বিহারে খাড়ুয়া নামে পরিচিত। উদাহরণ: ১, 'সবে মাত্র দুই গাছা খাড়ু ছিল হাতে'— ঈশ্বর গুপ্ত। ২. 'শায়ন [শ্রাবণ] মাসের মলুয়া পায়ের খাড়ু বেচে'— পূর্ববঙ্গ গীতিকা।

খোঁপার ফুল কেশপাশ সজ্জিত করার স্বর্ণালংকার।

গ

গবাক্ষী ভরতের নাট্যশাস্ত্রে [২১/২০] এই অলংকারটিকে 'দেবতার ও পার্থিব রমণীদের' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

গ্রৈবেয়ক অমরকোষে [মনুষ্যবর্গ, ১০৪ কারিকা] কণ্ঠলগ্ন আভরণকে [কণ্ঠী, তাবিজ প্রভৃতি] এই নামে অভিহিত করা হয়েছে। গ্রীবায় [Neck] পরে যে অলংকার— চিকও হতে পারে।

গোঁপহার এই কণ্ঠলগ্ন আভরণটি অমরকোষে বর্ণিত গ্রৈবেয়কের অন্তর্গত।

গোট স্ত্রীলোকের কটিভূষণ— ['কোমরেতে কিবা শোভা...গোটে']।

গোট হার গোটের মতো গাঁথা হার বিশেষ।

গুৎস বত্রিশ লহরযুক্ত [নরি] হারের নাম, গুৎস থেকে পরবর্তীকালে 'গুচ্ছহার' শব্দটি এসেছে।

গুৎসার্ধ চব্বিশ লহরযুক্ত [নরি] হারের নাম। বৃহৎসংহিতার মতে বিংশতিলহর যুক্তের এই নাম।

গোস্তন চৌত্রিশ লহরযুক্ত হারের নাম— [মতান্তরে ৬৪ নরির হার]।

গুলুসু ওড়িশায় প্রচলিত বলয়। রুপো, পিতল, ব্রোঞ্জ থেকে এই অলংকার তৈরি হয়।

চ

চালচিত্র গয়না বিয়ের কনের খোঁপায় স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করার স্থান থাকে কম। তাই সেকালে একুশগুছির বেণী রচনা করে সেই বেণী চ্যাপটা গড়নে পাক ঘুরিয়ে

মাথার পেছনে ও ঊর্ধ্বে প্রতিমার চালচিত্রের মতো করে খোঁপাটি বেঁধে তাকে স্বর্ণালঙ্কারে সাজানো হত।

চাটুকার এক হাত প্রমাণ হারের মধ্যভাগে 'তরলক' অর্থাৎ সোনা দিয়ে বাঁধানো মণি থাকলে সেই হারের নাম 'চাটুকার'। বৃহৎসংহিতায় এর উল্লেখ রয়েছে।

চুটকি মহেন্দ্রনাথ দত্ত জানিয়েছেন, 'সধবা স্ত্রীলোকেরা পায়ের বুড়ো আঙুলে ঘুঙুরওয়ালা চুটকি পরিত।'

চন্দ্রহার মহেন্দ্রনাথ দত্তের কথায় 'উড়ে বাবাজিরা অনেক দিন পর্যন্ত রূপার চন্দ্রহার পরেছিল, এখন পরে কিনা জানি না। আমরা ছেলেবেলায় বলিতাম 'দুলিছে দড়মড় কোমরে চন্দ্রহার।'

চিক কণ্ঠলগ্ন স্বর্ণ আভরণ। কারুকার্য খচিত এবং পরস্পরের সঙ্গে খিল দিয়া যুক্ত চৌকো খামিগুলি গলার শুধু সামনের দিকে পরা হয়। 'বুড়িদের গলায় চিক দেখি নাই... আমাদের শৈশবে প্রথম চিক উঠিল'— এ কথা বলেছেন বিবেকানন্দের ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়। এই আভরণটি অমরকোষে [মনুষ্যবর্গ, ১০৪ কারিকা] বর্ণিত গ্রৈবেয়কের অন্তর্গত। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গলক্ষ্মীর ঝাঁপি' [১৩৮৬] গ্রন্থের ৪৮-৪৯ পৃষ্ঠার মধ্যে দেওয়া আলোকচিত্রে 'চিক'-এর ছবি ছেপে লিখেছেন 'ইহা মুসলমানী রীতির গহনা' কিন্তু হরিচরণ বলছেন 'চিক'— সংস্কৃত 'চিকমালিকা' শব্দ থেকে জাত। উদাহরণ: 'গায়ে আলো করে ঝিকমিক। যেন পরেছে হীরার চিক।।' 'শিশু' রবীন্দ্রনাথ।

চুড়ি নিচের হাতের সুপরিচিত গয়না।

চুড়িয়া [হিন্দী] প্রচলিত চুড়ি।

চূড়ামণি মস্তকের আভরণ। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে [২১/১৫] এই অলংকারের উল্লেখ রয়েছে। ভরত অন্যত্র [২১/১৯] এই অলংকার 'দেবতার ও পার্থিব রমণীদের' পরিধান-জন্য বলে মন্তব্য করেছেন।

চূড়/চুর দুই প্রান্তের খাড়া অংশে পাতলা শিরাতোলা বা অন্য রকম নকশামণ্ডিত এই অলংকারগুলির মাঝের অংশে পাতলা সোনার পাতের গায়ে নানান নকশা থাকে। খিলযুক্ত থাকায় খোলা পরার অসুবিধা হয় না। কারিগরি নকশায় উচ্চ নৈপুণ্যের পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। 'প্রকোষ্ঠে হীরকমণ্ডিত চুড়'— বঙ্কিমচন্দ্র।

চামেলি কণ্ঠহার। হাঁসুলি জাতীয় উত্তর ভারতীয় অলংকার।

জ

জবলোলকুণ্ডলা কানে আধুনিক দুলের মতো ঝুলে থাকা অলংকার। শ্রীমদ্‌ভাগবতে

[দশম স্কন্ধ ২৯/৪] এর উল্লেখ রয়েছে।

জাদাবিল্ল তামিলনাড়ুর সালেম অঞ্চলে মেয়েদের মাথায় ব্যবহৃত চুলের কাঁটা।

জশম নমনীয় গড়নের অলংকার, যার দুই প্রান্ত আংটা কিংবা ফিতের সাহায্যে একত্র করা যায়। এটি ওপর হাতের অলংকার। জওসম [ফারসি জউশন্] বানানেও পাওয়া যায়। দেবেন্দ্রনাথ সেনের অশোকগুচ্ছ-র ৬৩নং কবিতায় পাচ্ছি 'জওসম চৌদানি'।

জড়োয়া গয়না মূল্যবান পাথর বসানো সোনার গয়না।

জিরে গোট জিরের আকারে। সাদৃশ্যে— 'বিছা গোট', 'ডোরিয়া গোট' [বাঙ্গালা শব্দকোষ— যোগেশচন্দ্র] হরিচরণ বলছেন; 'গোটহার— গোটের মত গাঁথা হার।'

ঝ

ঝুমকা/ঝুমকো/ঝুমুকা প্রাচীন কালের কানের গয়নার মধ্যে ঝুমকোর নামের উল্লেখ করেছেন মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়। ঝুমকা ফুলের মতো স্বর্ণের কর্ণভূষণ। 'ঝুমুকা— যার চারুমূর্তি গড়ি, সবর্ণে প্রমদা কর্ণে পরে মহাদরে'— মাইকেল।

ঝিকা বিহারের হাজারিবাগ অঞ্চলে রূপা বা পিতলের তৈরি এক প্রকার সুদৃশ্য মাথার কাঁটা।

ঝাঁপা কেশ সজ্জার অলংকার। রামেশ্বর শিবায়ন কাব্যে এই অলংকারের উল্লেখ রয়েছে এই ভাবে— 'ভুবন মোহন খোঁপা, সুন্ধী সালুকের ঝাঁপা।'— শিবায়ন ১১০। 'খোপার মত বেণীর বা স্ত্রীভূষণের সজ্জাদ্রব্য বিশেষ [তাবিজ প্রভৃতির গ্রন্থণ সূত্রের ও বেণীর অগ্রে ইহা লম্বিত থাকে'— হরিচরণ] উদাহরণ: ১. তুমি তাবিজ, আমি ঝাঁপা'— দাশরথি ২১২৩। ২. 'অতি বৃদ্ধ নয়নে পড়েছে ভুরু ঝাঁপা'— ধর্মমঙ্গল। ৩. 'তুলিকা মশারি সাজে ঝাঁপা'— কবিকঙ্কণ। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গলক্ষ্মীর ঝাঁপি' গ্রন্থের মধ্যে দেওয়া আলোকচিত্রে 'ঝাঁপা'র ছবি ছেপে লিখেছেন 'ইহা মুসলমানী রীতির গহনা।'

ট

টানা নথ নাকের অলংকারের সঙ্গে চেন দিয়ে চুলের সঙ্গে টানা দেওয়া গয়না।

ড

ডবল হাব গলার এই অলংকারটি পরলে মনে হবে দুটি হার পরেছে।

ডবল বিছে দুটি হারের অনুরূপ একটি গলার অলংকার।

ডিকুরুলি ওড়িশার প্রচলিত বলয়। রুপো-পিতল-ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি অলংকার।

ঢ

ঢেঁড়ি-ঝুমকো 'আফিমের বীজকোষ সদৃশ স্ত্রীলোকের কর্ণভূষণ বিশেষ' ['ব্যবহারিক শব্দকোষ'— আবদুল ওদুদ]। ব্যবহার: 'কর্ণেতে তুলিয়া দিল মাণিক্যের ঢেঁড়ি'— 'বাইশা' ১৫৭ পৃষ্ঠা।

ত

তরল কটির এই আভরণের কথা রয়েছে ভরতের নাট্যশাস্ত্রে [২১/১৮]।

তালপত্র আচার্য হেমচন্দ্র কচি তালপাতায় তৈরি এই অলংকারকে কুণ্ডল স্থানের বা কানের অলংকার বলেছেন।

তাটঙ্ক/তাড়ঙ্ক এই অলংকারটিও কুণ্ডলস্থানের আভরণ, এই অভিমত আচার্য হেমচন্দ্রের। তাটঙ্ক কর্ণেও ব্যবহৃত হত। বাসবদত্তাতে অস্তগমনোন্মুখ শশাঙ্কদেব পশ্চিম পর্বতরূপ উপাধানে সুখ নিহিত মস্তক পশ্চিম দিগ্‌বধূর রজত-তাটঙ্ক রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তাটঙ্ক অবশ্যই রজত ও রত্ন প্রভৃতি উপাদানে তৈরি হত। একে কাণতড়কা বা কাণবালাও বলা হয়।

তাবিজ অমরকোষে [মনুষ্যবর্গ ১০৪ কারিকা] এই কণ্ঠলগ্ন আভরণকে 'গ্রৈবেয়ক' নামে অভিহিত করেছেন। অন্যতর অর্থে পাচ্ছি ভূতাদির উপদ্রবনিবারক মন্ত্রপূত কবচ। বাহুভূষণ [হিন্দি, তাবিজ], অঙ্গে ধারণযোগ্য কবচ; 'মিয়াঁ দিল লিখিয়া তাবিজ বোঝা বোঝা'— ভক্তমাল গ্রন্থ'।

তরলক হারের মধ্যভাগে সোনা দিয়ে বাঁধানো মণির লকেট। বৃহৎসংহিতায় এই লকেটের নাম 'তরলক'। হারমধ্যমণি। 'হারাবলী হৃদয়ে তরল'— চৈতন্যচরিতামৃত। ১১৭।

ত্রিসর গ্রীবার ও বক্ষের আভরণ। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে [২১/১৭] এর উল্লেখ আছে।

ত্রিকন্টক বাণভট্ট হর্ষচরিতে দধীচির কর্ণে এই আভরণ ছিল বলে লিখেছেন। এটি কদম্বকোরকসদৃশ স্থূল মুক্তাফলদ্বয় এবং তদুভয়ের মধ্যস্থিত মরকতমণির উপাদানে তৈরি।

তুলাকোটি প্রাচীনকালের অলংকার। শব্দশূন্য পাদভূষণ আর শব্দকারী পাদভূষণের নাম মঞ্জীর বা নূপুর। দৃষ্টান্ত: 'রজত পাসলি দুটি, পরে দিব্য তুলাকোটি, বাহুবিভূষণ ঝলমলি'— কবিকঙ্কণ।

তারপাশা প্রাচীন কলকাতায় ব্যবহৃত হত। কানের গয়না। এর কথা মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন।

তারা হার এই হার প্রসঙ্গে মহেন্দ্রনাথ দত্ত জানিয়েছেন: "এক রকম 'তারা হার'

উঠিয়াছিল। সোনার একটা তার— আলপিনের মাথা চেপ্টা করিলে যেমন হয় সেই রকম চেপ্টা মাথা, তার ফাঁপা করিয়া বিনান যেন একটা বিড়ালের লেজ। তবে তারের মধ্যে সব ফাঁক— এই হইল গহনার অবয়ব। আর মুখের কাছে জশমের মত স্প্রিং দিয়ে আটকান হইত। আমার মার এই তারা হার ছিল। আমরাও মাঝে মাঝে পরিতাম। সোনার তার পাতলা করে তাকে বিনিয়ে ফাঁপা একটা অলংকার করিত, সেটা গলাতেও পরিত।'

তারাকাঁটা সোনার কারুকার্য করা ছটাযুক্ত তারার আকারের মাথার কাঁটা।

তুরাবু ওড়িশার কবরী অলংকরণে ব্যবহৃত সোনার কাঁটা।

তাড় হাতের গয়না। 'ভুজের বিরাজিত তাড় ভুবন উজর'— ঘনরাম। [মিথিলায়—'টার'] আধুনিককালের তাবিজ, অনন্ত।

তাগা উপর হাতের অলংকার। ঢাকা দেশে একে 'টাগা' [ঘুনসি] বলে। প্রাকৃতে তগ্গ [সূত্র]। হস্তবন্ধন সূত্র। 'রক্ত চলাচল বন্ধ করার জন্য সূত্রাদির বন্ধন। দৃষ্টান্ত: 'শিরে কৈল সর্পাঘাত কোথায় বাধ্বি তাগা।'

দ

দারক ভরতের নাট্যশাস্ত্রে [২১/২০] একে 'দেবতার এবং পার্থিব রমণীদের আভরণ' বলে উল্লেখ রয়েছে।

দেহধার্য মেঘদূতের টীকায় [উত্তরমেঘ, টীকা ১৩] যে চার রকম অলংকারের উল্লেখ মল্লিনাথ রসাকর গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করেছেন এটি তার মধ্যে একটি।

দেশিক মেঘদূতের টীকায় 'দেশিক' অলংকার অর্থে সেই সময়ের দেশে বিশেষ প্রসিদ্ধ অলংকারকে নির্দেশ করেছেন।

দেবচ্ছন্দ শত লহরযুক্ত হারের নাম। প্রাচীন এই হার কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে 'শতেশ্বরী হার' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। 'দেবচ্ছন্দ' হারটি একশো আটটি মুক্তা এবং একশো লহর এবং দু-হাত পরিমাণ দীর্ঘ হয়। হরিচরণ বলছেন: 'শতষষ্টিক হার'।

দুল ঠাকুরমা ও মায়েদের সময়ের মাঝে নয় 'পরে দুল উঠিয়াছিল'.বলে মহেন্দ্রনাথ দত্ত জানিয়েছেন। তাঁর মতে 'দুলটা অবশ্য বিলাতী চলন। আমরা ছেলেবেলায় মেমদের ছবিতে কানে দুল দেখিতাম।' কানের ঝোলা গহনা বিশেষ। দৃষ্টান্ত: 'তুমি কর্ণ, আমি দুল'।— 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ'।

ন

নূতন গহনা এক রকম অর্থ: স্যাকরাকে দিয়ে তৈরি করা নূতন গয়না। অন্য অর্থ:

প্রাচীন ডিজাইনের গয়নার পরিবর্তে আনা নূতন ডিজাইনের গয়না।

নাগর তামিলনাড়ুর মাদুরা অঞ্চলে মেয়েদের মাথায় ব্যবহৃত চুলের কাঁটা।

নকশি চিরুনি নকশা করা সোনা-রূপার পাত বসানো চিরুনি, যা চুলের খোঁপায় গোঁজা থাকে।

নাগলা ওড়িশায় ব্যবহৃত কর্ণাভরণ অলংকার।

নোলক নাকে সোনার এই গয়না পরতে হলে নাকের দুই ছিদ্রের মধ্যে যে বিভাজন আছে তার নাম 'নাসা'; সেই নাসায় ফুটো করে এই গয়না পরতে হয়। সামনের দিকে এই ছোট্ট অলংকারের নাম নলক বা নোলক। অনেকের নোলকের আগায় এটি ছোট্ট চুণী বা মুক্তা বসানো থাকে।

নথ বালার আকারে স্ত্রীলোকের নাকের গয়না। এতে মুক্তোও লাগানো থাকে। দৃষ্টান্ত: 'খাটতো মজুর কাটতো নাড়া, তার মেগের আবার নথ-নাড়া'— দাশরথি রায়। 'অবাক করলোরে নাকের নথে, কাজ কিরে তোর আগবালাতে'— প্রবাদ।

নাকছাবি নাকের অলংকার। নাকের ছিদ্রের বাইরের দু-পাশে বা এক পাশে পরার জন্য ছোট গহনা।

নাকঠাসা নাকের দুপাশের ছিদ্রের মাঝের অংশে অলংকার পরতে ছিদ্র করা হয়। এই 'নাসা' ছিদ্রের ভেতরে দুপাশে থাকা চাপ দেওয়া গয়না।

নেকলেশ গলার হার। Neck—গলা—lace কারুকার্যময় ফিতা। এখানে কণ্ঠহার।

নিষ্ক বৈদিক যুগে 'নিষ্ক' নামে এক প্রকার আভরণের পরিচয় পাওয়া যায়। এটি বক্ষঃস্থলে ধারণ করা হত। রাজা জানশ্রুতি ঋষিপ্রবর রৈক্ককে ছয়শো গরু, একটি নিষ্ক ও অশ্বতরী বাহিত রথ দান করেছিলেন। অমরকোষ 'নিষ্ক'কে 'উরাভূষণ' এবং মেদিনীকোষ 'বক্ষোলঙ্কার' বলেছে। আর ছান্দোগ্য উপনিষদে [৪র্থ অধ্যায়] রৈক্ক জানশ্রুতি প্রদত্ত নিষ্ককে 'হার' নামেই উল্লেখ করেছেন। সুবর্ণ অলঙ্কার। সোনার ওজন = চার মাষা। সুবর্ণমুদ্রা, মোহর। দৃষ্টান্ত: 'মহাত্মা রন্তিদেব অতিবিস্তীর্ণ সভামধ্যে ব্রাহ্মণগণকে নিষ্ক প্রদান করিতেন, সভামধ্যে তোমাকে শত নিষ্ক প্রদান করা যাইতেছে গ্রহণ করো.....' মহাভারত। সুবর্ণ মুদ্রা নির্মিত স্ত্রীলোকদের গলার হার,— 'নিষ্কে হেমবতী, কুব্জে, ভরিব তোমার গ্রীবা'— জাতক।

নক্ষত্রমালা মুক্তা সন্নিবেশিত নক্ষত্রের সংখ্যানুসারে সাতাশটি এক লহরের হার 'একাবলী'কে এই নাম দেওয়া হয়েছিল অমর সিংহের সময়।

নাগমুদ্রা নাগ চিহ্নিত মুদ্রাযুক্ত অঙ্গুলীয়। এই শ্রেণির আংটিতে বিষাপহারক মণিও সন্নিবেশিত হত। 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে [১ম অঙ্ক] দাসী কৌমুদিকা শিল্পগৃহ থেকে

নিয়ে আসা দেবীর নাগচিহ্নিত মুদ্রাযুক্ত আংটি দেখতে দেখতে বকুলাবলিকার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল। এবং এই মুদ্রার প্রভাবে বিদূষকের কৃত্রিম বিষবিকার নিবৃত্ত হয়েছিল।

নূপুর চরণে ধারণীয় আভরণ। সাধারণের কাছে এই নামে পরিচিত হলেও প্রাচীন ভারতে এর অনেকগুলি নাম ব্যবহার করা হত যেমন, পাদাঙ্গদ, তুলাকোটি, মঞ্জীর, হংসক ও পাদকটক ইত্যাদি। দৃষ্টান্ত: 'নীলমণি তোর'কেমন নূপুর বাজে'— প্রচলিত গান।

প

পুঁটেমুখো বালা মহেন্দ্রনাথ দত্ত এই বালাকে পুরাতন কলকাতার গয়না বলে উল্লেখ করেছেন। যে বালার মুখে গোল গাঁট '[মুদো] দেওয়ার মতো— যেমন হাঙরমুখো, ময়ূরমুখো ইত্যাদি [জলতরঙ্গী] 'কাটা মুখ রাণাঘেটে পুঁটে।'— দাশরথি ১৬৩২।

পানকাঁটা ঘনকৃষ্ণ চিকুরদামের পটভূমিতে দ্যুতিমান সোনার পানের আকৃতির কাঁটা।

পইরীবন্ধ উত্তর প্রদেশের প্রচলিত চুড়ি। রুপোর বলয়ের প্রান্ত থেকে ছোট ছোট গুলির গুচ্ছ ঝুলিয়ে দেওয়া রীতি। উচ্চবর্ণের মহিলাদের ব্যবহৃত গয়না।

পেটি উত্তর প্রদেশে চন্দ্রহারের আঞ্চলিক নাম।

পায়ের মল পায়ের গয়না। রুপোর তৈরি বালা যা পায়ে পরা হয়। 'ঝম্‌ঝমাঝম্‌ বাজিয়ে যাবো মল'— গান।

পানীয়ন ওড়িশায় নারীদের ব্যবহৃত খোঁপার অলংকার।

পাশা কানের অলংকার।

পাটিহার গলায় পরবার এক রকম হার।

পুষ্পহার ফুলের নকশাযুক্ত গলার অলংকার।

পত্রকর্ণিকা পাতার আকারে কানের গয়না। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে [২১/২৩] এর উল্লেখ রয়েছে।

পরিধেয় মেঘদূতের টীকায় [উত্তরমেঘ, টীকা ১৩] 'রসাকর' গ্রন্থ থেকে যে চার প্রকার অলংকারের উল্লেখ মল্লিনাথ করেছেন ,এটি তার মধ্যে একটি।

পরিতথ্যা কোষকার অমরসিংহ তাঁর গ্রন্থে [মনুষ্যবর্গ ১০১] নারীর সীমন্তে ধার্য আভরণ বলে মন্তব্য করেছেন।

পত্রপাশ্যা ললাটের আভরণ। অমরকোষ গ্রন্থে [মনুষ্যবর্গ, ১০৩] এর উল্লেখ রয়েছে। বৃক্ষের পত্রসমূহের আকারে এটি তৈরি হত। পত্রের [পাতার] পাশ [সমূহ] থেকে এই নামকরণ।

প্রালম্বিকা কিঞ্চিৎ লম্বা স্বর্ণের কণ্ঠাভরণ। অমরকোষে [মনুষ্যবর্গ, ১০৪ কারিকা] এর উল্লেখ দেখা যায়। মেয়েদের পরার জন্য গলা থেকে বেশ খানিকটা লম্বা ও ঝুলযুক্ত গলার হার।
পাদাঙ্গদ চরণে ধারণীয় আভরণ। পায়ের অঙ্গদতুল্য [বাহুভূষণ/কেয়ূর/তাড়—হরিচরণ]; নূপুর।
পাদকটক চরণে ধারণীয় আভরণ, সাধারণের নিকট নূপুর রূপে পরিচিত। পাদের [চরণের] কটক [বলয়], বাঁকমল, নূপুর —জ্ঞানেন্দ্রমোহন।
পরিহার্য কনুইয়ের নিম্নভাগে পরে যে অলংকার।
পাঁচনরী হার সোনার বা রুপোর পাঁচপল কড়াই করে তাতে আংটি দিয়ে মালা করে মেয়েরা পরতো। এটি সাবেক গয়না। মহেন্দ্রনাথ দত্ত এই গয়নার কথা শুনিয়েছিলেন।

ফ

ফুল পঞ্জাবের মেয়েদের কেশসজ্জায় ব্যবহৃত কাঁটা। বাঙালি মেয়েরা নাকে ছোট ফুলের মতো পরে যে গয়না।
ফুলকাঁটা কবরী সজ্জায় শীর্ষদেশ পাপড়িযুক্ত ফুলের নকশায় তৈরি স্বর্ণালঙ্কার বিশেষ।
ফুলঝুমকা ফুলের মতো কানের ঝুমকা গয়না।

ব

বেশর নাকের গয়না। রাসসুন্দরী দাসী তাঁর আত্মকথা 'আমার জীবন'-এ এই গয়নার উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন: 'এই বাটীর নিকটে পুষ্করিণী আছে। এক দিবস আমি পুষ্করিণীর ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছি। আমি আমার গলা জলে নামিয়া কাপড় কাচিতেছি, এমন সময় আমার কাপড়ের সঙ্গে বেশরখানি গভীর জলে পড়িয়া গেল।... তাহার অনেক দিন পরে আমার পঞ্চম পুত্র দ্বারকানাথ... ঐ পুষ্করিণীটি নূতন করিয়া কাটাইল। পুষ্করিণী কাটাইয়া... ঐ মাটি দিয়া পুষ্করিণীর ধারে প্রাচীর গাঁথান হইয়াছে। পরে অনেক দিবসে সেই প্রাচীরের অৰ্দ্ধেকটা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়... সেই ভাঙ্গা প্রাচীরটার উপরে আমার ঐ বেশরখানি যেন সমান হইয়া শুইয়া আছে।... জগদীশ্বরের আশ্চর্য কাণ্ড দেখিয়া আমার হৃৎকম্প হইতে লাগিল। যখন আমার বয়স ২২ বছর [জন্ম ১৮০৯ খ্রী.] তখন ঐ বেশরখানি আমার নাক হইতে খসিয়া গভীর জলের ভিতর পড়িয়াছে, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। যখন আমার বয়স ৮২ বৎসর তখন আমার সেই বেশরখানি আমি পাইলাম। এই ৬০ বছর পরে সেই বেশরখানি যেমন পূর্বে আমার নাকে ছিল এখনও সেই মত আছে, স্বর্ণ বিবর্ণ হয় নাই। কি আশ্চর্য কাণ্ড! [তৃতীয় রচনা]।

বেঁকি [মল] পায়ে পরার বাঁকমল। হরিচরণ জানাচ্ছেন: —বেঁকী—বিশেষ্য—উপর পায়ের গয়না—দাশরথি রায়-এর ১৬৩২ সংখ্যক গানে এর ব্যবহার আছে।

বিজয়চ্ছন্দ পাঁচশো চারটি মুক্তো লহরের হার। বৃহৎসংহিতায় এই হারের পরিচয় রয়েছে। হারটি লম্বা দুহাত প্রমাণ হবে।

বৈজয়ন্তী ভাগবতে [১০ স্কন্দ। ২৯ অধ্যায়। ৪৪] শ্রীকৃষ্ণের বৈজয়ন্তী মালার উল্লেখ রয়েছে। পঞ্চবর্ণময়ী আজানুলম্বিতা শ্রীকৃষ্ণের মালা। উদাহরণ: 'পঞ্চবর্ণপুষ্প মালা বৈজয়ন্তী নাম'— ভক্তমাল গ্রন্থ।

বলয় কনুইয়ের নিম্নভাগে ধারণীয় অলংকার— বালা। মহাকবি কালিদাস মেঘদূতে যক্ষের প্রিয়া বিরহজনিত কৃশতাবশত স্বর্ণনির্মিত প্রকোষ্ঠভূষণ [হাতের বালা] রহিত [আলগা] হয়ে গিয়েছিল। মাঘের 'শিশুপালবধ'-এ [৩/৬] শ্রীকৃষ্ণের বলয়ে পদ্মরাগমণি নিধনের পরিচয় পাওয়া যায়। বাণভট্টের লেখনিতে চণ্ডাল কন্যার হাতে রত্ন নির্মিত বলয়ের কথা লেখা হয়েছে। রামায়ণের যুগে [অযোধ্যাকাণ্ড ৩২/৭/৮/৫২] এই অলংকারকে প্রধান এবং 'বিচিত্র' বিশেষ দেওয়া হয়েছে।

বিছাহার বৃশ্চিক [বিছা]-এর মতো দেখতে গলার হার। বিছার মতো হার। জ্ঞানেন্দ্রমোহন বলেছেন; বিছার আকৃতি কটিভূষণ।

বেণী সৌরাষ্ট্রের কয়রা অঞ্চলে চূড়ার গড়নে পদ্মপাতার আদলে নির্মিত কেশ সজ্জার অলংকার— কাঁটা।

বেরা বিহারে চুড়ির অনুরূপ রুপো বা পিতলের অলংকার, এতে সোনার ব্যবহার কম।

বিছাপদক বিছার আকৃতির মতো ওপর হাতে পরে সোনা বা রূপার পদক [চেন দিয়ে বাঁধা চ্যাপটা মেডেলের মতো। এ-চৌকো, গোল, আয়তাকারও হতে পারে]।

বন্ধনীয় ভরতের নাট্যশাস্ত্রে [২১/১২] দেহের আভরণকে যে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে তার মধ্যে একটি। কটিসূত্র 'অঙ্গদ' প্রভৃতি 'বন্ধনীয়' পর্যায়ের অলঙ্কার।

বটিকা আঙুলের গয়না। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে এই [২১/১৬] অলংকারের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বেণীগুচ্ছ ভরতের [২১/২০] সময়ের গহনা।

বিলেপন মল্লিনাথ মেঘদূতের টীকায় [উত্তর মেঘ, টীকা ১৩] 'রসাকর' গ্রন্থ থেকে যে চার রকম অলংকারের উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে এটি একটি।

বালপাশ্যা সীমান্তে ধার্য আভরণ। কোষকার অমরসিংহের গ্রন্থে [মনুষ্যবর্গ, ১০১] এই অলংকারের উল্লেখ পাওয়া যায়। বালপাশে অর্থাৎ সিঁথিতে এই অলংকার ব্যবহৃত

হত। বাংলাদেশে সোনার এই অলংকারের ব্যবহার এখনও দেখা যায়। 'একে সীতি বা সীতিমৌরও বলে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে রুপোর বা সোনার তৈরি এই অলংকারের আজও প্রচলন রয়েছে।

বালীকা কর্ণের পৃষ্ঠভাগে ধারণীয় প্রাচীন যুগের অলংকার।

বাহুভূষণ হাতের গয়না।

বাজু নমনীয় গড়নের ওপর হাতের গয়না, যার দুই প্রান্ত আংটা কিংবা ফিতের সাহায্যে দুই মুখ এক করে পরা যায়। এর প্রাচীন নাম কেয়ূর। সেকালের কলকাতায় বিবাহে ব্যবহৃত পুরুষের হাতের গয়না। শিবনাথ শাস্ত্রী 'আত্মপরিচয়'-এ লিখেছেন: ১৮৫৯-৬০ খ্রিস্টাব্দে যখন তাঁর বয়স বারো/তেরো তখন বিয়ে করতে যান, সেই সময় 'কানে মাক্‌ড়ি, গলায় হার, হাতে বাজু ও বালা পরিয়া বিবাহ করিতে গিয়াছিলাম।' প্রাচীনাদের অতি প্রিয় ছিল এই গহনা।

বিবাহের গহনা মেয়ে বা ছেলের বিয়েতে যৌতুক হিসেবে যে স্বর্ণালঙ্কার দেওয়া হয়।

বালা নীচের হাতের গয়না। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই পরত। বর্তমানে ছোট ছেলেদের পরানো হয়। বালা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফাঁপা হয়— ভেতরে গালা ভরিয়ে নিরেট করা হয়। সোনার তার দিয়ে তারের বালা হয়। বালা রুপোরও হয়। 'বালা গালা ভরা হলে চলে, আঙটি নিরেট হওয়া চাই।' —প্রমথ চৌধুরী।

বাউটি নীচের হাতের গয়না। সংস্কৃতে বাহুপট্টী/বাহুটী/টি > বাউটি/টী। ওপর হাতের পটিকাকার এক ধরনের গয়না। উদাহরণ: 'একটু একটু নথ ও বাউটি নাড়া দিয়া...' গৃহিণী বলিলেন'— বঙ্কিমচন্দ্র।

ম

মাক্‌ড়ি কানের দুল। সেকালের কলকাতায় পুরুষেরাও বিবাহে এই অলংকার ব্যবহার করতেন। মহেন্দ্রনাথ দত্ত এই দুল প্রসঙ্গে লিখেছেন— 'কান বিঁধানো এক নূতন প্রথা উঠিল। বুড়িদের কানে গোটা কতক ছেঁদা থাকিত। তাহার পর কানে সাত আটটা ছেঁদা আর সারবন্দি মাকড়ি, এই মাকড়ির আকৃতির নানা প্রকার পরিবর্তন হইতে লাগিল। এখন তাহার কোনও নির্ণয় করা যায় না।' সংস্কৃত > মকর-কুণ্ডল > —'মকর'>র>ড়। মকরাকৃতি কানের গহনা। গঠনানুসারে ইহার কপিকাতা, তিরকাটা, টোপতোলা, তারাময় অর্ধচন্দ্রাকার মাকড়ির নাম হল ইহুদি মাকড়ি, পার্সি মাকড়ি ইত্যাদি।

মানতাসা নীচের হাতের অলংকার। সোনার পাতে কারুকার্য করা কব্জি বেষ্টনী বলা যেতে পারে একে।

মটরদানা মটরের দানার ডিজাইনে তৈরি অলংকার এই ডিজাইনের হারকে মটরদানা হার, বালাকে মটরদানা বালা বলে।

মণিবন্ধ নীচের হাতের গয়না। মণি—হাতের কব্জি-বন্ধনকারী গহনা। এ-মানতাসার মতোই।

মল পায়ের গয়না।

মকরবালা গঙ্গাদেবীর বাহন মকরের মুখের আদলে তৈরি হাতের স্বর্ণালঙ্কার।

মিনা সোনা-রুপো বা অন্য ধাতুর ওপর রঙ-বেরঙের কাচের মতো কলাই করা [enamal]। উদাহরণ: 'সেই [ঘাসের] ফ্রেমখানা... লাল-কাল-সবুজ-গোলাপি-সাদা-জরদ নানা বর্ণ ফুলে মিনে করা।' —বঙ্কিমচন্দ্র।

মভ [ব] চেন গলার সরু হার— এগুলি বেশ লম্বা হয়।

মঞ্জীর পায়ের গয়না। সাধারণের কাছে নূপুর বা মল নামে পরিচিত। উদাহরণ: 'মণিময় মঞ্জীর পায় দরহি তেজি চলি যায়' —বিদ্যাপতি।

মণিময় নূপুর মণি উপাদানে তৈরি নূপুর। প্রাচীন 'মণিমঞ্জীর' শব্দে মণিময় নূপুরের ব্যবহারকে স্বীকার করা হয়। কবিকঙ্কণ চণ্ডীমঙ্গলে জগদম্বার চরণ-পঙ্কজে মণিময় কাঞ্চন নূপুরের উল্লেখ কবি করেছেন এ ভাবে: 'সুচারু নিতম্ব সাজে/চরণ পঙ্কজে রাজে/মণিময় কাঞ্চন-নূপুর।' মণিগাঁথা নূপুর।

মাদুলি মাদুলি ডিজাইনের অলংকার সেকালের কলকাতার মেয়েরা পরত বলে এ ভাবে মহেন্দ্রনাথ দত্ত জানিয়েছেন: 'আমাদের অতি শৈশবে দেখিতাম গলার অলংকার মাদুলী ভাবের। সে সব নানাভাবে রেশম দিয়া গাঁথিয়া গলায় পরিত।' এটি প্রাচীন গয়না, তাই তিনি বলেছেন— 'বুড়িদের গলায় চিক দেখি নাই তাহারা মাদুলী শ্রেণীর গহনা পরিত।' একটা সময় পুরোনো ডিজাইনকে সরে দাঁড়াতে হয়, মাদুলিরও ভাগ্যে তাই হল, পুরোনো কলকাতায় 'মাদুলী শ্রেণীর গহনা উঠিয়া গিয়া নূতন শ্রেণীর গহনা হইল।'

'মাদলের আকৃতি বলে এর এই নামকরণ। এ তামা ইত্যাদি ধাতুতে তৈরি হয়। মাদুলির ফাঁপা গহ্বরে ভেষজ বা মন্ত্র তালপাতায় লিখে বন্ধ করে গলায়, বা ওপর হাতে পরে থাকে। অনেকে একই ভাবে সোনার মাদুলিও পরে।' —জ্ঞানেন্দ্রনাথ। মাদুলির মতো কবচের [armlet] স্বর্ণাদির কোষ। 'কনকমাদুলিময় হারে।' —শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল; হরিচরণ।

মুক্তাবলী ভরতের নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত মুক্তার কণ্ঠ আভরণ।

মুক্তাহার মুক্তো বসানো স্বর্ণের হার।

মকরিকা ভরতের সময়ে [২১/১৯] 'দেবতার ও পার্থিব রমণীদের আভরণ' বলে মন্তব্য করা হয়েছে। কপালে চন্দন ইত্যাদি দিয়ে মকরের আকারে আঁকা রেখা। ললাটিকা বিশেষ।

মুক্তাজাল মুক্তা সমূহ। ভরতের সময়ের [২১/২০] অলংকার।

মুকুট মস্তকের আভরণ। কিরীট [crown]। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে [২১/১৫] এর উল্লেখ রয়েছে। কোষকার অমরসিংহ [মনুষ্যবর্গ, ১০১] অলংকারের নাম মুকুট থেকে শুরু হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন। উদাহরণ: 'মাথার মুকুট খসি পড়ে ভূমিতলে।' —কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

মকর কুণ্ডল মকরের আকৃতি কানের গয়না। 'হেলায় দুলিছে কানে মকর কুণ্ডল' —জ্ঞানদাস।

মণিময় কুণ্ডল প্রাচীন কালে কর্ণে কুণ্ডল ব্যবহৃত হত তা আকারে ছিল গোল, উপরে নানান কারুকার্যের সমাবেশ। রামায়ণে [সুন্দরকাণ্ড ৬] লঙ্কাপুরবাসী মহিলাদের কানে হিরণ্ময় কুণ্ডলে হীরক ও বৈদুর্যমণির সন্নিবেশ দেখা যায়। কাদম্বরীতে পত্রলেখার মণিময় কুণ্ডলে মরকতমণির তৈরি 'মকরপত্রভঙ্গ'র উল্লেখ রয়েছে। দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভায় [মহাভারত, বনপর্ব ৫৭] 'সমাগত নৃপতিবৃন্দের কর্ণযুগল পরিষ্কৃত মণিময় কুণ্ডলে শোভিত' হয়েছিল।

মালা ভরতের নাট্যশাস্ত্রে [২১/১৮] এই অলংকারের উল্লেখ রয়েছে। কাষ্ঠ, পুষ্প, স্বর্ণ, প্রবাল ইত্যাদি বিবিধ উপাদানে কণ্ঠে ব্যবহারের জন্য মালা প্রস্তুত হয়ে থাকে। অমরসিংহ 'মাল্য'কে মস্তকে ধার্য আভরণ বলে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু কী উপাদানে তা তৈরি সে বিষয়ের কোনও উল্লেখ নেই। মেদিনীকোষ 'পুষ্প'ই মাল্যের উপাদান বলা হয়েছে। হেমচন্দ্র 'আদি' শব্দের দ্বারা পুষ্প ছাড়াও অন্য পদার্থে মালা তৈরির আভাস দিয়েছেন।

প্রাচীন ভারতে প্রসাধনের এক প্রধান উপকরণ। মাল্যের বিবিধ প্রকার ভেদ আছে: ১. গর্ভক— কেশ রচনার সঙ্গে বিনুনিতে জড়িয়ে ধারণযোগ্য। ২. প্রভষ্টক— যে মালা পুরুষের মস্তকের পেছনে ধারণ করা হয় ও নারীর খোঁপায় জড়ানো হয়। ৩. ললামক— যে মালা মাথার সামনে ঝুলত, মাথা ঘেরিয়া কপালে ঠেকত। ৪. প্রালম্ব— যে মালা গ্রীবা বেষ্টন করে থাকত। ৫. বৈকক্ষক— বুক পর্যন্ত ঝোলানো মালা।

এই মালা হল ফুলের মালা— প্রশ্ন হল, সোনার গয়নার সঙ্গে এর সম্পর্ক কোথায়। কিন্তু এটাও সবার জানা আছে ফুলের মালাও সেকালে অলংকার হিসেবে গৃহীত হত। বিবাহে বর-বধূর প্রাচীনতম অলংকার হল ফুলমালা। আর রবীন্দ্রানাথের 'পুরস্কার' ['কল্পনা' কাব্যগ্রন্থ] কবিতার কবি রাজভাণ্ডারের সমস্ত মণিমাণিক্যের পরিবর্তে 'কণ্ঠ হইতে দেহো মোর গলে ওই ফুলমালাখানি।'— নিয়ে ধন্য হল।

মানবক বিংশতিলহরযুক্ত হারের নাম। বৃহৎসংহিতা মতে ষোড়শ লহর মুক্তাহারের নাম মানবক।

মন্দর আট লহর হার। বৃহৎসংহিতায় [৮০/৩০-৩৪] এর উল্লেখ রয়েছে।

মণিসোপান এই হারের পরিচয়ে বলা হয়েছে 'হস্তপ্রমাণ হার মধ্যে যদি মণি অথবা সুবর্ণগুলিকা খচিত হয়, তবে তার নাম মণিসোপান।'

মেখলা স্ত্রীকটিতে ধারণীয় আভরণ। 'অষ্টযষ্টি' অর্থাৎ আট লহরের কটিভূষণ। কাদম্বরীতে মেখলাভরণে শব্দায়মান রত্নমালার সমাবেশ দেখা যায়; কবি লিখেছেন: 'সঞ্চরণকারী বেশ্যাজনের জঘনস্থলের আস্ফালনবশত ক্বণিত ক্ষুদ্র রত্নামালাযুক্ত মেখলার মনোহারী ঝঙ্কারের দ্বারা।'

কটিভূষণ; স্বর্ণ রৌপাদি নির্মিত বিছা, গোট, চন্দ্রহার ইত্যাদি অলঙ্কার। উদাহরণ— 'লুটায় মেখলাখানি ত্যাজি কটিদেশ।'— 'চয়নিকা'— রবীন্দ্রনাথ।

য

যষ্টি এক হাত প্রমাণ লহরের যে হারে মণির সন্নিবেশ হয় তার এই নাম। বৃহৎসংহিতায় [৮০/৩৪] এই নাম পাওয়া যায়।

র

রশনা রামায়ণের যুগে [অযোধ্যাকাণ্ড ৩২/৭/৮/৫২] এটিকে প্রধান অলংকারের মধ্যে 'বিচিত্র' বিশেষণ দেওয়া হয়েছে। 'কটিব্যাপক', 'কাঞ্চী', মেখলা, চন্দ্রহার। 'নিতম্ব-বিম্বে ক্বণিছে রশনা।' —'মেঘনাদবধকাব্য'।

রতনচূড়/র কারুকার্য বহুল বিবিধ রত্নখচিত হস্তালংকার। নীচের হাতেই এটি ব্যবহৃত হয়। দ্রষ্টব্য: চুড়।

রুলি নিচের হাতের অলংকার। গালার সরু বালা বিশেষ; [সাদৃশ্যে] সোনার সরু বালা। 'চুড়ির কাচে রাঙা রুলি শোভা করে বড়ি'— বঙ্গসাহিত্য পরিচয়। 'তোমার হাতে রুলি রয়েছে, তুমি কি সধবা?' —বিষবৃক্ষ।

রত্ন 'রমণীয় সুবর্ণ মণিমুক্তাদি' [সায়ণ] 'পদ্মরাগ মরকতাদি, মুক্তাপ্রবালাদি [অমরকোষ টীকা]। বহুমূল্যবান প্রস্তর রত্ন ও উপরত্ন লইয়া রত্ন বহু প্রকার। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ ও মহারত্ন নয়টি যথা: ১. হীরক— ইহার অন্য নাম বজ্র বা বজ্রমণি; diamond। ২. মাণিক্য বা মানিক [ইন্দ্রগোপ কীটের ন্যায় রক্তকান্তি] অন্য নাম পদ্মরাগমণি; ruby। ৩. মরকত/পান্না/গারুত্মত— ময়ূরপুচ্ছের মতো ও হরিদ্বর্ণ। emereld। ৪. ইন্দ্রনীল [নীলা বা নীলম; ঘন মেঘের মতো নীল]; নীলমণি a sapphire/ lapis lazuli। ৫. পুষ্পরাগ/পোখরাজ— সোনার মতো হলদে রঙের। সংস্কৃত নামান্তর পীতস্ফটিক, পীতাশ্ম বা পীতমণি; a topaz। ৬. গোমেদ— [রক্তাভ কমলাবর্ণ মণি] jacinth। ৭. বৈদূর্যমণি— বেড়ালের চোখের মতো উজ্জ্বল নীলাভ পীত— এজন্য একে নীলকান্তমণি বা গোমেদের পর্যায়ে ফেলা হয়। lapis lazuli। ৮. মুক্তা— লাল-হলদে-সাদা ইত্যাদি নানা বর্ণের পাওয়া যায়; pearl। ৯. প্রবাল/পলা/বিদ্রুম— সাদা-হলদে-লাল ভেদে নানা প্রকার; coral।

উপরত্ন পেরোজ বা হরিতাশ্ম [সবুজ ও ছাই রঙ]; রাজাবর্ত বা রেউটি পাথর [ময়ূরকণ্ঠীর মতো নানা রঙের] প্রভৃতি উপরত্ন। হিরে, মানিক, নীলমণি, মরকত ও মুক্তো প্রধান রত্ন— এর মধ্যে হিরেই সর্বপ্রধান। কিন্তু মহাদ্যুতি সর্পমণি রত্নশ্রেষ্ঠ ও দুর্লভ বলে বিবেচিত হয়।

রিং ইংরেজি ring-গোল সরু বালার আকৃতি হালকা ছোট কানের গয়না। কানে পরা থাকলে একে ear ringও বলে।

রুক্ম সোনা, হোম। সুবর্ণরত্নাদি নির্মিত আভরণ [সায়ণ]। বেদে 'রুক্ম' নামে মস্তকে ধারণ করার সুবর্ণ আভরণের উল্লেখ দেখা যায়— "হোতা আগ্নেয়; অতএব প্রকাশ স্বরূপ 'রুক্ম' তাঁর যোগ্য; অপিচ, এই হোতার জন্য ঐ 'রুক্ম'-রূপ আদিত্যকে উন্নয়ন করে অর্থাৎ হোতার ঊর্ধ্বদেশে স্থাপন করে" [১৩/৯/৯]।

রশ্মিকলাপ চতুঃষষ্টি লহরের হার। মুক্তা দ্বারা নির্মিত হার। বৃহৎসংহিতায় এর উল্লেখ রয়েছে।

রুপার আঙোট মেয়েদের পায়ের [সাধারণত বুড়ো বা তার পরের আঙুলের] রুপার আঙটি। একে চুটকিও বলে। দৃষ্টান্ত: 'তোমার শ্রীচরণের চুটকি হয়ে পড়ে আছি।' —'জামাই বারিক'। মহেন্দ্রনাথ দত্ত জানিয়েছেন— 'কেহ কেহ অন্য পায়ের আঙুলে রূপার আঙোট পরিত।' এই রকম সংস্কার আছে যে নাভির নিচে সোনার কোনও রকম গয়না পরা নিষেধ taboo]। তাই পায়ের গোছের, পায়ের পাতার ও পায়ের আঙুলের সব গয়নাই রুপোর হতে হয়।

ল

ললাটতিলক ভরতের নাট্যশাস্ত্রে [২১/২১০] একে 'দেবতার ও পার্থিব রমণীদের আভরণ বলা হয়েছে।

ললাটিকা ললাটের আভরণ। কোষকার অমরসিংহ তাঁর গ্রন্থে [মনুষ্যবর্গ, ১০৩] এই অলংকারের উল্লেখ করেছেন। ললাটভূষণ। দৃষ্টান্ত: 'যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে।'— 'সারদামঙ্গল'— বিহারীলাল।

ললন্তিকা অমরকোষ [মনুষ্যবর্গ, ১০৪ কারিকা] এর উল্লেখ রয়েছে। নাভিদেশ পর্যন্ত লম্বা হার।

লহর হারের লহরের নাম যষ্টি, লতা, সর ও সরি। লহরের সংখ্যা অনুসারে হারের বিশেষ নাম হয়, যেমন সাতলহরী হার, শতলহরী হার ইত্যাদি।

লাহোটি বিহারে চুড়ির অনুরূপ গালার উপর রূপো বা পিতলের কবচ। এতে সোনা ব্যবহার কম থাকে।

লকেট ইংরেজি Locket। সোনা দিয়ে তৈরি ছোট কৌটা। ধুকধুকি। দোলায়মান পদক।

শ

শতেশ্বরী শত লহরযুক্ত হার, যার প্রাচীন নাম 'দেবচ্ছন্দক হার'। কবিকঙ্কণ চণ্ডীমঙ্গলে [খুল্লনার রূপ বর্ণনায়] এই হারের উল্লেখ করেছেন— 'গলে শতেশ্বরী হার, শোভে নানা অলঙ্কার করে শঙ্খ শোভে তালবালা।'

শঙ্খল পুরুষের কটিস্থ গহনার নাম।

শাঁখা বাঁধানো সোনা দিয়ে বাঁধানো হিন্দু সধবা নারীর শাঁখা।

শাঁখা শাঁখ থেকে তৈরি বালা। বাঙালি বিবাহিত নারীর লক্ষণ হাতে শাঁখা-সিঁথিতে সিঁদুর লালপেড়ে শাড়ি। 'বাহুর বলয়া মো করিব শঙ্খচুর'।— শ্রীকৃষ্ণকীর্তন [রাধাবিরহ]।

শিখাপাশ ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে [২১/১৯] এই অলংকারকে দেবতা ও পার্থিব রমণীদের আভরণ বলেছেন।

শিখাজাল দেবতা ও.পার্থিব রমণীদের এই আভরণ ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে ভরতের নাট্যশাস্ত্রে [২১/১৯]।

স

সাপকাঁটা অতীতে মাথার খোঁপা যেখানে সোনার চিরুনি লাগানো হয় তার দু পাশে কোনাকুনি নিবদ্ধ দুটি সোনার সাপ-কাঁটা ব্যবহার করা হত।

সীতাহার মেয়েদের গলায় ব্যবহৃত এক বিশেষ ধরনের হার।

সপ্তকী স্ত্রীকটিতে ধারণীয় আভরণ। কাঞ্চী, মেখলা। বিংশতিযষ্টিকা কাঞ্চী— অমরকোষ টীকা।

সারসন স্ত্রীকটিতে ধারণীয় অলংকার। অমরসিংহ এই আভরণটির বর্ণনায় স্ত্রীকটির আভরণ বললেও, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে পুরুষকটির আভরণেও 'সারসন' শব্দের প্রয়োগ রয়েছে। 'শিশুপালবধ'-এ [৩/৮] এই আভরণে নিহিত মুক্তাময় পাদাগ্র পর্যন্ত ব্যাপ্ত মালার নিদর্শন পাওয়া যায়।

স্বর্ণচুড়ি স্বর্ণচুড়ির ব্যবহার সুপ্রাচীন কাল থেকেই হয়ে আসছে। কবিকঙ্কণ চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতুকে গালাহাটে জিনিস কিনতে গিয়ে, সেখান থেকে অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে গৃহিণীর জন্য সোনার চুড়ি ক্রয় করিয়েছিলেন— 'হীরা নীলা মোতি পলা, কলধৌত কণ্ঠমালা, কুণ্ডল কিনিল স্বর্ণচুড়ি।'

সাতনলী হার এর অন্য নাম সাতনরী। মহেন্দ্রনাথ দত্ত জানিয়েছেন: 'রূপা বা সোনার আটপল [Eight Faced] কড়াই করে তাতে আংটি দিয়া মালা করিয়া পরিত, নাম ছিল সতানলী [সাতনরী]। আমরা ছেলেবেলায় এই সাবেক গহনা দেখিলে বিরক্ত হইতাম।'

সোনার চলন সোনার ব্যবহার। মহেন্দ্রনাথ দত্ত জানিয়েছেন 'আমাদের ঠাকুরমাদের ও মায়েদের সময় বা এই দুইয়ের মধ্যকালে বাংলাদেশে একটা পরিবর্তনের যুগ আসিল। রূপার চলন উঠিয়া গিয়া সোনার চলন হইল।'

সূত্র কণ্ঠের আভরণ। সুতোয় গাঁথা গলার হার। কনকসূত্র। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে [২১/১৬] এর উল্লেখ রয়েছে।

স্রক্ কিঞ্চিৎ লম্বা কণ্ঠের অলংকার, যার সাধারণ নাম মালা। অমরসিংহ অবশ্য 'স্রক' শব্দকে 'মস্তকে ধার্য আভরণ' বলেছেন। বৈদিক গ্রন্থে সুবর্ণ নির্মিত স্রকের উল্লেখ রয়েছে। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে যজ্ঞে বসা ঋষিদের প্রতি দেয় দ্রব্যের যে নির্দেশ রয়েছে তাতে, উদ্গাতাকে 'সুবর্ণনির্মিত স্রক্' দান করবে, বলা হয়েছে—

'সূর্য যেমন সমস্ত জগৎকে প্রকাশ করে থাকেন, উদ্গাতাও তেমনই সামবেদের অর্থ প্রকাশ করেন', সুতরাং "উদ্গাতা সৌর্য সুবর্ণ স্রগ্ ধারণের পূর্বে, 'উষঃকাল' [প্রভাত] সম্পন্ন হয় না, স্রগ্ধারণের পর, সূর্য বিশেষ রূপে 'উষঃকাল' সম্পাদন করেন" [১৮/৯/৮]।

গোভিলের গৃহ্যসূত্র [৩/৫/১৬] হিরণ্যস্রকের কথা বলা আছে। আবার আলাদা করে [৪/৫/১৫] 'গন্ধরহিত' শব্দ ব্যবহার করায় 'স্রক' শব্দে পুষ্পমালাকেও বোঝানো

হয়েছে। তাই গোভিলের সময় শিরোধার্য পুষ্পমালা, এবং কণ্ঠধার্য স্বর্ণাদি মালা এই উভয়কেই সমান ভাবে 'স্রক্' বলা হয়েছে।

এ ছাড়াও হরিচরণে পাচ্ছি: 'মস্তকাহিত মালা [অমরকোষ টীকা], মাল্য, মালা, কমল স্রক, পুষ্প মালামাত্র, [সাদৃশ্যে] 'মণিস্রক, হিরণ্যস্রক' ইত্যাদি।'

সৃঙ্কা বৈদিক যুগে এই নামে এক প্রকার হার জাতীয় অলংকারের উল্লেখ রয়েছে। কঠ উপনিষদে [১/১৫] দেখা যায় ধর্মরাজ যম নচিকেতার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে একটি 'সৃঙ্কা' উপহার প্রদান করছেন। এই সৃঙ্কাতে বহুরূপের সমাবেশ হয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়।

সাগ্নি পঞ্জাবের মেয়েদের ব্যবহৃত চুলের কাঁটা।

সুইয়া পঞ্জাব অঞ্চলে মেয়েরা কেশসজ্জায় যে কাঁটা ব্যবহার করে তার নাম।

সোনা-রুপার বাসন সেকালের কলকাতায় অনেক বনেদি বাড়িতেই সোনা-রুপার বাসন ব্যবহার করা হত। হাটখোলার দত্ত বাড়ির তনু দত্ত নাকি মোসাহেবদের নিয়ে সোনার থালাতেই ভাত খেতেন। কেশবচন্দ্র সেনের মাতা দেবী সারদাসুন্দরী তাঁর আত্মকথায় 'বিষয় বিভাগ'-এ জানিয়েছেন: 'তখন বাহিরের সেই তেতালা হইতে ঝুড়ি ঝুড়ি সব রূপার বাসন ভিতর বাড়িতে আনা হইতে লাগিল।... আমার শ্বশুর যাওয়ার সময় সোনারূপার বাসন ভিন্ন তাঁর চারি ছেলের প্রত্যেককে ৮০,০০০ হাজার করিয়া নগদ টাকা দিয়া গিয়াছিলেন।'

সোনা সুবর্ণ। 'পরের সোনা না দিই কানে, প্রাণ যাবে মোর হ্যাঁচ্‌কা টানে।'

স্বর্ণ সোনা।

সুবর্ণ পৃষ্ঠ স্বর্ণতল, গিল্‌টি করা।

সুবর্ণকার:স্বর্ণকার স্যাকরা। সোনার গহনা ইত্যাদি যাঁরা তৈরি করেন।

সুবর্ণকৃৎ স্বর্ণকার।

সুবর্ণবণিক সোনার ব্যবসায়ী। সোনার বেনে।

সলম খাড়ু ওড়িশায় প্রচলিত বলয়। রুপো, পিতল, ব্রোঞ্জের তৈরি অলংকার।

সোনার চিরুনি মোষের শিঙের চিরুনির দাঁত বা কাঁটার উপরে অর্ধবৃত্তাকার অংশ সোনার পাতে নানান নক্‌শা খচিত করে তৈরি করা অলংকার। এই চিরুনিতে 'পতি পরম গুরু', 'সাবিত্রী সমানেষু', 'সুখে থাক' ইত্যাদি লেখা থাকত। বঙ্গরমণীর খোঁপার প্রাচীন অলংকার।

সোনার কাঁটা মাথার বেণীকে যথাস্থানে রাখতে উৎসব অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত সোনা বা রুপা উভয় উপাদানে গড়া কাঁটা।

হ

হর্ষক কণ্ঠের আভরণ। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে [২১/১৬] উল্লিখিত অলংকার।

হার ভরতের নাট্যশাস্ত্র [২১/১৭০] মতে এটি গ্রীবার ও স্তনমণ্ডলের আভরণ। রামায়ণেও [অযোধ্যাকাণ্ড ৩২/৭/৮/৫২] হারের উল্লেখ রয়েছে।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে হারের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। সাহিত্যে যত রকম আভরণের পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে হারের মতো শ্রেণিবিভাগ আর কোনও অলংকারে দেখা যায় না। হার নারী পুরুষ উভয়েই ব্যবহার করত, আজও করে।

হেমসূত্র রামায়ণের যুগে [অযোধ্যাকাণ্ড ৩২/৭/৮/৫২] এই অলংকারকে 'বিচিত্র' বিশেষ দেওয়া হয়েছে। হেম [সোনা]-এর তৈরি সুতো।

হাঁসুলি কণ্ঠের কিঞ্চিৎ নিম্নভাগে ধৃত এক শ্রেণির কারুকার্যখচিত কণ্ঠাভরণ। এটি দেশীয়, প্রাচীন 'ললন্তিকা' শ্রেণিভুক্ত। প্রাচীন প্রস্তরমূর্তির দেহে এর প্রভূত ব্যবহার দেখে মনে হয়, মধ্যযুগে ভদ্রমহলে এই অলংকারের বিশেষ সমাদার হয়েছিল। বর্তমানে একে হাঁসুলি হার বলে। সোনার বা রুপার চক্রসদৃশ বৃত্তাকার নারীর কণ্ঠভূষণ বিশেষ। দৃষ্টান্ত: 'পিঙ্গনিয়া নাগে পরে গলার হাঁসুলী'— মনসামঙ্গল: বিজয়গুপ্ত। 'গলায় হাঁসুলী গড়িয়ে পরবে নাকি?'— অমৃতলাল বসু।

হারফলক পাঁচলহর হারের নাম। এই হারের উল্লেখ রয়েছে বৃহৎসংহিতায় [৮০/৩০/৩৪]।

হংসক চরণে ধারণীয় আভরণ। সাধারণের নিকট নূপুর নামে পরিচিত। কেউ কেউ বলেন এর আকার কতক অংশে হাঁসের মতো, আবার কারও মতে হাঁসের মতো শব্দের কারণে এই নামকরণ। কাদম্বরীতে নূপুরের শব্দে হংসের আকর্ষণ বর্ণিত হয়েছে, শ্রীহর্ষের কল্পনায় দয়মন্তীর চরণযুগলে বিধির বাহন হংস যুগলকে প্রেরণ করে, চরণদ্বয়ের সহংসকতা সম্পাদন করেছেন [নৈষধ ২/৩৮]।

হাঙ্গরমুখো বালা মহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রাচীন কলকাতার গয়নার মধ্যে এই বালাকে স্থান দিয়েছেন।

হাফ মানতাসা নীচের হাতের গোলাকৃতি যে বালা জাতীয় অলংকার তার উপরের অংশটুকু থাকে, নীচের অংশ ফাঁকা থাকে বলে এই নাম।

হাতপদ্ম হাতের অলংকার। হাতের পাতায় পদ্মাকৃতি অলঙ্কার— সোনা দিয়ে আঙ্গুলের সঙ্গে আটকানো। অনেকটা রতনচূড়ের মতো।

রান্নাঘর

অ

অঁদ্‌ছি রান্না করছি। রাঁধছি। চব্বিশ পরগনার আঞ্চলিক শব্দ।

অধিশ্রয় উনুনে রান্নার হাঁড়ি চাপানো।

অধিশ্রয়ণ উনুনে রান্নার জন্য হাঁড়ি বসানো।

অন্নব্যঞ্জন রান্না করা তরকারি।

অবশ্রয়ণ উনুন থেকে হাঁড়ি প্রভৃতি নামানো।

অরন্ধন রান্না না করার দিন।

অলতিয়া রান্নার হাঁড়ি ডেকচি বগুনা ইত্যাদি কানা বেষ্টন করে ধরার যন্ত্র।

অশ্‌তোর সবজি কাটা বঁটির পাত। এসেছে অস্ত্র থেকে।

আ

আল্‌টা হাঁড়ি-কলসি ইত্যাদি রাখার জন্য খড় দিয়ে তৈরি বিড়া। চব্বিশ পরগনার ভাষা।

আলশানো এলানো ভাত। নষ্ট হয়ে যাওয়া ভাত।

আন্‌স্যা ফ্যান ঝরাবার জন্য ভাতের হাঁড়ি রাখার সামান্য উঁচু জায়গা।

আলুছানা রান্নাঘরের ভাষা, আলুভাতে।

আলুমোলা চব্বিশ পরগনার ভাষায় আলুসিদ্ধ।

আইয়াল আগুন রাখার মালসা

আইচ্ছাল রান্নাঘরের পিছনের দিকে আবর্জনা ফেখার স্থান, আঞ্চলিক ভাষা।

আইট্‌না রান্নাঘরে ধোয়া বাসনকোসন রাখার বেদী বা মাচা বিশেষ। শ্রীহট্টের আঞ্চলিক ভাষা।

আইটা এঁটো। উচ্ছিষ্ট। চব্বিশ পরগনার আঞ্চলিক ভাষা।

আইঠাল রান্নাঘরের পিছনের দিকে আবর্জনা ফেলার স্থান।.

আইঠাশাল রান্নাঘরের আবর্জনা ফেলার স্থান। ফরিদপুরের আঞ্চলিক ভাষা।

আইড্যাল রান্নাঘরের পিছনে যেখানে আবর্জনা ফেলা হয়। ময়মনসিংহের ভাষা।

আইগুাল পাবনার লৌকিক ভাষায় রান্নাঘরের পিছনের আবর্জনার স্থান।

আইড়ি খাবার রাখার জন্য বাঁশের বা বেতের বড় পাত্র। চব্বিশ পরগনার ভাষা।

আইরেট ঝাল রান্নাঘরের শব্দ, অধিক ফলনশীল ছোট লঙ্কা। শব্দটি এসেছে I.R.-8 থেকে।

আইলা আগুনের মালসা।

আইল্যা আগুন রাখার মালসা।

আইলসা আগুনের মালসা।

আইশ্‌টা কাঁচা মাছের আঁশ থাকার কারণে যে আঁশটে গন্ধ।

আঁইষ্টল মাছের কাঁটাসহ আবর্জনা যে স্থানে ফেলা হয়। মালদা অঞ্চলের ভাষা।

আইস্টান রান্নাঘরের সব আবর্জনা রান্নাঘরের পেছনে যে জায়গায় ফেলা হয়। কোচবিহারের আঞ্চলিক ভাষা।

আউটানো রান্নার উনুনে দুধ ইত্যাদি জ্বাল দিয়ে ঘন করা। [আবর্ত্তন আবট্টন>] চব্বিশ পরগনার ভাষা।

আউরি খেজুর গাছের শুকনো বেগো বা ডালপালা যা দিয়ে উনুন ধরানো হয়। চব্বিশ পরগনার ভাষা।

আউশে বেগুন রান্নাঘরের শব্দ, বর্ষাকালে হওয়া বেগুন।

আউসে ভারা কুমড়ো বর্ষকালে মাচায় হওয়া কুমড়ো। রান্নাঘরের শব্দ।

আক উনুন। (স. অন্তিকা)।

আঁকা উনান

আখা (স. উখা) উনুন।

আখাল আগুন রাখার পাত্র বিশেষ।

অগ্নিপক্ক আগুনে পাক করা।

আগুনে রাখা রান্না জিনিস দীর্ঘ সময় গরম রাখার জন্য কাঠ-কয়লার উনুনের আঁচে বসিয়ে রাখা।

আগুনের পাতিল তুষ ঘুঁটের আগুন রাখার চেপটা ধরনের পাত্র।

আগুনের ভাণ্ডি দীপশলাকা। দেশলাই।

আঁচ কয়লার উনুন, কাঠের উনুন— দু রকম উনুনকেই বোঝায়। [স. আর্চ্চিস। অচ্চি > আচি > আচ।]

আঁচঝাড়া উনুন খোঁচানোর কাঠি।

আচের উনুন কয়লার উনুন।

আচমনি জিনিস উনুনে কোনও কিছু শস্য ভাজা।
আচাইল রান্নাঘরের পিছনে আবর্জনা ফেলার স্থান।
আঁচা নিশান ঢাকার আঞ্চলিক ভাষায় রান্নাঘরের পিছনে যেখানে আবর্জনা ফেলা হয়।
আতলা পাকপাত্র। নানান ধরনের হাঁড়ি।
আঁত্‌লা খড় বা বিচালি দিয়ে তৈরি বিড়া।
আতালি জল রাখার বিস্তৃত মুখবিশিষ্ট মাটির পাত্র। চব্বিশ পরগনার আঞ্চলিক ভাষা।
আদপালি বেত দিয়ে তৈরি পরিমাণ মাপার পাত্র। (আধপানি=১ কেজি ২৫০ গ্রাম)
আদাড় রান্নাঘরের পিছনের দিকে অপরিচ্ছন্ন স্থান, যেখানে আবর্জনা ফেলা হয়।
আঁদাড় আঁস্তাকুড়।
আদাউন রান্নাঘরের পিছনে যেখানে আবর্জনা ফেলা হয়। শ্রীহট্টের আঞ্চলিক ভাষা।
আধলা শস্যাদি মাপার বেতের পাত্র।
আধসের বেতের তৈরি আধ সের চাল মাপার পাত্র।
আন্‌জাত আন্দাজ। রান্নাঘরের শব্দ।
আনজের বাজরা তরিতরকারির ঝুড়ি। চব্বিশ পরগনার ভাষা।
আনতি মাঝারি হাঁড়ি। চট্টগ্রামের ভাষা।
আন্ধন ঘর রান্নাঘর। চব্বিশ পরগনার ভাষা। রন্ধন > আন্ধন হয়েছে লোকমুখে।
আন্নন ঘর যে ঘরে রান্না করা হয়।
আন্না রান্না
আন্নাপূজা রান্না পূজা। অরন্ধন পূজা। একটি লোকাচার অনুষ্ঠান। ভাদ্র সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত পূজা। অরন্ধনের আগের রাতে ভাত ও ভাজা ব্যঞ্জন তৈরি করে রাখা হয়, অরন্ধনের দিন খাওয়া হয়।
আঙই ডালা আটা চালুনি। চব্বিশ পরগনার ভাষা।
আংশাল যে ঘরে রান্না করা হয়। উত্তরবঙ্গের ভাষা।
আংটা আগুন রাখার পাত্র বিশেষ।
আপখুরা জল খাবার পাত্র বিশেষ। এর গলা সরু, পেটমোটা, কানা বাইরের দিকে হেলান এবং তলদেশে খুরা থাকে। অনেকে 'আবখুরা'ও বলেন।
আবসি সবজি রান্নাঘরের আবর্জনা। চব্বিশ পরগনার ভাষা।
আমিষ ঘর যে ঘরে আমিষ নিরামিষ দুই রান্নাই হয়।
আমানি পান্তাভাতের জল। চব্বিশ পরগনার ভাষা।

আড়োং নারকেল মালার হাতা বিশেষ। যশোহরের আঞ্চলিক ভাষা।
আড়ি ধান-চাল মাপার বেত বা বাঁশের তৈরি পাত্র বিশেষ।

ই

ইঁদারা রান্না ও সংসারের জলের প্রয়োজনে বাড়িতে কাটা কুয়ো। অনেকে 'ইন্দারা' বলেন।

উ

উখা উনান।
উগর রান্নাঘরের ভিতরে অল্প পরিমাণে ধান-চাল, কলাই, সরষে, চিঁড়া-মুড়ি, হাঁড়ি ইত্যাদি রাখার উঁচু মাচা। অনেকে 'উগার'-ও বলেন।
উছিষ্টাল রান্নাঘরের পিছনে উচ্ছিষ্ট, আবর্জনা ইত্যাদি ফেলার জায়গা।
উঁতো ভিজে কাঠ বা ঘুঁটে উনুনের উপরে রেখে গরম করা বা শুকনো করার ব্যবস্থা।
উনন রন্ধনচুল্লি। 'উনান' বা 'উনুন' নামেও এর পরিচয় রয়েছে।
উননের ঝিক উননের উপর তিন দিকে মাটি দিয়ে ত্রিকোণাকৃতি করে দেওয়া স্থান, যেখানে আগুনের উত্তাপ তিন দিক থেকে বেরিয়ে যেতে পারে।
উঁপুল বীরভূমের ভাষায় ঘুঁটে।
উড়কিমালা শুকনো নারকেলের মালার হাতা বিশেষ।
উড়লি বর্ধমানের ভাষায় রান্নাঘরের ব্যবহৃত ন্যাকড়া। অনেকে 'উড়ুলি'ও বলেন।
উড়ুন মুর্শিদাবাদের ভাষায় নারকেল মালার হাতা। অনেকে 'উড়ুম'-ও বলেন।
উড়ি নারকেলের শুকনো মালা দিয়ে তৈরি হাতা।
উশিট্টাল রান্নাঘরের পিছনে উচ্ছিষ্ট আবর্জনা ইত্যাদি ফেলার স্থান।

এ

এঁদো পুকুর এ-পার বাংলা ও-পার বাংলা সব গ্রামেই রান্নাঘরের একটু দূরে কলাগাছের ঝাড়ে জঙ্গলে ঘেরা ছোট পুকুর, যেখানে সূর্যের কিরণ খুব একটা ঢোকে না— আধো অন্ধকার বলে এই পুকুর আন্ধাপুকুর বা এঁদো পুকুর নামে পরিচিত। এই পুকুরে বাসনকোসন ধোয়া, কাপড় কাচা হয়, কখনও বা রান্নাবান্নার জলও এই সব পুকুর থেকে তোলা হয়।
এঁট্যাতল মুর্শিদাবাদের ভাষা। রান্নাঘরের পিছন দিকে আবর্জনা ফেলার জায়গা।
এলানো রান্না করা ব্যঞ্জন পচে যাওয়া অবস্থা।

ও

ওনচানো মুড়ি ভাজার জন্য চাল প্রস্তুত করা।

ওরসা শোবার ঘরের সঙ্গের বারান্দা রান্নাঘর রূপে ব্যবহৃত হয়। ফরিদপুর অঞ্চলে 'ওসসা' উচ্চারণে ব্যবহৃত হয়।

ওড় নারকেল মালার হাতা বিশেষ। অনেকে 'ওড়ং' বা 'ওড়োং'-ও বলেন।

ক

কউট্যা ঢাকনাযুক্ত ছোট পাত্র।

কটরা ঢাকনাযুক্ত ছোট পাত্র।

কটাহ আংটাযুক্ত চিতড়ে (চওড়া) মুখের রন্ধন পাত্র।

কটুয়া ঢাকনাযুক্ত ছোট পাত্র।

কটুয়্যা ঢাকনাসহ ছোট পাত্র বিশেষ।

কটোরা যে ছোট পাত্রের ঢাকনা রয়েছে।

করপা তরল কিছু ঢালার ফাঁদাল মুখ-নল।

কড়া আংটাযুক্ত চওড়া মুখের রান্না করার পাত্র।

কড়াই আংটাসহ রান্না করার চওড়া মুখের পাত্র বিশেষ।

কড়াহা আংটাযুক্ত চিতরে মুখের রন্ধন পাত্র।

কড়ুই চব্বিশ পরগনার আঞ্চলিক শব্দে আংটাসহ রান্নার চওড়া মুখের পাত্র বিশেষ।

কড়ুয়া পূর্ব বঙ্গের আঞ্চলিক ভাষায় রান্না করার চওড়া মুখের আংটাসহ পাত্র বিশেষ।

কলস কানাযুক্ত পেটমোটা জলপাত্র।

কলা ত্রিপুরা-চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় কানাযুক্ত পেটমোটা জলপাত্র বিশেষ।

কল্য শস্য ইত্যাদি ঝেড়ে ধুলোমাটি কাঁকর ইত্যাদি পৃথক করায় চ্যাপটা ধরনের বাঁশের পাত্র, অনেকে কুলো বলেন।

কাইড়া বাঁশের পাব থেকে তৈরি তেলের আধার।

কাগমলা রান্নার হাঁড়ি কড়া যেখানে তুলে রাখা হয়। শ্রীহট্টের ভাষা।

কাচটি উনুন জ্বালাবার পাঁকাটি।

কাচন ছোট বাটি।

কাচলা মাটির চ্যাপটা ধরনের হাঁড়ি বিশেষ।

কাছলা চ্যাপটা ধরনের মাটির হাঁড়ি।

কাটাইল কর্তনাস্ত্র। দা।

কাটারি বঁটি-দা।

কাটুরি কাঠের বাটি।
কাটি দীপশলাকা। দিয়াশলাই। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভাষা।
কাঠকো কাঠের গামলা।
কাঠালের পিঁড়ি কাঁঠাল গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি বসার পিঁড়ি এক সময় রান্নাঘরের সম্মান বাড়াতো।
কাঠুরা কাঠের বাটি।
কাঠা কুনকো জাতীয় দুশো/আড়াইশো গ্রাম চিঁড়ে-মুড়ি ধরে এমন ছোট পাত্র। চব্বিশ পরগনার ভাষা।
কাঠো কাঠের বাটি।
কাঠুরি কাঠের তৈরি ছোট গামলা।
কাতরা মাটির ছোট হাঁড়ি।
কাতনা কাটারি।
কাতা বড় কাটারি। বড়-দা।
কাতান কাটারি।
কাতারি মাটির ছোট হাঁড়ি।
কাঁদাল রান্না ঘরের পিছনে আবর্জনা ফেলার জায়গা।
ক্যাদাল আবর্জনা ফেলার জন্য রান্নাঘরের পিছনে যে নির্দিষ্ট স্থান।
কানতাই উত্তরবঙ্গের ভাষায় আংটাযুক্ত চওড়া মুখের রান্নার পাত্র।
কানা হাঁড়ি-কলসির প্রান্ত ভাগ। মেদিনীপুরের ভাষায় রান্নাঘরে ব্যবহৃত ন্যাকড়া।
কানি রান্নাঘরে ব্যবহৃত ছিন্নবস্ত্র বা ন্যাকড়া।
কান্তি মুর্শিদাবাদের ভাষায় আংটাযুক্ত চওড়া মুখের রান্নার পাত্র।
কাপ এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে তরল পদার্থ ঢালার ফাঁদাল মুখ নল।
কাপা তরল পদার্থ ঢালার ফাঁদাল মুখ নল।
কার রান্নাঘরের উঁচুতে জিনিসপত্র রাখার বাঁশের মাচা।
কারফা কানাযুক্ত পেটমোটা জল পাত্র। বড় গলা, মধ্যভাগ স্ফীত, নিম্নাংশ সরু, অর্ধডিম্বাকৃতি জলের কলসি।
কাড়া যশোর অঞ্চলের ভাষায় বাঁশের পাব থেকে তৈরি তেলের আধার।
কাঁড়িয়া বাঁশের পাব থেকে তৈরি তেলের আধার।
কাঁসর কাঁসার তৈরি কানা উঁচু ছোট থালা।
কাসন্দি সরষে গুঁড়ো সহযোগে তৈরি জলীয় আচার বিশেষ। অন্য নাম কাসুন্দি, কাসন, কাশন্দি।

কাঁসি কাঁসার তৈরি কিনারা উঁচু ছোট থালা।

কুচি চাল মুড়ি ইত্যাদি ভাজার সময় হাঁড়ি-কড়াতে বাঁশ বা নারকেলের কাঠির যে গুচ্ছ দিয়ে নাড়তে হয়।

কুঁজা সরু গলা পেটমোটা জলপাত্র।

কুঁজো ক্ষীণকণ্ঠ স্ফীতোদর জলপাত্র বিশেষ। এর গায়ে ফুল লতাপাতা ইত্যাদি হাতের শিল্পকর্মও শোভা পায়।

কুটনা রান্নার জন্য খণ্ড খণ্ড করে কাটা তরকারি।

কুটুরি কাঠের ছোট বাটি।

কুটি মাটির গোলাকার হাঁড়ি।

কুঠার রান্নার উনুনের জন্য কাঠ চেরাই করার হাত-যন্ত্র বিশেষ।

কুতলি যশোর খুলনার ভাষা। মাটির ছোট বেদি, এর উপরে ভাতের হাঁড়ি রেখে ফেন গালা হয়।

কুনি চাল ইত্যাদি মাপার বেত বা বাঁশের তৈরি ছোট পাত্র।

কুনিকা বেত বা বাঁশের তৈরি ছোট পাত্র যা দিয়ে চাল ইত্যাদি মাপা যায়। অনেক স্থানে কুনকে বা কুঞ্জিও বলে।

কুপনা বাঁশের কাঠি দিয়ে তৈরি মাছের চুপড়ি।

কুপলা মাছের চুপড়ি।

কুপা পেট মোটা সরু গলা মাটির পাত্র যার মধ্যে তেল ইত্যাদি রাখা হয়।

কুপি কেরোসিনের আলোর পেটমোটা সরু গলা ডিবা বা লম্ফ বিশেষ।

কুমো তেলের বড় আধার।

কুরইন নারকেল ইত্যাদি কুরাবার দাঁতওয়ালা অস্ত্র বিশেষ।

কুরনি নারকেল কুরাবার দাঁতওয়ালা বটি।

কুরানি নারকেল কুরবার যন্ত্র।

কুরুনি দাঁতওয়ালা বঁটি যা দিয়ে নারকেল ইত্যাদি কুরানো হয়।

কুড়প চাল মাপার কাঠের কুনিকা। অনেকে কুড়বও বলেন।

কুড়ি লম্বাটে ধরনের নুন মাপার মাটির পাত্র।

কুড়ুল রান্নার উননের জন্য কাঠ চেরাই করার হাত-যন্ত্র।

কুলকে চাল ইত্যাদি মাপার বেত বা বাঁশের ছোট পাত্রবিশেষ।

কুলঙ্গি রান্নাঘরে জিনিসপত্র রাখার দেওয়ালের খুপরি। কুলুঙ্গি বা কোলঙ্গা নামেও পরিচিত।

কুলা শস্যাদি ঝাড়ার জন্য বাঁশের তৈরি পাত্র।

কুলো শস্য ইত্যাদি ঝেড়ে ধুলো মাটি কাঁকর ইত্যাদি পৃথক করার চ্যাপটা ধরনের বাঁশের পাত্র।

কেটো কাঠের ছোট বাটি।

কেঠকো কাঠের ছোট গামলা। অনেকে 'কাঠকো'ও বলেন।

কেঠো কাঠের বাটি।

কেঁড়ে বাঁশের পাব থেকে তৈরি তেলের আধার।

কেলে হাঁড়ি কাঠের আগুনে রান্না করা কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যাওয়া হাঁড়ি।

কৈলা পূর্ববঙ্গের ভাষায় মাটির বড় জালা।

কোঁচা মেদিনীপুরের ভাষায় কুনকে জাতীয় পাত্র। চাল ইত্যাদি মাপার বেত বা বাঁশের ছোট পাত্র বিশেষ।

কোনা চাল ইত্যাদি মাপার কুনকে জাতীয় পাত্র।

কোঁপা ছোট হাঁড়ি। বর্ধমান অঞ্চলের ভাষা।

কোল হাঁড়ির ঢাকনা।

কোলা মাটির বৃহৎ জালা বিশেষ। পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষায়।

খ

খইচালা খই থেকে ধান পৃথক করার বাঁশের চালুনি।

খঞ্চা কাঠের থালা, বারকোশ।

খন্তি রান্নার সময় ভাজা, তরকারি ইত্যাদি ওলটাবার জন্য এক মাথা চ্যাপটা লোহা ইত্যাদির কাঠি বিশেষ।

খড়া বেতের তৈরি ধামা।

খড়ি জ্বালানি কাঠ বাঁশ ইত্যাদি।

খলই পূর্ববঙ্গের ভাষায় বাঁশের পাতের তৈরি মাছের চুপড়ি।

খলাই বাঁশের পাত দিয়ে তৈরি মাছের চুপড়ি।

খলি মাছের চুপড়ি, বাঁশের পাত দিয়ে তৈরি।

খাদা পাথরের বাটি।

খাঞ্চা কাঠের থালা। বারকোশ।

খাপরি মাটির হাঁড়ি, ডাল ঝোল রাঁধতে, মুড়ি ভাজতে ব্যবহৃত হয়। বীরভূমে 'খাপুরি' বলে।

খারই বাঁশের পাতের তৈরি মাছের চুপড়ি।

খারি আনাজ-তরকারি, চাল ইত্যাদি ধোবার বাঁশের সরু কাঠির তৈরি ধুনুচি বিশেষ।

খালুই মাছের যে চুপড়ি বাঁশের পাত দিয়ে তৈরি।

খুঁচি বেতের তৈরি চাল মাপার ছোট পাত্র।

খুঞ্চি কাঠের থালা। বারকোশ।

খুন্তি রান্নার সময় ভাজা, তরকারি ইত্যাদি ওল্টাবার জন্য এক মাথা চ্যাপটা লোহা ইত্যাদির কাঠি বিশেষ।

খুবি চাল ইত্যাদি মাপার বেত বা বাঁশের ছোট পাত্র। মেদিনীপুরের ভাষা।

খুরি মাটির গেলাস।

খুল্লা যেখানে রান্নার হাঁড়ি-কড়া তুলে রাখা হয়।

খুলি রস জ্বল দেওয়ার হাঁড়ি বিশেষ। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভাষা।

খেলই যশোরের ভাষায় মাছের চুপড়ি।

খোলা খই চিঁড়ে মুড়ি ইত্যাদি ভাজার পাত্র বিশেষ।

খোলা কাঠি নারকেলের বা বাঁশের যে কাঠিগুচ্ছ খই চিঁড়ে মুড়ি ইত্যাদি ভাজার সময় হাঁড়ি কড়াতে নাড়তে হয়।

খোলার পাতিল খই চিঁড়ে মুড়ি ইত্যাদি ভাজার পাত্র বিশেষ।

খোলার হাঁড়ি উনুনে যে হাঁড়িতে খই চিঁড়ে মুড়ি ইত্যাদি ভাজা হয়।

খোরা খুরাযুক্ত বাটি। কাঁসার বা পাথরের বাটি। চক্রাকারে খুরাযুক্ত বলে একে 'ঢাকাই বাটি'ও বলে।

খিড়কি দরজা রান্নাঘরের পাশ দিয়ে বাড়ির পিছনের পুকুরে যাওয়ার দরজা।

গ

গরম ভাজা খেতে বসিয়ে রান্নাঘরে উনুনে গরম গরম ভেজে পরিবেশন করা।

গাগরা কানাযুক্ত পেট মোটা জলপাত্র

গাগরি ছোট ঘড়া।

গাঁচৈ গোবর ধরানো জ্বালানি-কাঠি।

গাছপিড়ি গাছের সরু গুড়ি বা মোটা ডাল এবড়ো খেবড়ো করে কুপিয়ে তৈরি করা পিঁড়ি ধরনের আসন।

গাভলা গামলা। আঞ্চলিক উচ্চারণ।

গামলা পর্তুগীজ Gamella বলয়াকার বিস্তৃত মুখ তলদেশ অর্ধবৃত্তাকার অথবা চ্যাপটা বড় ধরনের ধাতু, কাঠ বা মাটির তৈরি পাত্র বিশেষ।

গিলাস পানপাত্র বিশেষ।

গুচকি যেখানে রান্নার হাঁড়ি-কড়া ইত্যাদি তুলে রাখা হয়।
গুল কয়লার গুঁড়োর গুলি যা কয়লার উনুনের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
গেলাস পানপাত্র বিশেষ।
গোরা পেটমোটা সরু মুখের বড় জালা, এর মধ্যে চাল, গুড় ইত্যাদি রাখা হয়।
গৌচে চাল ইত্যাদি ধোয়ার সচ্ছিদ্র পাত্র বিশেষ।

ঘ

ঘইলা কানাযুক্ত পেটমোটা জলপাত্র। অনেকে 'ঘয়লা'ও বলেন।
ঘটি ঘটের ন্যায় ধাতুনির্মিত সব সময় ব্যবহারের ছোট জলপাত্র।
ঘুটনি ফুটন্ত ডাল ইত্যাদি ঘোঁটার কাঠি বিশেষ।
ঘড়া কানাযুক্ত পেটমোটা ধাতুনির্মিত কলস।

চ

চঙ এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে তরল পদার্থ ঢালার ফাঁদালের নল-মুখ।
চচলা আংটাযুক্ত চওড়া মুখের রন্ধন পাত্র। উত্তর বঙ্গের ভাষা।
চণ্ডীশাল রান্নাঘর। পাত্রী নির্বাচনে এক সময় রান্না জানা পাত্রীর প্রধান গুণ বলে বিবেচিত হত। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গল-এ পাত্রপক্ষের কাছে ফুল্লরার গুণের পরিচয় দিতে বলেছেন:

> 'রন্ধন করিতে ভাল এই কন্যা জানে।
> যত বন্ধু আইসে তারা কন্যাকে বাখানে।।'

কুমারী ব্রতে বলা হত— 'মরিয়া মনুষ্য হব, দ্রৌপদী মত রাধুনী হব।' বৈষ্ণব গীতিতে শিব-ঘরণী চণ্ডী পাকা রাঁধুনি বলে বর্ণনা করেছেন, প্রচীন বৃদ্ধাগণ বলেন চণ্ডী রন্ধনশালার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তাঁর কৃপাদৃষ্টির উপরই রন্ধনের উৎকর্ষ নির্ভর করে। সেই কারণে রান্নাঘরকে 'চণ্ডীশাল' বলা হয়। কোনও সামাজিক ক্রিয়ায় রন্ধনকার্য শুরুর আগে সেখানে চণ্ডীর ঘট বসিয়ে রাঁধুনিগণ পূজা দিয়ে নিতেন।
চইর‍্যা বড় মুখের গোল, নীচটা অর্ধবৃত্তাকার বা চ্যাপটা বড় পাত্র। অনেকে 'চরিয়া'ও বলেন।
চরা নারকেল মালার হাতা বিশেষ।
চাকাই বাটি কাঁসার বা পাথরের বাটি। এর নীচে চক্রাকারে খুরাযুক্ত বলে এই নাম।
চাকিয়া যে জলখাবার পাত্রের গলা সরু, পেটমোটা, কানা বাইরের দিকে হেলান

এবং তলদেশে খুরো থাকে। মুর্শিদাবাদের ভাষা।

চাঙরি বাঁশের তৈরি চুবড়ির মতো পাত্র।

চাঙারি এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে তরল পদার্থ ঢালার ফাঁদালের নল-মুখ।

চাঁচনি যা দিয়ে কড়াই প্রভৃতি চাঁছা হয়। অনেকে চাঁছনিও বলেন।

চাটাই তালপাতার তৈরি বসার আসন। অনেকে 'চেটাই' বলেন।

চাঁপুই হাঁড়ি সাধারণত দুধ জ্বাল দেওয়া হয় এমন মাঝারি ধরনের হাঁড়ি। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভাষা।

চামচ অন্নব্যঞ্জনাদি তোলার ছোট হাতা। কেউ কেউ 'চামচে'ও বলেন।

চারা ঝিঁকের পাশ দিয়ে উনুনের ভেতরের আগুনের যে শিখা বের হয়।

চাড়ি উত্তরবঙ্গের ভাষা। কাঠের বা টিনের টব, যার উপর হাঁড়ি কড়াই রাখা হয়। তলা গোল বিস্তৃত মুখ মাটির বড় পাত্র।

চালা চালনি। যা দিয়ে বিভিন্ন দ্রব্য চালা হয়।

চালুনি শস্যাদির মধ্যে থাকা অখাদ্য অংশ বাদ দিতে যে ছিদ্রবহুল পাত্র ব্যবহার করা হয়।

চিমটা কোনও কিছু ধরার লৌহনির্মিত যন্ত্র বিশেষ।

চুকরা বাঁশের পাতের তৈরি মাছের চুপড়ি।

চুকা কানা যুক্ত পেটমোটা জলপাত্র। মেদিনীপুরের ভাষা

চুকাই পেটমোটা কানাযুক্ত জলপাত্র।

চুঙি এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে তরল পদার্থ ঢালার ফাঁদালের নল-মুখ।

চুপরা বাঁশের পাতের তৈরি মাছের চুপড়ি। অনেকে 'চুপড়ি' বলেন।

চুবড়ি ছোট ঝুড়ি।

চুমকি ঘটি যে জল খাবার পাত্রের গলা সরু, পেটমোটা, কানা বাইরের দিকে হেলান এবং তলদেশে খুড়ো থাকে।

চুলা উনুন।

চুলো উনান।

চুলোশাল যে ঘরে রান্না করা হয়। মুর্শিদাবাদ, বীরভূমের ভাষা।

চুলী উনুন।

চেঙ্গারি বাঁশের সরু কাঠি দিয়ে তৈরি ধুচুনি, যা আনাজ তরকারি, চাল ইত্যাদি ধোওয়ার কাজ করে।

চেলো নারকেল বা বাঁশের কাঠির গুচ্ছ, যা খই, চিড়ে, মুড়ি ইত্যাদি ভাজার সময় হাঁড়ি-কড়াতে কুচি বা চেলো দিয়ে নাড়তে হয়। জলপাইগুড়ি, কোচবিহারের ভাষা

চৌকা উনুন।

চৌখস রান্নায় সব দিক থেকে শ্রেষ্ঠ যিনি।

ছ

ছলনা রান্নার সময় ভাজা তরকারি ইত্যাদি ওলটাবার জন্য এক মাথা চ্যাপটা লোহা ইত্যাদির কাঠি বিশেষ।

ছাঁইচ ন্যাকড়া।

ছাঁচকুড় রান্নাঘরের পিছনে আবর্জনা ফেলার স্থান।

ছাঁচিতেল সরিষার তেল।

ছানতা যা দিয়ে ছেঁকে তোলা হয়।

ছিকা হাঁড়ি কলসি শিশি বোতল ইত্যাদি ঝুলিয়ে রাখার জন্য পাট বা সুতোর দড়ি দিয়ে তৈরি আধার। অনেকে ছিপা, ছিক্যা বা ছিকিয়াও বলেন।

ছিটাল রান্নাঘরের পিছনে আবর্জনা ফেলার স্থান।

ছেনা রান্নার সময় তরকারি বা ভাজা ইত্যাদি ওলটাতে মাথা চ্যাপটা লোহা ইত্যাদির কাঠি বিশেষ। অনেকে 'ছেনি' বলে।

ছেলো নারকেলের বা বাঁশের কাঠির গুচ্ছ, যা দিয়ে খই, চিড়ে, মুড়ি ইত্যাদি ভাজার সময় হাঁড়ি-কড়াতে গুচ্ছের কুচি নাড়তে হয়। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার অঞ্চলের ভাষা।

জ

জাগা আগুনের মালসা

জালই পাকপাত্র। নানান গড়নের হাঁড়ি।

জামবাটি কাঁসার বড় বাটি।

জাম খোরা বড় কাঁসার বাটি।

জাঁকা আগুন জ্বালাবার জন্য খড় দিয়ে লম্বা ও মোটা গদাকৃতি জিনিস তৈরি করা হয় যার এক মুখে আগুন থাকে যা সাধারণত নিভে যায় না।

জুড়ান ঠান্ডা।

ঝ

ঝক রান্নার হাঁড়ি-কড়া যেখানে তুলে রাখা হয়। উত্তরবঙ্গের ভাষা।

ঝরকা ফেন, জল ইত্যাদি ফেলার জন্য রান্নাঘরের দেওয়ালে যে ছিদ্র করা হয়।

ঝাল্লে জঞ্জাল।

ঝিঁক উনানের যে তিনটি মৃৎপিণ্ডের উপর হাঁড়ি-কড়াই বসানো হয়। মাটির উনুনের তিনটি উঁচু অংশ, রান্নার জন্য যার উপরে হাঁড়ি-কড়া বসানো হয়।

ঝাঁঝরি হাঁড়ি চাল ধোওয়ার হাঁড়ি। হাঁড়ির নীচের দিকে ছোট ছোট ছিদ্র করা থাকে।

ট

টউ পাক পাত্র। নানান গড়নে তৈরি হাঁড়ি।

টংগ যেখানে রান্নার হাঁড়ি-কড়া তুলে রাখা হয়। শ্রীহট্টের ভাষা

টানাকাঠি বর্ধমান অঞ্চলের ভাষা, দেশলাই, দীপশলাকা।

টিইরি চট্টগ্রামের ভাষা, উনুন।

টিকরি উনুন, ময়মনসিংহের ভাষা।

টিপ এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে তরল পদার্থ ঢালার ফাঁদাল মুখ। অনেকে 'টিপনি' বলেন।

টিয়ারি চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভাষা, উনুন।

টুকরি ছোট ঝুড়ি।

টুকি চাল ইত্যাদি ধোওয়ার সচ্ছিদ্র পাত্র বিশেষ।

টুকুই বর্ধমান অঞ্চলের ভাষা, চাল ইত্যাদি ধোওয়ার জন্য সচ্ছিদ্র যে পাত্র ব্যবহার করা হয়। অনেকে 'টুকোই'ও বলেন।

টোকা মুর্শিদাবাদের ভাষা, সচ্ছিদ্র যে পাত্রে চাল ইত্যাদি ধোওয়া হয়।

টেঁপি ল্যাম্প।

ঠ

ঠনা মাটির ছোট বেদি, এর উপর ভাতের হাঁড়ি রেখে ফেন গালা হয়। ময়মনসিংহের ভাষা।

ঠাকা আনাজ-তরকারি, চাল ইত্যাদি ধোওয়ার বাঁশের সরু কাঠির তৈরি ধুনুচি বিশেষ। মেদিনীপুরের ভাষা।

ঠিকে চাল ইত্যাদি মাপার বেত বা বাঁশের ছোট পাত্র বিশেষ। মুর্শিদাবাদের ভাষা।
ঠিলি কানাযুক্ত পেটমোটা জলপাত্র। কলসি। চট্টগ্রাম অঞ্চলে এই কলসিকে 'ঠেল্যা' বলে।

ড

ডখি নানান গড়নের রান্নার পাত্র।
ডাইল ঘোঁটা খড়ি ফুটন্ত ডাল ঘোঁটার কাঠি। মালদা অঞ্চলের ভাষা।
ডাবরা কানাযুক্ত পেটমোটা জলপাত্র। কলসি।
ডাবরি লম্বাটে ধরনের গুড়ের কলসি।
ডাবুর নারকেল মালার হাতা বিশেষ।
ডাবোর ঘড়া।
ডাল ঘুটনি ডাল সিদ্ধ হওয়ার পর x চেরা চিহ্নের কাঠি যা দিয়ে ডাল ঘোঁটা হয়।
ডাল ঘুরনি ডাল ঘোঁটার কাঠি।
ডালের কাঁটা লোহা বা কাঠের x চিহ্নের ডাল ঘোঁটার কাঁটা বিশেষ।
ডালের কাটি ডাল ঘোঁটার কাঠি বিশেষ। অনেকে 'ডালের কাঠি'ও বলেন।
ডেক রান্নার বড় পাত্র।
ডেকচি পাকপাত্র।
ডেগ নানান গড়নের হাঁড়ি। পাকপাত্র।
ডোই ফুটন্ত জল ঘোঁটার কাঠি।
ডোলা বাঁশের পাতের তৈরি মাছের চুপড়ি।
ডোবা রান্নাঘরের পাশের ছোট জলাশয়।

ঢ

ঢাকুন সরা। হাঁড়ির ঢাকনি।
ঢাকনা হাঁড়ির মুখ ঢাকার পাত্র।

ত

তই অগভীর কড়াই।
তবাসি জলীয় পদার্থ জ্বাল দেওয়ার সময় যে কাঠি ব্যবহার করা হয়।
তরকারি রন্ধন করার যোগ্য শাকসবজি ইত্যাদি।
তাওয়া ধাতু নির্মিত রুটি সেঁকার পাত্র। আগুনের মালসা।

তাক রান্নাঘরে জিনিসপত্র রাখার জন্য দেওয়াল সংলগ্ন কাঠের থাক।

তাত রান্না করা দ্রব্য উনুন থেকে নামাবার সঙ্গে সঙ্গে যে গরম তা।

তালাশি চট্টগ্রামের ভাষা। ফুটন্ত ডাল ইত্যাদি ঘোঁটার জন্য যে মাথা x চেরা কাঠি ব্যবহার করা হয়।

তিউড়ি সাময়িক কাজ চালাবার জন্য তৈরি ছোট উনুন। ইট ও কাদা দিয়ে তৈরি উনুন।

তিজল রান্নার মাটির হাঁড়ি।

তিজেল নানান গড়নের পাকপাত্র।

তিয়াড়ি উনুন। বাঁকুড়া, বীরভূমের ভাষা।

তেনা পূর্ববঙ্গের ভাষা, রান্নাঘরে ব্যবহৃত ন্যাকড়া। অনেকে ত্যানা বলেন।

তেড়ং বেড়ং আগোছালো রান্নাঘর।

তেলাপোকা রান্নাঘরের পোকা আরশোলা।

তেলো হাঁড়ি ভাত রান্না করার নানান গড়নের হাঁড়ি।

দ

দয়ে হাঁড়ি দই পাতার হাঁড়ি বিশেষ।

দন শস্য মাপার পাত্র। ধান বা শস্যাদি রাখার বেতের অর্ধবৃত্তাকার ঠানবোনা পাত্র। মুর্শিদাবাদের ভাষা।

দপলা শস্য ইত্যাদি ঝেড়ে ধুলো মাটি কাঁকর ইত্যাদি পৃথক করার চ্যাপটা ধরনের বাঁশের পাত্র। কুলো।

দমসম রান্নাঘরের ভাষা, রান্নাঘরের দমবন্ধ হওয়া অবস্থা।

দড়কচা সিদ্ধ না হওয়া। আধসিদ্ধ রান্নার দ্রব্য।

দর্বি রন্ধনকার্যে ব্যবহৃত বড় হাতা।

দল চাল ইত্যাদি মাপার বেত বা বাঁশের ছোট পাত্র বিশেষ। চব্বিশ পরগনার ভাষা।

দলন হাঁড়ি অনেকটা লম্বা ধরনের বড় হাঁড়ি। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভাষা।

দা কাটারি।

দাওড়া মেদিনীপুরের ভাষায় বাঁশের বড় ঝুড়ি।

দাওলি মুর্শিদাবাদের কথ্য ভাষায় সাধারণ দা। কাটারি। অনেকে 'দাউলি' বলেন।

দাবালি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লৌকিক শব্দে দা।

দামথুম লৌকিক শব্দ, বড় চামচ।
দিয়াবাতি দীপশলাকা। দেশলাই। যা দিয়ে উনুন ধরানো হয়।
দিয়াশলাই দীপশলাকা। অনেকে 'দেশলাই' বলেন।
দুআখি উনুন।
দেকাটি উনুন ধরাবার দীপশলাকা।
দোন শস্য মাপার পাত্র।
দোপাখা হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান অঞ্চলের একমুখ বিশিষ্ট জোড়া উনুন। এতে. এক সঙ্গে দুটি হাঁড়ি বসিয়ে রান্না করা যায়।
দোল চাল ইত্যাদি মাপার বেত বা বাঁশের ছোট পাত্র বিশেষ।
দোশুন মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের ভাষা। ভাঁড় থেকে তোলার লোহার পলা। অনেকে 'দাশুন' বলেন।

ধ

ধাপড়া পাবনা, রাজসাহি, বগুড়া অঞ্চলে শস্য ইত্যাদি ঝেড়ে মাটি কাঁকর পৃথক করার জন্য ব্যবহৃত কুলোর নাম।
ধামা শস্যাদি বহন করার বা রাখার বেত দিয়ে তৈরি অর্ধবৃত্তাকার ঠাস বোনা বড় পাত্র।
ধামি শস্যাদি রাখার ছোট ঝুড়ি।
ধুচন চাল ইত্যাদি ধোওয়ার সচ্ছিদ্র পাত্র বিশেষ। অনেকে ধুচনি বা ধুচুনি বলেন।

ন

নরাজ খুন্তি। মেদিনীপুরের ভাষা।
নাইন্দা তলা গোল বিস্তৃত মুখ মাটির বড় পাত্র।
নাকরি ডালের কাটা। অনেকে 'নাকারি'ও বলেন।
ন্যাকড়া যিনি বাচ্চা মেয়েদের মতো রান্না করতে ভালবাসেন। রান্নাঘরে ব্যবহার করা কাপড়। অনেকে 'নেকড়া' বলেন।
নাগরি বিশেষ ধরনের কানাযুক্ত পেটমোটা কলসি। গুড়ের কলসি।
ন্যাতা রান্নার হাঁড়ি-কড়া মোছার কাপড়। অনেকে নেতা, নাথা বলেন।
নাথা রান্নাঘরে ব্যবহার করা ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড।
নাদা তলা গোল বিস্তৃত মুখ মাটির বড় পাত্র।

নিরামিষ ঘর যে ঘরে শুধু নিরামিষ রান্না করা হয়।

নিরামিষ তাক যে কাঠের তাকে শুধু নিরামিষ রান্না বা বাসনপত্র রাখা হয়।

নিরামিষ বাসন যে বাসনপত্র শুধু মাত্র নিরামিষ রান্নার জন্য ব্যবহার করা হয়।

নুচনি রান্নার হাঁড়ি-কড়া মোছার নেকড়া।

নুনের গনা নুনের ছোট বাটি।

নেতাকানি হাঁড়ি মোছার ন্যাকড়া

নেথানি রান্নাঘরের ন্যাকড়া। উত্তরবঙ্গের ভাষা।

নেপা রান্নাঘর, উনুন প্রভৃতি লেপন করা।

নোটা সব সময় ব্যবহারের জন্য ছোট জলপাত্র।

নোদা গোবর ধরানো কাঠি যা জ্বালানিরূপে ব্যবহার করা হয়। অনেকে 'নোনদা' বলেন।

নোড়া মশলা পেষার বা ছেঁচার জন্য গোলাকার যে পাথরটি ব্যবহার করা হয়। অনেকে 'শিল' বলেন। শিলনোড়া।

প

প চাল মাপার কাজে ব্যবহৃত বেতের পাত্র। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভাষা।

পক্ক পাকঘরে যা রাঁধা হয়েছে।

পচরাগাদা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় রান্নাঘরের পিছনে আবর্জনা ফেলার জায়গা এই নামে পরিচিত।

পচরাশাল রান্নাঘরের পিছনে যেখানে আবর্জনা ফেলা হয়, মেদিনীপুরের ভাষা।

পনিক বঁটি-দা। মেদিনীপুরের ভাষা।

পরাত বারকোশ ধরনের পিতলের কানা উঁচু বড় থালা বিশেষ।

পলা ভাঁড় থেকে তেল তোলার হাতলযুক্ত বাটি বা হাতা।

পলারি কানা উঁচু ছোট থালা।

পশুনি অনেকটা ডেকচির মতো মাটির পাত্র। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভাষা।

পসুরি পাঁচ সের পরিমাণ শস্য মাপার পাত্র বিশেষ। অনেকে 'পাসারি'ও বলেন।

পাই বাঁকুড়া অঞ্চলে চাল ইত্যাদি মাপার বেত বা বাঁশের ছোট পাত্র।

পাইরি পাঁচ সের পরিমাণ শস্য মাপার পাত্র বিশেষ। অনেকে 'পাইয়া' বলেন।

পাউলি জল খাওয়ার যে পাত্রের গলা সরু, পেট মোটা, কানা বাইরের দিকে হেলান এবং তলদেশে খুরো থাকে। উত্তরবঙ্গের ভাষা।

পাক রান্না করা।

পাকঘর যে ঘরে রান্না করা হয়।

পাকপাত্র রন্ধন করে রাখার পাত্র।

পাকভাণ্ড রান্না করা জিনিস যে পাত্রে রাখা হয়।

পাকযজ্ঞ রন্ধন সাপেক্ষে পুণ্যকর্ম।

পাকশালা রান্নাঘর।

পাক্কান্ন রান্না করা ভাত।

পাঁকা উনুন।

পাঁকুই রান্নাঘরে জলে কাজ করায় আঙুলে যে হাজা রোগ হয়।

পাখা উনুন।

পাখাল উনুন।

পাঁচঠুলি এক সঙ্গে পর পর পাঁচটি ছোট বাটি যা ঝুলিয়ে রাখার জন্য বাটির দুই প্রান্তে দুটি অর্ধবৃত্তাকার হাতল থাকে। টিফিন ক্যারিয়ার।

পাটা শিলের লেখ। শিলনোড়া।

পাটাপুতা রান্নাঘরে মশলাদি পেষার জন্য রাখা পাথরের সরঞ্জাম। শিলনোড়া। পূর্ববঙ্গে অনেক স্থানে 'পাটাপুতাইল' বলে।

পাতি নোড়ান মধু রাখার আলাদা পাত্র।

পাতি ভাঁড় ঘটির মতো মেটে ছোট পাত্র।

পাতনা গামলা।

পাতিল নানান গড়নে হাঁড়ি। পূর্ববঙ্গে ডাল ঝোল রান্নার জন্য চেপটা ধরনের পাত্র। অনেকে পাতিলিও বলেন। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে তামার কলাই করা ডেগ জাতীয় বড় পাত্র।

পাথর পাথরের থালা। বীরভূম অঞ্চলে 'পাথরা', কোথাও পাথরের খোরা, পাথরের বাটি বলে।

পাথুরি পাথরের বাটি।

পাথি আনাজ-তরকারি, চাল ইত্যাদি ধোওয়ার বাঁশের সরু কাঠির তৈরি ধুচুনি বিশেষ। রাঢ় অঞ্চলে কোথাও পাথ্যাও বলে।

পাঁদাড় রান্নাঘরের পিছনে আবর্জনা ফেলার অপরিষ্কার স্থান। রাঢ় অঞ্চলে 'পাঁদাড়ে' বলে।

পানি জল খাওয়ার যে পাত্রের গলা সরু, পেট মোটা, কানা বাইরের দিকে হেলান এবং তলদেশে খুরো লাগানো থাকে।

পান্তাবেলা সকাল বেলা।

পান্তাভাত রাতে রান্না করে রান্নাঘরে জল দিয়ে রেখে পরদিন যে ভাত খাওয়া হয়।

পালি শস্য মাপার ছোট বেতের পাত্র।

পিছকান্ডা রান্নাঘরের পিছনের অপরিচ্ছন্ন স্থান।

পিছেড় রান্নাঘরের পিছনে আবর্জনা ফেলার স্থান।

পিঠেখোলা এক ধরনের সেঁকা পিঠে তৈরি করার বিশেষ ধরনের খোলা।

পিত্তরক্ষা রান্নাগরের কর্ত্রী হয়েও সামান্য খাদ্যের সাহায্যে ক্ষুন্নিবৃত্তি করা।

পিড়া শ্রীহট্ট অঞ্চলে উনুনের উঁচু মাটির লিপ্ত পিণ্ড, যার উপরে হাঁড়ি বসানো হয়।

পিঁড়া কাঠের ফলা হতে তৈরি নিচু আসন বিশেষ।

পিড়ে উনুনের মাটির শৃঙ্গত্রয়।

পিঁড়ে কাঠের নিচু আসন।

পিঁড়ি কাষ্ঠাসন। অনেকে 'পিড়্যা' বলেন।

পিঁড়িবেলুন লুচি, রুটি বেলার জন্য কাঠের যে চাকতি ব্যবহার করা হয়।

পিড়াল মাটির বেদি যার উপর রান্নার হাঁড়ি কড়া বসানো হয়।

পুতা শিলের নোড়া। অনেকে 'পুতাইল', 'পুত্যা'ও বলেন।

পুটে পাক রান্নার পাত্র।

পুরা মাটির ছোট বেদি, যার উপরে ভাতের হাঁড়ি রেখে ফেন ফেলা হয়। ত্রিপুরা নোয়াখালি অঞ্চলে 'পুরা' অর্থে কুনকে জাতীয় পাত্র বিশেষ।

পুরুসা মেদিনীপুরে পাঁচ সের পরিমাণ শস্য মাপার পাত্র। বীরভূমে বলে 'পুসোর'।

পেয়ে মাটির বড় জালা। নদিয়ার ভাষা।

পেচে আনাজ-তরকারি ইত্যাদি ধোওয়ার বাঁশের সরু কাঠির তৈরি ধুচুনি বিশেষ।

পেতে চোট চুবড়ি বিশেষ।

পেথে যে চুবড়ি করে আনাজ-তরকারি ধোওয়া হয়। অনেকে 'পেথ্যা' বলেন।

পোইলা ছোট কলসি।

পোয়া মাটির ছোট বেদি, যার উপরে ভাতের হাঁড়ি রেখে ফেন ফেলা হয়। বাঁকুড়ার ভাষা।

পোচ রান্নাঘরে ব্যবহৃত ন্যাকড়া।

পোতনা রান্নাঘর নিকানোর ন্যাতা।

পোষ্টিভাত রান্নাঘরে দুপুরে রাঁধা যে ভাত জল দিয়ে রেখে রাতে খাওয়া হয়।

পৈঠা মাটির ছোট বেদি, যার উপরে ভাতের হাঁড়ি রেখে ফেন ফেলা হয়। ফরিদপুরে 'পৈখলা' বলে।

ফ

ফট্‌কি নাটকি রান্নাঘরের অল্প মূল্যের ছোটখাটো জিনিস।

ফালাকাটা লম্বা টুকরো টুকরো করে কাটা তরকারি। অনেকে ফাল্লা বলে।

ফুঁকমি নিবন্ত আগুন ফুঁ দিয়ে জ্বালাবার বাঁশের পাব থেকে তৈরি চোঙ বা নল।

ফুড়কো বাড়ি উনুন জ্বাল দিতে সাহায্য করা লোহার লম্বা শলা। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভাষা।

ফেরুয়া জলের যে পাত্রের গলা সরু, পেট মোটা, কানা বাইরের দিকে হেলান ও তলদেশে খুরো আছে। অনেকে 'ফেরো' বলেন।

ব

বয়েম রান্নাঘরে রাখা লবণ আর আচার রাখার চিনামাটির পাত্র।

বএম চিনা মাটি বা কাচের তৈরি গোল মুখ ঢাকা পাত্র।

বগুনা গোলার্ধ ধরনের পিতলের রন্ধন পাত্র। অনেকে বউগনা, বগনা বলেন।

বগি কানা-উঁচু কাঁসার থালা।

বঁটি মাছ তরকারি ইত্যাদি কুটবার খড়্গাকার অস্ত্র বিশেষ। এটি কাঠের পাটায় অল্প হেলিয়ে বসানো হয়।

বঁটিদা মাছ আনাজ তরকারি ইত্যাদি কোটার যন্ত্র।

বঁটিলুই রান্নার জন্য ব্যবহৃত গোলাকার হাঁড়ি।

বটুয়া শস্যাদি মাপার বেতের পাত্র। অনেকে 'বট্যুয়া'-ও বলেন।

বরশি আগুনের মালসা।

বড়ে যশোর অঞ্চলে গোবর ধরানো কাঠি যা দিয়ে উনুনে জ্বাল দেওয়া হয়।

বায়নদদার চট্টগ্রামের ভাষায় যে ঘরে রান্না করা হয়। অনেকে 'বাইন্দ্যুয়ার'ও বলেন।

বাইন বাঁকুড়া অঞ্চলে দীর্ঘাকার কানা খাড়া কবন্ধের মতো দেখতে, চাল প্রভৃতি শস্য মজুত করতে ব্যবহৃত হয়।

বাউনি রান্নার হাঁড়ি ডেকচি ইত্যাদির কানা বেষ্টন করে ধরার বেড়ি।

বাওলি রন্ধনকার্যে ব্যবহৃত বেড়ি। অনেকে বাউলিও বলেন।

বাটনা শিল-নোড়ায় পিষ্ট করা মশলা।

বাঁটলো রান্নার জন্য ব্যবহৃত গোলাকার হাঁড়ি।

বাঁটলই গোলাকার ঘটির আকারে বড় পাত্র, যাতে ভাত ডাল রান্না করা যায়।

বাটি প্রধানত তরল পদার্থ রাখার ও পরিবেশন করার জন্য গোল মুখ, অল্প গভীর পাত্র। কানা উঁচু ক্ষুদ্র পাত্র।

বাদিয়া মুর্শিদাবাদের কাঁসার মাঝারি বাটি।

বান উৎসব বাড়িতে লম্বা করে কাটা উনুন।

ব্যঞ্জন রান্না করা তরকারি।

ব্যান্নন ব্যাঞ্জন। রান্না করা তরকারি। কথ্য ভাষা।

বারকশ কাঠের বড় থালা। অনেকে 'বারকোশ' বলেন।

বারান্দায় রান্না রান্নাঘর না থাকলে, ঘরের বারান্দায় যেখানে রান্না করা হয়।

বাসইল ফরিদপুর অঞ্চলের দুধের বড় পাত্র।

বাসন রান্নার কাজে ব্যবহৃত কাঁসা, পিতল বর্তমানে স্টিলের নানান রকম সরঞ্জাম।

বাসন মাজা রান্নার বা খাবার দেওয়ার আগে বা পরে বাসনপত্র জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করা।

বাসন মাজা ছাই বাসনপত্রে রান্নার তেল ঘি প্রভৃতি পরিষ্কার করতে উনুনের কাঠকয়লার ছাই ব্যবহৃত হত। বর্তমানে কাঠের উনুন প্রায় উঠে যাওয়ায় বাসন মাজার নানা রকম সাবান, সাবান গুঁড়ো ব্যবহার করা হচ্ছে।

বুক্‌ড়ি আ-ছাঁটা মোটা চাল।

বুটির ডাল মটর ডাল।

বেতি চাল ইত্যাদি মাপার বেত বা বাঁশের ছোট পাত্র।

বেননে হাঁড়ি ব্যাঞ্জনের হাঁড়ি। ডাল তরিতরকারি ইত্যাদি রান্না করার চ্যাপ্টা ধরনের হাঁড়ি।

বেনুন ব্যাঞ্জন।

বেলন লম্বা ও গোলাকার কাষ্ঠখণ্ড, যা দিয়ে রুটি, লুচি ইত্যাদি বেলা হয়। অনেকে বেলুন বা বেলনা বলেন।

বেলি কানা উঁচু ছোট কাঁসার থালা।

বেলেন দা বঁটি ইত্যাদি ধার তোলার জন্য কাঠের সরু পাটা।

বেড়ুয়া রান্নার হাঁড়ি ডেকচি প্রভৃতির কানা বেষ্টন করে ধরার যন্ত্র বিশেষ। অনেকে 'বেড়ি' বলেন।

বেসালি যশোর-খুলনা অঞ্চলের দুধের বড় পাত্র।

বোকা কাতারি যে হাঁড়ি চাটি দিলে বাজে না।

বোকনা গোল ধরনের পিতলের রন্ধন পাত্র।

বোগনো হাঁড়ি মালসা বা গোলার্ধ ধরনের পিতলের রান্নার হাঁড়ি। অনেকে 'বোগন্যা হাঁড়ি'-ও বলেন।

বোড়া মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে ডিম্বাকৃতি কানাখাড়া কবন্ধের মতো দেখতে চাল প্রভৃতি শস্য মজুত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

বৈঠানি মাটির ছোট বেদি, যার উপরে ভাতের হাঁড়ি রেখে ফেন গালা হয়।

বৈয়ম ঘি, চিনি, আচার, নুন ইত্যাদি রাখার ঢাকনাযুক্ত পাত্র।

ভ

ভাজু নিলশা বাঁশ বা নারকেলের কাটির যে গুচ্ছর কুচি দিয়ে খই, চিঁড়া, মুড়ি ইত্যাদি ভাজার সময় হাঁড়ি-কড়াতে নাড়তে হয়।

ভাজা কাঠি যশোরের ভাষায় রান্নার সময়ে ভাজা, তরকারি ইত্যাদি ওলটাবার জন্য মাথা চ্যাপটা লোহার কাঠি বিশেষ।

ভাজা খোলা খই, চিঁড়ে, মুড়ি ইত্যাদি যে পাত্রে ভাজা হয়। অনেকে 'ভাজনা খোলা'ও বলেন।

ভাতোয়া ভাতের হাঁড়ি।

ভাতশাল রান্নাঘর।

ভাণ্ড্র খুলনার আঞ্চলিক ভাষায় রান্নাঘরের ন্যাকড়া।

ভান্‌শা রাজশাহি অঞ্চলের ভাষায় রান্নাঘর।

ভাণ্ডার যে স্থানে রান্নার চাল, ডাল, ঘি, তেল, মশলা প্রভৃতি মজুত করে রাখা হয়। অনেকে 'ভাঁড়ার' বলেন।

ভাঁড় পূর্ব বাংলায় ছোট কলসি।

ভাঁড় গুড় রাখার মাটির ঠিলে বা পাত্র।

ভুর্তি মাঝারি ধামা।

ভুসা রান্নাঘরে কাঠের ধোঁয়ায় উৎপন্ন কালি। অনেকে 'ভুসো' বলেন।

ভেটুয়া মাটির ছোট হাঁড়ি।

ম

মটকা মাটির বড় জালা। দেখতে বাতাবি লেবুর মতো গোলাকার, কানা সামান্য হেলানো, রং মেটে।

মটকি মাটির বৃহৎ জালা বিশেষ। গড়ন ডিম্বাকৃতি। চাল প্রভৃতি শস্য মজুত করার জন্য ব্যবহৃত মাটির জালা। পূর্ববঙ্গে অনেকে মাটকি, মাইট-ও বলে।

মর্তমান রান্নাঘরে রাখা লবণ বা আচার রাখার চিনামাটির পাত্র।

মশলা রান্নার কাজে যে শস্য দানা বা গুঁড়ো ব্যবহার করে রান্না সুস্বাদু করা হয়।

মহানসী রন্ধনশালার পরিচারিকা।

মাজলা বড় ঝুড়ির আকারে মাটির পাত্র। গামলা।

মাজাইর বড় ঝুড়ির আকারে মাটির পাত্র।

মাড় ভাতের ফেন।

মালসা পাকপাত্র। নানান গড়নের হাঁড়ি

মুচি জিনিস রাখার পাত্র।

মেচলা তলা গোল, বিস্তৃত মুখ বড় ঝুড়ির আকারের মাটির বড় পাত্র।

মেজলি ভাতের ফেন ফেলার জন্য ব্যবহৃত মাটির গামলা।

মেটে মাটির বড় জল রাখার জালা। মটকি। অনেকে 'মাঠি' বলেন।

র

রঙ্গাই যশোর অঞ্চলের মাটির বড় হাঁড়ি।

রন্ধনশালা যে ঘরে রান্না করা হয়।

রন্ধিত পাকঘরে যা রান্না হয়েছে।

রসুইঘর চট্টগ্রামের ভাষায় যে ঘরে রান্না করা হয়।

রাঁধুনঘর ঢাকার শব্দ, যে ঘরে রান্না করা হয়।

রান্দন ঘর ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট অঞ্চলের ভাষায় রান্নাঘর।

রাইন পাকপাত্র, নানান ধরনের হাঁড়ি।

রাইঙ্গ মাটির বড় হাঁড়ি।

রান্নুন ঘর পাবনা অঞ্চলের ভাষায় যে ঘরে রান্না করা হয়।

রান্নাঘর যে ঘরে রান্না করা হয়। গ্রামের অধিকাংশ বাড়িতেই চারিদিকে চার ভিটে অন্তর চারটি ঘর থাকে। আর থাকে ছোট ছোট ঘর— তার মধ্যে একটি রান্নাঘর। রান্নাঘর মানেই যেখানে আলোবাতাস অবাধে প্রবেশ করতে পারবে না, পরিসরও ছোট। তবে এখন মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে, আধুনিক রান্নাঘরের ভাবনা

গ্রামে ততটা না গেলেও আগের থেকে উন্নত হয়েছে। গ্রাম্য উচ্চারণে 'আন্নাঘর'-ও অনেকে বলেন।

রান্ধা ঘব যে ঘরে রান্না করা হয়। আঞ্চলিক ভাষা।

রান্নার ঘ্রাণ রান্না চলা কালে রান্নার ঘ্রাণেই রাঁধুনি বুঝতে পারেন রান্নার স্বাদ কেমন হয়েছে।

রান্নাঘরের আগড় আগড় বাঁশের দরজায় ঝাঁপ। রান্নাঘরের দরজা। অনেকে রান্নাঘরের কপাটও বলেন।

রান্নাঘরের আগল রান্নাঘরের দরজার খিল বা হুড়কো।

রান্নাঘরের শলা দেশলাই। এঁটো হয়ে যায় বলে, এই শলা অন্য কাজে ব্যবহার করা হয় না।

রাশ বড় কলসি।

রেক চাল ইত্যাদি মাপার জন্য বেতের সোয়াসেরি পাত্র।

ল

লম্ফ পেটমোটা সরু গলা কেরোসিনের চিমনিহীন ডিবা।

লাফনা খুন্তি। রান্নার সময় ভাজা, তরকারি ইত্যাদি ওলটাবার জন্য এক মাথা চ্যাপটা লোহা ইত্যাদি কাঠি বিশেষ। যশোর-খুলনার ভাষা।

লাতা রান্নাঘরের ন্যাকড়া বা ন্যাতা।

লালতেন লণ্ঠন।

লাড়ন উত্তরবঙ্গের ভাষা। নারকেল বা বাঁশের কাঠির গুচ্ছ, যা দিয়ে খই, চিড়ে, মুড়ি ইত্যাদি ভাজার সময় হাঁড়ি-কড়াতে কুচি দিয়ে নাড়তে হয়। নাড়ানো শব্দ থেকে এসেছে।

লুচনি রান্নার হাঁড়ি কড়াই মোছার ন্যাকড়া।

লুছুনি ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষায় রান্নাঘরের হাঁড়ি-কড়াই মোছার ন্যাতা।

লোটা সব সময় ব্যবহারের জন্য রান্নাঘরের ছোট জলপাত্র।

লোহারা পূর্ববঙ্গের ভাষা, আংটাযুক্ত চওড়া মুখ লোহার রন্ধনপাত্র। অনেকে 'লোয়ারা' বলেন।

শ

শরা গোলাকার চিতড়ে মুখ অল্প গভীর মাটির পাত্র।

শলৈ দেশলাই। অনেকে শলাই বলেন।

শানক পোড়া মাটির থালা।

শিকে হাঁড়ি ইত্যাদি ঝুলিয়ে রাখার জন্য পাট বা সুতোর দড়ি দিয়ে তৈরি আধার। অনেকে শিকা-বলেন।

শিটা তরকারি রান্নাঘরের ভাষা, রসহীন শুকনো তরকারি, অনেকে 'শিটে তরকারি'ও বলেন।

শূর্প কুলো। শস্যাদি ঝাড়ার জন্য বাঁশের তৈরি পাত্র। 'সূর্প' বানান-এ লেখা হয়।

শিল যে চ্যাপটা পাথরের উপরে মশলাদি কোটা বা পেষণ করা হয়। বাংলাদেশে শিলকে 'পাটা' বলে।

শিলনোড়া রান্নাঘরের মশলাদি পেষার জন্য রাখা পাথরের সরঞ্জাম। দুই খণ্ড পাথরের এক খণ্ড আয়তাকার চেপটা, আর এক খণ্ড মুষলাকার গোলালো। বাংলাদেশে 'শিলপাটা' বলে।

স

সন ছোট চিমটা বিশেষ।

সন্না চোট চিমটা।

সরপোশ ঘটি ইত্যাদির ঢাকনি।

সরা গোলাকার চিতড়ে মুখ অল্প গভীর মাটির পাত্র, যা দিয়ে হাঁড়ি কলসির মুখ ঢাকতে ঢাকনি রূপে ব্যবহৃত হয়।

সবজি সবুজ তরকারি।

সাঁজালের হাঁড়ি আগুনের মালসা।

সারকুড় রান্নাঘরের পিছনে আবর্জনা ফেলার স্থান। কোথাও সারগাছা, সাড়গাড়ি নামেও পরিচিত।

সাঁড়াশি রান্নাঘরে কোনও কিছু ধরার জন্য লৌহ নির্মিত যন্ত্র।

সিদ্ধচাল সিদ্ধান্ন। ভাত করার চাল।

সুপ ছোট কুলা। সূপ-বানানও লেখা হয়।

সুপালি শস্য ইত্যাদি ঝেড়ে কাঁকর ইত্যাদি পৃথক করার চ্যাপটা ধরনের বাঁশের পাত্র। ছোট কুলো।

সরুয়া ঝোল।

সুরাই সরু মুখের কলস।

সের বেতের তৈরি মাঝারি আকারের বেত বা বাঁশের পাত্র, যা দিয়ে সাধারণত এক সের চাল ইত্যাদি মাপা যায়।

হ

হলদি হলুদ। রান্নার মশলা।

হারিয়া রান্নার পাত্র।

হাঁড়ি কাড়া রান্না করার জন্য নতুন হাঁড়ি বের করে ব্যবহার করা। পূর্বপুরুষের উদ্দেশে পৌষ সংক্রান্তিতে নতুন হাঁড়িতে রান্না করে তা নিবেদন করতে হয়।

হাতপাখা তালপাতা দিয়ে তৈরি পাখা যা দিয়ে নিভানো উনুনের আগুন জ্বালানো হয়।

হাইনশাল হেঁশেল। যে ঘরে রান্না করা হয়। অনেকে হাঁইশাল, যশোরে হাঁড়শাল, কোথাও হ্যাঁশাল, খুলনায় 'হালশেল' বলা হয়।

হাতা হাতের ধরনে লম্বা বাঁটযুক্ত রান্নার কাজে ব্যবহৃত পাত্র বিশেষ।

হাঁড়া বড় হাঁড়ি।

হাঁড়ি পাকপাত্র। রান্নার জন্য গড়া নানান ধরনের হাঁড়ি।

হাঁড়িকুড়ি মাটির বাসনপত্র।

হিমা গামলা বিশেষ।

হুপা যেখানে রান্নার হাঁড়ি কড়া তুলে রাখা হয়।

হেঁশেল [< হাঁড়িশাল], রান্নাঘর। অনেকে হেনশেল বা হেঁশ্যাল-ও বলেন।

হেরকেন রান্নাঘরের আলোর জন্য ব্যবহৃত হ্যারিকেন। •

হোলা মালসা ধরনের পাত্র।

রান্নাঘরের তরি-তরকারি, মশলা

অ

অগথ বকফুল

অড়র ডাল শস্য। অনেকে অড়হর, অড়ল, অড়াল, অহর, আইরি, আয়রি, আটুল, আটোর, আড়ল, রহড় ডালও বলে থাকেন।

আ

আকলা লঙ্কা। অনেকে 'আকালি' বলেন।

আখ নালযুক্ত তৃণ। যার রস থেকে গুড়, চিনি ইত্যাদি তৈরি করা হয়। অনেকে ইক্ষু, আক, আউখ, কুশ্যার, কুশর, কুশোর-ও বলেন।

আদা আর্দ্রক। বহু গেঁড়যুক্ত কন্দ।

আনাজ রান্নাঘরের ভাষায় কাঁচা সবজি। পূর্ববাংলায় 'আনাইজ' বলে।
আমড়া টক ফল।
আমরুল অম্লশাক বিশেষ।
আমলি তেঁতুল।
আমসি কাঁচা আমের শুকনো সরু ফালি।
আমাত আমসত্ত্ব। অনেকে আমাট বা আমোট-ও বলেন।
আলু গোল আলু। তরকারি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রাঙা আলু বা মিষ্টি আলুও রয়েছে।

ই

ইঁচড় অপুষ্ট যে কাঁচা কাঁঠাল তরকারি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অনেকে 'এঁচড়' বলেন।

উ

উচ্ছো অনেকে 'উচ্ছা', উইস্তা, উস্তে বলেন। তেতো তরকারি ফল।
উরি শিম।

ক

কচু মূল বা কন্দ জাতীয় আনাজ।
কদিমা মিষ্টি কুমড়া।
কপি তরকারি বিশেষ। ফুলকপি, বাঁধাকপি ও ওলকপি— এই তিন রকম কপি পাওয়া যায়।
করমচা টক ফল।
করলা তেতো তরকারি ফল।
কাঁচকলা কাঁচা অবস্থায় তরকারি রূপে ব্যবহৃত হয়।
কলাই ডালশস্য।
কলি পিঁয়াজকলি। পেঁয়াজের শীষ।
কাঁকরোল তরকারি ফল।
কাঁকুড় কাঁচা অবস্থায় তরকারি রূপে ব্যবহৃত হয়।
কাঁচড়া অম্ল শাক।
কুঁড়ি তরকারি বিশেষ।
কুমড়া মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া— দু রকম কুমড়ো দেখা যায়।

খ

খসলা নটে শাক বিশেষ।

খাড়া ডাঁটা।

খুড়িয়া কাঁটা নটে।

খেঁড়ো কাঁচা অবস্থায় তরকারি রূপে ব্যবহৃত হয়।

খেসারি ডালশস্য বিশেষ।

গ

গিমা তিক্ত শাক।

গোকুল ফুল বক ফুল।

চ

চালতা বহু আবরণযুক্ত টক ফল।

চিচিঙ্গা সাদা রেখা বিশিষ্ট দুই মাথা সরু লম্বা ধরনের তরকারি বিশেষ।

চিনামান কচু।

ছ

ছিম তরকারি ফল বিশেষ।

ছুটি সজনে ডাটা

ছৈ শিম।

ছোলা ডালশস্য।

ঝ

ঝিঙে তরকারি ফল বিশেষ।

ড

ডাটা শাক, সবজি জাতীয় দুর্বল কাণ্ডের গাছ।

ডিংলা মিষ্টি কুমড়া।

ঢ

ঢেঁকি শাক বুনো শাক বিশেষ।

ঢেঁড়স তরকারি ফল বিশেষ।

ত

তরই ঝিঙে জাতীয় ফল বিশেষ।

তরকারি রান্নার যোগ্য কাঁচা ফলমূলাদি।

তেঁতুল অম্ল জাতীয় ফল বিশেষ।

থ

থানকুনি শাক বিশেষ।

দ

দুধকুশি চিচিঙ্গা।

ধ

ধানী লঙ্কা ছোট লঙ্কা। ছোট হলেও এর ঝাঁঝ খুব বেশি।

ধেড়ি ঢেঁড়স।

ন

নাজনা সজনে জাতীয় তরকারি ফল।

নারকেল গাছের ফল, রান্নার কাজেও ব্যবহৃত হয়।

নালিতা পাট শাক। অনেকে নালতে, নালিয়া, নাইল্যা-ও বলেন।

ল

লেবু সুগন্ধি অম্লফল। লেবু। এর অনেক জাত— কাগজি, গন্ধরাজ, গোঁড়া, গৌড়া, জামির, টাবা, পাতি।

প

পটোল তরকারি ফল বিশেষ।

পাট শাক অনেক বাঙালির প্রিয় শাক। এর অন্য নাম নালতে, নালিতা, নালিয়া, নাইল্যা।

পালং শাক বিশেষ। কেউ কেউ 'পালম'-ও বলেন। তিন রকম শাক দেখা যায়— ঝাড় পালং, শীষ পালং ও টক পালং।

পিড়িং মেদিনীপুরের শাক বিশেষ।

পির কলার মোচা।

পিয়াজ পেয়াজ। উগ্র গন্ধ কন্দ বিশেষ।

ব

বকফুল সাধারণত এই ফুল ভাজা খাওয়া হয়।

বরবটি শিম জাতীয় সরু লম্বা তরকারি ফল। পাকা বরবটির বীজ শুকিয়ে ডাল করেও খাওয়া হয়।

বাইগন বেগুন। তরকারি ফল।

বাথুয়া শাক বিশেষ। অনেকে বেথুয়া, বেথো, বেতো শাকও বলেন।

বিউলি খোসা ছাড়ানো বিরিকলাই।

বেগুন তরকারি ফল বিশেষ অনেকে বাইগন, বাইগুন, বাইগোন, বাইঙ্গন, বাইয়ন, বাগন, বাগুন, ব্যারগন-ও বলেন। এর অনেকগুলি জাত। আমঝুঁকি— আকারে ছোট, এক বোটাতে ঝোঁকার মতো অনেকগুলি হয়। কুলিবেগুন— লম্বা সরু বেগুন। দোকো— বারোমেসে। মাকড়া বেগুন— ডোরাকাটা বেগুন। মুক্তকেশী— সাদা বেগুন। তাল বেগুন— খুব বড় গোল বেগুন।

ভ

ভাদালি কলার থোড়। অনেকে ভাদাল, ভারালি-ও বলেন।

ভেটকুল কচু জাতীয় গুল্ম বিশেষ। ডাঁটা চড়চড়ি বা চচ্চড়ি রূপে খাওয়া হয়, মূলে ঔষধ হয়।

ম

মসুর ডালশস্য বিশেষ। অনেকে মসুরি, মুসুরি-ও বলেন।

মুলা প্রসিদ্ধ কন্দ বিশেষ। মুলো, মুলাই-ও বলা হয়।

মেথি মশলা, মেথি শাক। অনেকের প্রিয়।

মোচা কলার ফুল। মোচার ঘণ্ট প্রিয় খাবার।

মৌরি মশলা।

র

রামঝিঙ্গা ঢেঁড়স। অনেকে রামতরই, রামপটোল-ও বলেন।

ল

লঙ্কা মশলা ফল। কাঁচা লঙ্কা ও শুকনো লঙ্কা দু রকম ভাবেই রান্নায় ব্যবহার করা হয়। অনেকে মরিচও বলেন।

লাউ তরকারি ফল বিশেষ।

লাফা উত্তরবঙ্গে শাক বিশেষ।

শ

শাক গাছ, পাতা, ডাঁটা যা খাদ্য রূপে গ্রহণ করা হয়। অনেক রকম শাক আছে, পালং শাক, পুঁই শাক, নটে শাক ইত্যাদি।

শিম তরকারি ফল বিশেষ। শিমের অনেক জাত রয়েছে, আলতাপাতি, কাঠশিম, কাতলি, ক্ষীরসাপাতি, ঘের্‌তকাঞ্চন, জামাইপুলি, টকই, পাঁকালে, পুঁটুলে, মাখমছিম, বাঘের নখ, হাতির কান ইত্যাদি।

শুঁট শুকনো আদা।

শৌলফা মৌরি জাতীয় শাক ও তার ফল।. মশলারূপে ব্যবহৃত হয়।

স

সজিনা ডাঁটার মতো সরু ও লম্বা তরকারি ফল বিশেষ। অনেকে কচা, সজনে, খাড়া, সজনা, সাজনা-ও বলেন।

সরষে সরিষা, তৈলশস্য বিশেষ।

সুষনি জলজ শাক বিশেষ। কালীপূজার আগের দিন যে চোদ্দো শাক খাওয়ার প্রথা রয়েছে, তার মধ্যে এই শাক রয়েছে।

হ

হলুদ সুপ্রসিদ্ধ কন্দ বিশেষ। রান্নার মশলা রূপে ব্যবহার হয়।

হেলেঞ্চা জলজ তিক্ত শাক বিশেষ।

কুটুম্বিতা

অ

অগ্রজ বড় ভাই।

অনুজ ছোট ভাই।

অমুকের মা বড় জা ছোট জাকে নাম ধরে না ডেকে সন্তানের জননী রূপে এই সম্বোধন করে থাকেন।

অমুকের... বাড়িতে, পাড়ায় পরিচিত ব্যক্তির নামের সঙ্গে ছেলে, মেয়ে, জামাই, প্রভৃতি শব্দযুক্ত করে পরিচয় দেওয়া হয়।

আ

আই মাতামহী। দক্ষিণ ২৪ পরগনার আঞ্চলিক ভাষা।

আইয়া এই শব্দে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার অঞ্চলে মাকে সম্বোধন করা হয়, আবার দক্ষিণ ২৪ পরগনায় 'আইয়া' অর্থে মাতামহীকে সম্বোধন করা হয়।

আইয়ো সধবা মহিলা। পূর্ব্ববঙ্গে বিবাহ প্রভৃতি শুভ কাজে যে সধবা মহিলাদের ডাকা হয়।

আজা পিতামহ। মানভূমের আঞ্চলিক ভাষা।

আজী মাতামহী। মানভূমের কথ্য ভাষায়।

আজীমা মাতামহী। উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষা।

আজাই মাতামহ। উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষা। বগুড়ার কথ্য ভাষায় পিতামহ।

আজু উত্তরবঙ্গে মাতামহ, রংপুরে পিতামহ।

আনু ভগ্নিপতি। জলপাইগুড়ি, মালদা, কোচবিহার অঞ্চলের কথ্য ভাষায়।

আনো ভগিনীপতি।

আবুই ভাই বা বোনের শাশুড়ি।

আবুইমা ভ্রাতা বা ভগিনীর শাশুড়ি।

আবো মাতামহী।

আমসোস শাশুড়ির মাতা। মালদা অঞ্চলের কথ্য ভাষা।

আয়ো এয়ো বা সধবা স্ত্রীলোক।

আল্‌ছেলা কোলের শিশু। মানভূমের ভাষা।

ই

ইষ্টি শ্বশুরবাড়ির দিকের আত্মীয়।

ইস্‌তিরি স্ত্রীর আঞ্চলিক উচ্চারণ।

এ

এই স্বামীর প্রতি স্ত্রী বা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সম্বোধন।

এইযে স্বামী-স্ত্রীর সম্বোধন।

এই শোন স্বামী-স্ত্রীর সম্বোধন।

এয়ো সধবা স্ত্রীলোক। বাঙালি হিন্দুর বিবাহের আচার-নির্দেশিকা।

এয়োস্ত্রী সধবা স্ত্রীলোক।

এয়োতি শাঁখা-সিঁদুর-নোয়া সহ সধবার লক্ষণ রয়েছে যে নারীর মধ্যে।

ও

ওগো স্বামীর প্রতি স্ত্রী বা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সম্বোধন।

ওনার স্বামী সম্পর্কে স্ত্রীর উক্তি।

ওনাদের শ্বশুর-ভাশুর-স্বামী প্রসঙ্গে, গুরুজনদের উদ্দেশে সম্বোধন।

ক

কচি ছোট ছেলে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার আঞ্চলিক শব্দ।

কইনা বিয়ের পাত্রী।

কনে বিবাহের পাত্রী।

কনে বউ নতুন বউ।

কন্যা তনয়া।

কর্তা পরিবারের প্রধান ব্যক্তি।

কর্তাবাবু চাকরবাকরদের সম্বোধনে গৃহস্বামী।

কত্তামা বাড়ির প্রধান গিন্নি, চাকরবাকরদের সম্বোধনে।

কাকা পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

কাকু কাকাকে আদরের সম্বোধন।

কাকি কাকার স্ত্রী।

কাকিমা মায়ের পরেই কাকীর স্থান বলে, তিনিও মাতৃসম্বোধন পেয়ে থাকেন।

কাঠবাপ সৎপিতা, মানভূমের ভাষা।

কুটুম শ্বশুরবাড়ির দিকের আত্মীয়।

কুদি শিশু বালিকা। পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষা।

কোদা শিশু বালক।

কোদক শিশু বালক।

কোড়ুকু ঢাকা, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, যশোরের আঞ্চলিক ভাষায় শিশু বালক।

খ

খঁকা খোকা। মানভূমের শব্দ।

খঁখা পুত্রসন্তান। মানভূমের আঞ্চলিক ভাষা।

খুকু আদরে ডাকা শিশু বালিকা।

খুকি শিশু বালিকা।

খুড়ত কাকার সন্তান সম্পর্কে।

খুড়াত্ত কাকার সন্তানদের সম্পর্কে।

খুড়াতো পূর্ববঙ্গে আঞ্চলিক ভাষায় কাকার সন্তান সম্পর্কে।

খুড়ন কাকিমা। শ্রীহট্টের আঞ্চলিক ভাষায়।

খুড়াই জলপাইগুড়ি অঞ্চলের কথ্য ভাষায় কাকিমা।

খুড়তুতো ভাই কাকা সম্পর্কীয় ভাই।

খুড়তুতো বোন কাকার কন্যা সম্পর্কে সম্বোধন।

খুড়তুতো শালা কাকাশ্বশুরের পুত্র সম্পর্কে।

খুড়তুতো শালি খুড়শ্বশুরের কন্যা সম্পর্কে।

খুড়শ্বশুর স্বামী বা স্ত্রীর কাকা।

খুড়শাশুড়ি স্বামী বা স্ত্রীর কাকি।

খুড়াই শাশুড়ি কাকিশাশুড়ি।

খুড়ো কাকা।

খুড়ি কাকি।

খুল্লতাত পিতার কনিষ্ঠ ভাই।

খোকা শিশু বালক।

খোকন শিশু বালক।

গ

গুতিয়া উত্তরবঙ্গে আঞ্চলিক ভাষায় শ্বশুরবাড়ির দিকের আত্মীয়।

গিন্নি বাড়ির বড় বউ।

গিন্নিবান্নি নববিবাহিত বধূ শ্বশুরবাড়িতে এসে যখন নিজের সংসারের হাল ধরতে শেখে তখন শাশুড়ির সম্বোধন।

গিন্নিমা বাড়ির কাজের মানুষের কাছে গৃহিণী সম্পর্কে সম্বোধন।

গিথানি গিন্নি। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার অঞ্চলের কথ্য ভাষা।

গির্থানি গৃহকর্ত্রী। উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষা।

গিত্থাইন গিন্নি। জলপাইগুড়ি অঞ্চলের কথ্য ভাষা।

গিরি বাড়ির কর্তা। উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষা।

গৃহকর্ত্রী গিন্নি।

গৃহিণী বাড়ির কর্তার বড় বউ।

ঘ

ঘরজামাই যে জামাতা, শ্বশুরবাড়িতে স্থায়ী ভাবে বাস করে।

ঘরের মেয়েমানুষ স্ত্রী। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কথ্য ভাষা।

ঘাটু ছোকরা অল্পবয়স্ক বালক। ময়মনসিংহের কথ্য ভাষা।

চ

চেলাবেলা অল্পবয়স্ক বালক-বালিকা।

চেঁড়াফেংড়া অল্পবয়সের ছেলেমেয়ে।

ছ

ছানা ছোট ছেলে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার আঞ্চলিক ভাষা

ছানি ছোট মেয়ে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কথ্য ভাষা।

ছাবাল অল্পবয়স্ক বালক। দক্ষিণ ২৪ পরগনার আঞ্চলিক ভাষা।

ছাবালপোন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কথ্য ভাষায় ছোট ছেলে।

ছাওয়াল অল্পবয়স্ক বালক। ফরিদপুর অঞ্চলের কথ্য ভাষা।

ছাইলপাইল আঞ্চলিক ভাষায় অল্পবয়স্ক বালক-বালিকা।

ছাইলা ছেলে। আঞ্চলিক কথ্য ভাষা।

ছালিয়া ছেলের আঞ্চলিক রূপভেদ।

ছালপাল অল্পবয়স্ক বালক-বালিকার আঞ্চলিক রূপভেদ।

ছোটকী ছোট বউ।

ছোট বউ ছোট ছেলের স্ত্রী।

ছোড়দা জ্যেষ্ঠ ভাইদের মধ্যে সবার ছোট।

ছোড়দি জ্যেষ্ঠ বোনদের মধ্যে সবার ছোট।

ছেরা ছেলে। পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষা।

ছেরি বালিকা। পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষা।

ছেমরা পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষায় বালক।

ছেমরি বালিকা। পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষায়।

ছেলে বালক।

ছেলা ছেলের আঞ্চলিক রূপভেদ।

ছেইলা আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় ছেলে।

ছেলিয়া কথ্য ভাষায় ছেলে।

ছেউড়্যা অভিভাবকহীন শিশু।

ছেঁওড় যে শিশুর দেখাশোনার কেউ নেই।

ছেঁওড়ে পিতৃমাতৃহীন শিশু।

ছেলেপুলে অল্পবয়স্ক বালক-বালিকা।

ছুইট্‌কা অল্পবয়স্ক শিশু।

ছোঁড়া ছেলে।

ছোকরা ছেলে।

ছুঁড়ি মেয়ে।

ছোকরি অল্পবয়স্ক বালিকা।

ছুকরি ছোট বালিকা।

জ

জা স্বামীর ভাইয়ের স্ত্রী। দেওর বা ভাশুরের স্ত্রী।

জাল পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষা। স্বামীর ভাইয়ের স্ত্রী।

জাক স্বামীর ভাইয়ের স্ত্রী। পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষা।

জাও জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার অঞ্চলের কথ্য ভাষায় স্বামীর ভাইয়ের স্ত্রী।

জামাই কন্যার স্বামী।

জামাইছা জামাতা। আঞ্চলিক রূপ।

জামাইছেলা জামাতা। মানভূমে আদরের সম্বোধন।

জামাতা কন্যার স্বামী।
জামাতা বাবাজি জামাই পুত্রতুল্য বলে শাশুড়ির সম্বোধন।
জামাইবাবাজীবন শ্বশুরবাড়িতে জামাইকে আদরের সম্বোধন।
জামাইবাবু ছোট শালা বা শালিদের কাছে দিদির স্বামী।
জাঁঅই জলপাইগুড়ি, কোচবিহার অঞ্চলের কথ্য ভাষায় জামাতা।
জাঠা জেঠার আঞ্চলিক উচ্চারণ।
জেঠা পিতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।
জেঠু পিতার বড় ভাই, আদরের সম্বোধন।
জেঠি জেঠার স্ত্রী।
জেঠামশায় বাবার দাদা।
জেঠশ্বশুর স্বামীর বা স্ত্রীর জেঠা।
জেঠশাশুড়ি জেঠ শব্দটি জ্যেষ্ঠ থেকে এসেছে। স্বামী বা স্ত্রীর জেঠিমা।
জেঠাই জেঠার স্ত্রী।
জেঠানি স্ত্রীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী। পূর্ববঙ্গে প্রচলিত কথ্য ভাষা।
জেঠিমা জেঠি।
জেইঠানি উত্তরবঙ্গে স্ত্রীর বড়দির আঞ্চলিক ভাষা।
জেঠতুতো পিতার বড় ভাইয়ের দিকের ভাই-বোন/শাল-শালি/দেওর-ননদ।
জেঠাইমা জেঠার স্ত্রী।
জেঠপোইত উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষায় ননদের স্বামী।
জেওয়াস স্ত্রীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী, পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষায়।

ঝ

ঝি কন্যা
ঝিউড়ি দুহিতা।
ঝিয়ারি জামাতার ভগিনী, পূর্ববঙ্গের প্রচলিত আঞ্চলিক শব্দ।
ঝিয়রা চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় পুত্রবধূ বা জামাতার ভগিনী।

ঠ

ঠাকুর সংসারে পূজনীয় ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের সম্বোধনে 'ঠাকুর' শব্দ যোগ করে তাঁদের সম্বোধন করা হত, যেমন দাদাঠাকুর, পিতাঠাকুর, ভাশুরঠাকুর ইত্যাদি।
ঠাকুরদা পিতামহ।

ঠাউরদা পিতামহ, আঞ্চলিক উচ্চারণে।
ঠাকুরদাদা পিতামহ।
ঠাকুমা পিতামহী।
ঠাকুরমা পিতামহী।
ঠাকুরকাকা বড় কাকা
ঠাকুরমামা বড় মামা।
ঠাকুরদিদি সকলের বড় দিদি।
ঠাকুরপো দেওর।
ঠাকুরকুমার দেওর।
ঠাকুরজামাই নন্দাই।
ঠাকুরঝি ছোট ননদ। স্বামীর ছোট বোন।
ঠাকুরকন্যা ননদ।
ঠাকুরানি পিতামহী। মর্যাদাজ্ঞাপক সম্বোধন, বাড়ির বড় গিন্নি যাঁর হাতে সংসার, তাঁকে এই সম্বোধন করা হয়.।
ঠাকরন ঠাকুরানির কথ্য রূপ।
ঠাকরান ঠাকুরানির আঞ্চলিক রূপ।
ঠাকরুন শাশুড়ি। প্রৌঢ়া বধূদের মুখে।
ঠাকুরান শাশুড়ি।
ঠাইরেন পূর্ববঙ্গে প্রচলিত শাশুড়ির আঞ্চলিক রূপ।
ঠান পিতামহী।
ঠাগমা ঠাকুরমা।
ঠাউকরাইন ঠাকুরানির আঞ্চলিক রূপ।
ঠাগরাইন ঠাকুরমা।
ঠানদিদি পাড়ার অনাত্মীয় বয়স্কা মহিলা।
ঠানদি বড় জা।
ঠাম্মা ঠাকুমার কথ্য রূপ।
ঠাকুরদু ঠাকুরমার কথ্য রূপ পূর্ববঙ্গে।
ঠাদ্দার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কথ্য ভাষায় ঠাকুরদাদা।
ঠাইগরাইন শাশুড়ির কথ্য রূপ।
ঠাইরন প্রৌঢ়া বধূদের মুখে বৃদ্ধা শাশুড়ির প্রতি সম্মানসূচক সম্বোধন।

ত

তাউই ভাই বা বোনের শ্বশুর।

তালুই ভগিনী বা ভ্রাতার শ্বশুর

তালই পূর্ববঙ্গ, ত্রিপুরা অঞ্চলের কথ্য রূপ, ভাই বা বোনের শ্বশুর।

তাঐ ভাই বা বোনের শ্বশুর, আঞ্চলিক রূপ।

তাহই উত্তরবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের কথ্য ভাষায় ভাই বা বোনের শ্বশুর।

তেনার স্বামীর। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কথ্য ভাষা।

তেনারা স্বামী, ভাশুর, শ্বশুর প্রমুখ গুরুজনেরা।

দ

দশঠাকুর পিতামহ।

দাদা বড় ভাই। পিতামহ, মাতামহকে আদরে ডাকা শব্দ। ছোট শালা-শালির নিকট জামাইবাবু। স্বামীর দাদা বা স্ত্রীর দাদা। সমবয়স্ক বা বয়োজ্যেষ্ঠকে সম্বোধনসূচক শব্দ।

দাদান দাদু। আদরের ডাক।

দাদামশাই পিতামহ।

দাদাবাবু জামাইবাবু। বয়স্ক ব্যক্তিকে শ্রদ্ধার সম্বোধন।

দাদু পিতামহ। মাতামহ। নাতি-নাতনিকে.সস্নেহে আদরের সম্বোধন।

দাদো জলপাইগুড়ি, কোচবিহার অঞ্চলের কথ্য ভাষায় পিতামহ।

দাদাভাই আদরে ডাকা পিতামহ, মাতামহ।

দাদাঠাকুর বৃদ্ধ বয়স্ক ব্যক্তি।

দিদি জ্যেষ্ঠা ভগিনী। বড় ননদকে 'দিদি' বলেই সম্বোধন করা হয়। পৌত্রী, দৌহিত্রীদের আদর করে 'দিদি' বলে ডাকা হয়। বড় শালিকেও দিদি বলা হয়।

দামাদ জামাতার কথ্যরূপ।

দিদিমণি মনিবকন্যাকে গৃহভৃত্যের সম্বোধন।

দিদিভাই বড় জা-কে এ ভাবেই সম্বোধন করা হয়।

দিদা আদরে ডাকা মাতামহী।

দিদিমা মাতামহী।

দেবর স্বামীর ছোট ভাই।

দেওর স্বামীর ছোট ভাই।

দেওরা মেদিনীপুরের আঞ্চলিক ভাষায় স্বামীর ছোট ভাই।

দেওরিয়া মেদিনীপুরে দেওরকে আদর করে ডাকা শব্দ।

দুধমাই স্তন্যদায়িনী ধাত্রী। মানভূমের ভাষা।

দুধমা স্তন্যদায়িনী ধাত্রী।

দুধু স্তন্যদায়িনী ধাত্রী। মানভূমের আঞ্চলিক ভাষা।

ন

নন ছোট ছেলেকে আদর করে ডাকা। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কথ্য ভাষা।

নানা দাদামশাই। মানভূমের শব্দ।

নানী দিদিমা। মানভূমের কথ্য ভাষা।

নোনা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় আদর করে ডাকা ছোট ছেলে।

ননদ স্বামীর ছোট বোন।

ননদি উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক শব্দে স্বামীর ভগিনী।

ননদিনী স্বামীর ছোট বোন।

ননন শ্রীহট্টে প্রচলিত শব্দ, স্বামীর ছোট ভগিনী।

ননাস স্বামীর বড় ভগিনী।

নন্দ স্বামীর ছোট বোন, আঞ্চলিক শব্দ।

নন্দা স্বামীর ছোট ভগিনী।

ননন্দা স্বামীর ছোট বোন, কথ্য ভাষায়।

ন-দা চতুর্থ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

ন-দি চতুর্থ জ্যেষ্ঠা ভগিনী।

ননদাই ননদের স্বামী।

নদারী বউ। আঞ্চলিক উচ্চারণে।

নাতি পৌত্র বা দৌহিত্র।

নাতনি পৌত্রী বা দৌহিত্রী।

নাতিন নাতির কথ্য রূপ।

নাতিনি নাতনির আঞ্চলিক শব্দ।

নাতন নাতির কথ্য রূপ।

নাতি-নাতকুর নাতি-নাতনি।

নাতবউ নাতির স্ত্রী।

নাতজামাই নাতনির স্বামী।

নাতিপুতি পৌত্র-প্রপৌত্র।

পুত পুত্র।

পুত্র ছেলে।

পুত্রা পুত্রবধূর ভাই। জামাতা। পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষা।

পুতাহি পুত্রবধূ। মানভূমের শব্দ।

পুতি নাতি বা নাতনির ঘরের সন্তান।

পুতহু পুত্রবধূ। মানভূমের আঞ্চলিক শব্দ।

পোলা শিশু বালক।

পোলাপান ছোট ছেলেমেয়ে।

পোয়া পুত্র। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক শব্দ।

পো ছেলে।

পিতা বাবা।

পিতামহ ঠাকুরদা। পিতার বাবা।

পিতামহী ঠাকুরমা। পিতার মা।

পি পিতার ভগিনী। পিসিমাকে আদরের সম্বোধন।

পিপি পিসিমা।

পিসি পিতার ভগিনী।

পিসাই উত্তরবঙ্গে পিসিমার কথ্য রূপ।

পিসিমা পিতার ভগিনী।

পিসা পিসিমার স্বামী।

পিসে পিসিমার স্বামী, কথ্য রূপ।

পিয়া শ্রীহট্ট অঞ্চলের আঞ্চলিক রূপ পিসেমশার।

পিসেমশাই পিসিমার স্বামী।

পিসশ্বশুর স্বামীর পক্ষে স্ত্রী, স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর পিসেমশায়।

পিসশাশুড়ি স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর বা স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর পিসিমা।

পিসাইশাশুড়ি পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক শব্দে পিসশাশুড়ি।

পিসতুতো নিজের পিসি বা পিসশাশুড়ির ছেলেমেয়ে।

পিসাত্ত পিসতুতোর কথ্য রূপ।

পিসাত পিসতুতোর আঞ্চলিক রূপ।

ফ

ফুলদা পঞ্চম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

ফুলদি পঞ্চম জ্যেষ্ঠা ভগিনী।

ফুলমা স্তন্যদায়িনী ধাত্রী।

ব

বউ পুত্রবধূ।

বৌ পুত্রের স্ত্রী।

বউমা স্নেহের ডাকে পুত্রবধূ।

বৌমা পুত্রবধূ, স্নেহের সম্বোধন।

বউঠান বড় বউ।

বউদি বড় ভাইয়ের স্ত্রীকে ছোটদের সম্বোধন।

বৌদিদি বড় ভাইয়ের স্ত্রী।

বউঠাকুরানি বড় বউ।

বউঠাকুরান বড় বউ।

বউঠাকুরুন বড় বউ।

বহু ছেলের বউ।

বড়কা বড়দা

বড়কি বড়দি।

বনো ভগিনীপতি। ত্রিপুরা অঞ্চলের কথ্য ভাষা।

বড়মা পিতামহী বা মাতামহী।

বড় কুটুম বড় শ্যালক।

বড় শালা স্ত্রীর বড় ভাই। সম্বন্ধী।

বড় শালি স্ত্রীর বড় বোন।

বড়দা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

বড়দি জ্যেষ্ঠা ভগিনী।

বড় কর্তা শ্বশুর। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কথ্য ভাষা।

বড় বউ বড় ছেলের স্ত্রী। অনেক বাড়ির বড় কর্তা নিজের স্ত্রীকে এই সম্বোধন করেন।

বড় বাবু বাড়ির বড় ছেলে।

বড় জেঠা বাবার বড় ভাই।

বড় ঠান বড় বউদি।

বড় সোস শ্বশুরের মাতা।

বড় জাল স্বামীর বড় ভাইয়ের স্ত্রী।

বড় বাপু পিতামহ। মালদা অঞ্চলের কথ্য ভাষা।

বড়কি বড় বউ। উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষা।

বড়ড়া বউ। কোচবিহার অঞ্চলের কথ্য ভাষা।

বড়ায়ি মাতামহী।

বড়াই মাতামহী।

বরধনা ভাশুর। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার অঞ্চলের কথ্য ভাষা।

বড়াপু পিতামহ। মালদা অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা।

বদ্দা বড়দা, চট্টগ্রামের কথ্য ভাষা।

বাই কোচবিহার, জলপাইগুড়ি অঞ্চলে দিদি, বড় জা, বড় ননদ।

বাইঅ বাবা। চট্টগ্রামের কথ্য ভাষা।

বাপ পিতা।

বাআয় বাবা। চট্টগ্রামের কথ্য ভাষা।

বাপধন আদরে পিতাকে, সন্তানকে সম্বোধন।

বাপুজি সশ্রদ্ধ সম্বোধনে পিতা বা পিতৃস্থানীয়।

বাবা পিতা।

বাবাজীবন জামাতাকে সম্বোধন।

বাআ চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় পিতা।

বালা উত্তরবঙ্গে আঞ্চলিক ভাষায় বর।

বালী উত্তরবঙ্গে কথ্য ভাষায় বিয়ের কনে।

বেটা ছেলে। পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষা।

বেটাছেলে স্বামী। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার আঞ্চলিক ভাষা।

বেটার বহু ছেলের বউ। উত্তরবঙ্গের কথ্য ভাষা।

বেডা পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষায় পুত্র।

বেডি পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষায় কন্যা।

বেটি কন্যা।

বেটাইন বহুবচনে পুরুষ। পূর্ববঙ্গ।

বেডাইন পূর্ববঙ্গে আঞ্চলিক ভাষায় বহুবচনে পুরুষ।

বেই পুত্র বা কন্যার শ্বশুর। নোয়াখালি, ত্রিপুরা অঞ্চলের ভাষা।

বেহাই পুত্র বা কন্যার শ্বশুর। পূর্ববঙ্গে প্রচলিত কথ্য ভাষা।

বেয়ান পুত্র বা কন্যার শাশুড়ি।

বেহান পুত্র বা কন্যার শাশুড়ি।

বেহাইন পূর্ববঙ্গের ভাষায় পুত্র বা কন্যার শাশুড়ি।

বেইন ত্রিপুরা, নোয়াখালি অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষায় পুত্র বা কন্যার শাশুড়ি।

বেহানি মালদা, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার অঞ্চলের ভাষায় পুত্র বা কন্যার শাশুড়ি।

বোন ভগিনী।

বোনপো ভগিনীর পুত্র।

বোনঝি ভগিনীর কন্যা।

বোহিন বোন। উত্তরবঙ্গ, মুর্শিদাবাদের কথ্য ভাষা।

বোইন বোন। পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষা।

বোনাই ভগিনীপতি।

বোহোনু মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে কথ্য ভাষায় ভগিনীপতি।

বোহনাই ভগিনীপতি। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার অঞ্চলের কথ্য ভাষা।

বোইনা জলপাইগুড়ি, কোচবিহার অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষায় ভগিনীপতি।

বোনু ভগিনীপতি।

বোনাইজামাই ভগিনীপতি। পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষা।

বোইন জাঁঅই ছোট বোনের স্বামী। জলপাইগুলি, কোচবিহারের কথ্য ভাষা।

বোয়ারি বউ। কোচবিহার অঞ্চলের কথ্য ভাষা।

বৈর্‌হা পত্নী। মানভূমের শব্দ।

বৈবাহিক পুত্র বা কন্যার শ্বশুর।

বৌয়াসিনী পূর্ববঙ্গে কথ্য ভাষায় ছোট ভাইয়ের স্ত্রী।

বু দিদি।

বুবু দিদি।

বুনুই ভগিনীপতি। উত্তরঙ্গের আঞ্চলিক ভাষা।

বুয়াসিন ভাদ্র বৌ। মানভূমের ভাষা।

বিটা পুত্র। পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষা।

বিটি কন্যা। পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষা।

বিয়াই পুত্র বা কন্যার শ্বশুর।

বিহাই মুর্শিদাবাদ, মালদা অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষায় পুত্র বা কন্যার শ্বশুর।

বিয়ায় যশোর অঞ্চলের কথ্য ভাষায় পুত্র বা কন্যার শ্বশুর।

বিহান পুত্র বা কন্যার শাশুড়ি।

বিয়াইন পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষায় পুত্র বা কন্যার শাশুড়ি।

বৌ স্ত্রী।

বৌরানি পত্নী।

ভ

ভদি বউদি। মালদা, পুরুলিয়ার কথ্য ভাষা।

ভনী বোন।

ভইন বোন। পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষা।

ভগিনী বোন।

ভগিনীপতি বোনের স্বামী।

ভগ্নীপতি ভগিনীর স্বামী।

ভগিনীপুত্র বোনের ছেলে।

ভগিনীকন্যা বোনের মেয়ে।

ভর্তা স্বামী।

ভাটু বড় বোনের স্বামী। মানভূমের আঞ্চলিক ভাষা।

ভাই ভ্রাতা। সাধারণত ছোট ভাইকে এই সম্বোধন করা হয়।

ভাইঝি ভ্রাতার কন্যা।

ভাইবেটা ভাইয়ের ছেলে।

ভাইবেটি ভাইয়ের মেয়ে।

ভাইবিটি ভাইয়ের মেয়ে।

ভাইপো ভাইয়ের ছেলে।

ভাইস্তি ভাইয়ের মেয়ে।

ভাইটি দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

ভাইস্তা ভাইয়ের ছেলে।

ভাইরাভাই স্ত্রীর ভগিনীপতি।

ভায়রাভাই শ্যালিকার স্বামী।

ভাতা স্বামী। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার অঞ্চলের কথ্য ভাষা।

ভাতার স্বামী।

ভাতারী যার স্বামী জীবিত আছে।

ভাতাত্তা সধবা মহিলা

ভাতাত্তী সধবা মহিলা। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, রংপুর অঞ্চলের কথ্য ভাষা।

ভাতারউলি সধবা মহিলা। মালদা অঞ্চলের কথ্য ভাষা।

ভাতিজা ভাইয়ের ছেলে।

ভাতিজী ভাইয়ের মেয়ে।

ভাতিজ্যা ভাইয়ের ছেলে।

ভাতিঝি ভাইয়ের মেয়ে।

ভাগিনা বোনের ছেলে।

ভাগিনেয় ভগিনীর পুত্র।

ভাগিনেয়া ভগিনীর কন্যা।

ভাগনে বোনের ছেলে।

ভাগিনা বোনের ছেলে।

ভাইগনা বোনের ছেলে।

ভাগিনী বোনের মেয়ে।

ভাগিনেয়ী ভগিনীর কন্যা।

ভাউই ছোট ভাইয়ের স্ত্রী।

ভাশুর স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

ভাশুরপো ভাশুরের পুত্র।

ভাশুরঝি ভাশুরের কন্যা।

ভাউর স্বামীর বড় ভাই। ভাশুরের কথ্য রূপ।

ভাউরকর ভাশুর পো। শ্রীহট্ট অঞ্চলের কথ্য ভাষা।

ভাউসানি জলপাইগুড়ি, কোচবিহার অঞ্চলের কথ্য ভাষায় ছোট ভাইয়ের স্ত্রী।

ভাজ ভাইয়ের স্ত্রী।

ভাজ বউ বৌদি, রাঢ় অঞ্চলের কথ্য ভাষা।

ভাইজ বাঁকুড়া, বীরভূম অঞ্চলের কথ্য ভাষায় ভাইয়ের স্ত্রী।

ভাউজ ভাইয়ের স্ত্রী। পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষা।

ভাউজি ভাইয়ের স্ত্রী। মালদা, দিনাজপুর অঞ্চলের কথ্য ভাষা।

ভাজবৌ রাঢ় অঞ্চলের কথ্য ভাষায় ভাইয়ের স্ত্রী।

ভাজের ভাই ভাইয়ের স্ত্রীর ভাই।
ভালাত ভাই চট্টগ্রামের কথ্য ভাষায় ভাইয়ের স্ত্রীর ভাই।
ভাদ্রবধূ ছোট ভাইয়ের স্ত্রী।
ভাদ্দর বউ ছোট ভাইয়ের স্ত্রী।
ভানি বৌদি, মালদা অঞ্চলের কথ্য ভাষা।
ভাস্তি বোনের মেয়ে। পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষা।
ভ্রাতুষ্পুত্রী ভাইয়ের মেয়ে।
ভ্রাতুষ্পুত্র ভাইয়ের ছেলে।
ভ্রাতৃজায়া ভাইয়ের স্ত্রী।
ভ্রাতৃবধূ ভাইয়ের স্ত্রী।
ভ্রাতৃশ্বশুর ভাইয়ের শ্বশুর।
ভাশুর স্বামীর বড় ভাই।
ভোজী ভাইয়ের স্ত্রী।
ভোশুর জলপাইগুড়ি, কোচবিহার অঞ্চলের কথ্য ভাষায় স্বামীর বড় ভাই।
ভোইজি কোচবিহারের আঞ্চলিক ভাষায় ভাইয়ের স্ত্রী।
ভোয়াসিন ছোট ভাইয়ের স্ত্রী।

ম

মউসা মাসির স্বামী। ময়মনসিংহ, ঢাকার কথ্য ভাষা।
মউয়া শ্রীহট্ট অঞ্চলের কথ্য ভাষায় মাসির স্বামী।
মগি স্ত্রী। অবজ্ঞা সম্বোধন।
মই মাসী। আঞ্চলিক ভাষায়।
মসি আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় মাসি।
মা মাতা।
মা ঠাকরুন বাড়ির কর্তার স্ত্রী।
মানোক্খি নতুন বউ। মা লক্ষ্মীর কথ্য রূপ। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার আঞ্চলিক ভাষা।
মাতা জননী।
মাতা ঠাকুরানি ঠাকুরের ন্যায় সম্মানিত গৃহকর্ত্রী।
মাইও শিশু বালিকা। উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষা।
মাঐ ভগিনীর শাশুড়ি। পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষা।

মাহই উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষায় ভ্রাতা বা ভগিনীর শাশুড়ি।

মাউইমা ভাই বা বোনের শাশুড়ি।

মাও মা।

মাই মা।

মাইও খুকি। কোচবিহারের কথ্য ভাষা।

মাইয়া স্ত্রী। মা।

মাইয়ালোক স্ত্রীলোক বিশেষ।

মেয়্যা স্ত্রী। মেদিনীপুর, বাঁকুড়ার কথ্য ভাষা।

মাইমা ভগিনীর শাশুড়ি।

মামা মায়ের ভাই।

মাতুল মামা।

মাতুলানী মামি। মামার স্ত্রী।

মাতুলি মাতুলের পত্নী।

মামশ্বশুর মামাশ্বশুর। মানভূমের আঞ্চলিক ভাষা।

মামু মায়ের ভাই। আদর করে সম্বোধন।

মামাশ্বশুর স্বামী বা স্ত্রীর দিকে সম্পর্কে মামা।

মামাতো মামা সম্পর্কীয় দাদা, ভাই, দিদি, বোন, শালা, শালি।

মামাতুতো মামার দিকের নিকট আত্মীয়।

মামি মামার স্ত্রী।

মামিমা মামার স্ত্রী।

মামি শাশুড়ি স্বামীর বা স্ত্রীর দিকে মামার স্ত্রী।

মাতুলানী মামার স্ত্রী।

মামাত্ত মামা সম্পর্কিত ভাইবোন ইত্যাদি।

মাগ পত্নী। অবজ্ঞা সম্বোধনে। রাঢ় অঞ্চলের শব্দ।

মাইগ পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় অবজ্ঞা সম্বোধনে স্ত্রী।

মাউগ স্ত্রী। অবজ্ঞা সম্বোধনে। কথ্য ভাষায় স্ত্রৈণ।

মাউগ্গা স্ত্রৈণ। পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষা।

মাগি অবজ্ঞা সম্বোধনে স্ত্রী।

মাইতোদা মেজদা। বীরভূমের কথ্য ভাষা।

মাসি মাতার ভগিনী।

মাসিমা মায়ের বোন

মাউসি আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় মায়ের বোন।

মাসিশাশুড়ি স্বামী বা স্ত্রীর মাসি।

মাসশ্বশুর স্বামী বা স্ত্রীর মেসো।

মাসশাশুড়ি স্বামী বা স্ত্রীর মাসি।

মাসোস মামি শাশুড়ি।

মাসতুতো মেসো-মাসির দিকে দাদা, দিদি, ভাই, বোন, দেওর, শালা, শালি।

মাসতুতো শ্বশুর স্বামী বা স্ত্রীর মেসো।

মাসতুতো শাশুড়ি স্বামী বা স্ত্রী মাসি।

মাইসাতো মাসি সম্পর্কিত নিকটাত্মীয়।

মাসাতো মাসি সম্পর্কিত নিকটাত্মীয়।

মাউসা মাসির স্বামী। পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষা।

মেজ দ্বিতীয়।

মেজদা দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

মেজদি দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠা ভগিনী।

মেজ বউ দ্বিতীয় পুত্রের স্ত্রী।

মেজকি মেজ বউ।

মেজবাবু বাড়ির মেজ ছেলে।

মেয়ে কন্যা।

মেয়ের জামাই জামাতা।

মেসো মাসির স্বামী

মেসোমশাই মাসির স্বামী। এ ছাড়া অনাত্মীয় বয়োজ্যেষ্ঠ পাড়াপ্রতিবাসীকেও এই সম্বোধন করা হয়।

মুউই মাসি। চট্টগ্রামের কথ্য ভাষা।

মুইর্ মাসি। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা।

ল

লক্ষ্মীটি স্ত্রীকে আদরের সম্বোধন।

শ

শউর শ্বশুর।

শশুর শ্বশুর। মানভূমের কথ্য ভাষা।
শ্বশুর স্বামী বা স্ত্রীর পিতা।
শাউড়ি স্বামী বা স্ত্রীর মাতা।
শাউর স্বামী বা স্ত্রীর পিতা।
শাউরি স্বামী বা স্ত্রীর মাতা।
শাশুড়ি স্বামী বা স্ত্রীর মা।
শাশ স্বামী বা স্ত্রীর মা।
শাশু মেদিনীপুরের কথ্য ভাষায় শাশুড়ি।
শাল শালা। মানভূমের কথ্য ভাষা।
শালা স্ত্রীর ছোট ভাই।
শ্যালক পত্নীর ভ্রাতা।
শালপোইত উত্তরবঙ্গে কথ্য ভাষায় ননদের স্বামী।
শালাপাত শ্রীহট্টের অঞ্চলিক ভাষায় শ্যালক পুত্র।
শালাজ শ্যালক পত্নী।
শালি স্ত্রীর ভগিনী।
শ্যালিকা স্ত্রীর বোন।
শাঁস শাশুড়ি। পিস-শাঁস— পিসিশাশুড়ি, মাস-শাঁস— মাসিশাশুড়ি, খুড়-শাঁস— খুড়ি শাশুড়ি।

স

সইমা স্তন্যদায়িনী ধাত্রী।
সইকাত স্ত্রীর বড় ভাই। কোচবিহার, জলপাইগুড়ির কথ্য ভাষা।
সঁয়া স্বামী। মানভূমের কথ্য ভাষা।
সতালো ভাই বিমাতার পুত্র। পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের কথ্য ভাষা।
সৎভাই বিমাতার পুত্র।
সম্বন্ধী স্ত্রীর বড় ভাই।
সমুন্দী স্ত্রীর বড় ভাই।
সমুন্দীর পো স্ত্রীর বড় ভাইয়ের ছেলে।
সহোদরা ভগিনী।
সাঁড়ু ভাই শ্যালিকার স্বামী।
স্বামী পতি।

সাই স্বামী। শ্রীহট্টের আঞ্চলিক ভাষা।

স্ত্রী পত্নী।

সেজদা তৃতীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

সেজদি তৃতীয় জ্যেষ্ঠা ভগিনী।

সেজ বউ সেজ পুত্রের স্ত্রী।

সেজকি সেজ বউ।

সেজবাবু বাড়ির সেজ ছেলে।

সোয়ামি পতি।

সোদর ভাই সহোদর ভাই।

হ

হউর শ্বশুর। কথ্য ভাষায়।

হাউরি স্বামী বা স্ত্রীর মাতা। কথ্য ভাষায়।

হউরি স্বামী বা স্ত্রীর মাতা।

হরী আঞ্চলিক ভাষায় স্বামী বা স্ত্রীর মাতা।

হাই শ্রীহট্টের আঞ্চলিক ভাষায় স্বামী।

হুমুন্দি স্ত্রীর বড় ভাই। সম্বন্ধীর আঞ্চলিক রূপ।

হতিন সতীন। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা।

হালা শালা। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা।

হাঁটানো ঢাকা-ময়মনসিংহ অঞ্চলে কোনও মহিলা তার স্বামীর সন্তান নিয়ে (হাঁটিয়ে) নতুন স্বামীর ঘরে গেলে নতুন স্বামী ওই সন্তানদের হাঁটানো বাবা।

---

১. লৌকিক শব্দকোষ— ডক্টর কামিনীকুমার রায়। ১৯৭৭।

২. চট্টগ্রামের প্রবচন ও বাগধারা— সম্পাদনা দীননাথ সেন। ১৯৮৪।

৩. মানভূমী শব্দকোষ— সম্পাদনা সুবোধ বসুরায় ও নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। ১৯৯০

৪. দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কথ্য ভাষা ও লোকসংস্কৃতির উপকরণ— বিমলেন্দু হালদার। ১৯৯৩

৫. ব্যাকরণ বিজ্ঞান— প্রভাতরঞ্জন সরকার। ১৯৮৯।